banglaboipdf.com

তুমি সন্ধ্যার মেঘ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

It isn't cover

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
Click here

তুমি সন্ধ্যার মেঘ

প্রথম পরিচ্ছেদ
এক

শকাব্দের দশম শতকে ভারতের ভাগ্যাকাশে সূর্যাস্ত হইতেছিল। নয়শত বর্ষব্যাপী মহারাত্রি আসন্ন, পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে রাক্ষসী বেলার রুধিরোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

দীর্ঘকাল ভারতের সংকট-সীমান্তে উল্লেখযোগ্য বহিরুৎপাত কিছু হয় নাই। পাঁচশত বৎসর পূর্বে হূণেরা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া জনসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে ; ভারতের সংস্কৃতি তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে জঠরস্থ করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর আর কেহ আসে নাই। আর কেহ আসিতে পারে এ চিন্তাও মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। ভারতের অগণিত রাজন্যবর্গ পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া, অবস্থা বিশেষে মৈত্রী মিতালি করিয়া মনের আনন্দে কাল কাটাইতেছিলেন। প্রজারাও মোটের উপর মনের সুখে ছিল। তাহাদের জীবনধারা অভ্যস্ত পরিচিত খাতে প্রবাহিত হইতেছিল।

৮৯৯ শকাব্দে সবক্তগীণ আসিয়া লাহোর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলেন। ৯২০ শকাব্দে আসিলেন মামুদ গজনী। ৯৪৬ হইতে ৯৪৮ শকাব্দের মধ্যে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হইল। ১১১৫ শকাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিলেন। মহারাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

ইহা ভারতের পশ্চিম প্রান্তের কথা। ভারতের পূর্বভাগে তখনও একটু আলো ছিল। ক্ষীণ চন্দ্রের আবছায়া আলো। সে আলোতে দূর পর্যন্ত দেখা যায় না, নিজের আঙিনাটুকু মাত্র দেখা যায়। আঙিনায় ফুল ফুটিয়াছিল, লবঙ্গলতার পরিশীলনে কোমল মলয়ানিল বহিতেছিল। মানুষ নিশ্চিন্ত মনে প্রেম করিতেছিল, গান গাহিতেছিল, শিল্প রচনা করিতেছিল। রাজারাও নিজেদের অভ্যস্ত খেলা খেলিতেছিলেন ; যুদ্ধবিগ্রহ, মৈত্রী মিতালি, রাজনৈতিক কূট-ক্রীড়া চলিতেছিল। কিন্তু আসন্ন দুর্যোগের অগ্রবর্তী ছায়া তাঁহাদের মুখের উপর পড়ে নাই। পশ্চিম ভারতে বিজাতীয় শত্রু প্রবেশ করিয়াছে এ সংবাদ যে তাঁহারা একেবারেই জানিতেন না তাহা নয়। তাঁহারা ঘরের ব্যবস্থা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বাহিরের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না।

পূর্ব ভারতের কেবল একটি মানুষ পশ্চিম প্রান্তে দুর্মদ আততায়ীর আবির্ভাব শঙ্কিত চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই মানুষটির নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

দুই

দীপঙ্কর বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গাল দেশের বিক্রমণিপুর মণ্ডলে বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁহার জন্ম ; জাতনাম চন্দ্রগর্ভ। অলৌকিক প্রতিভার বলে তিনি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের শিখরে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য অশেষবিৎ জ্ঞানী তৎকালীন ভারতে কেহ ছিল না। ভারতের বাহিরেও ছিল না। সুদূর চীন ও তিব্বত হইতে জ্ঞানভিক্ষুরা আসিতেন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া জ্ঞানভিক্ষা লইতে। তারপর দেশে ফিরিয়া গিয়া দিকে দিকে তাঁহার জয়গান করিতেন। তাঁহার লৌকিক নাম কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই উপাধিতে প্রথিত হইয়াছিলেন। সংক্ষেপে দীপঙ্কর। জ্ঞান-জ্যোতির আধার।

কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানের সাধনাতেই দীপঙ্করের সমস্ত প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই। কর্মশক্তিতেও তিনি অসামান্য ছিলেন। তাঁহার কর্মকাহিনীর স্মৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে বিধৃত আছে। ষাট বছর বয়সে তিনি হিমদুর্গম পথে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।

যে সময় এই আখ্যায়িকার আরম্ভ সে সময় দীপঙ্কর ছিলেন বিক্রমশীল বিহারের মহাচার্য। বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পাল রাজবংশের মুকুটমণি পরমসৌগত মহারাজ ধর্মপালদেব। তারপর দুই শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। পাল রাজবংশ বহু উত্থান পতনের ভিতর দিয়া শিলাসংকুল পথে আপন অদৃষ্টলিপি খোদিত করিতে করিতে চলিয়াছে। ধর্মপালের অধস্তন অষ্টমপুরুষ নয়পালদেব এখন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আসীন। নয়পালের পিতা মহীপালদেব পরাক্রান্ত পুরুষ ছিলেন, তিনি অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু মহীপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্য আবার সঙ্কুচিত হইয়া মগধের সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছে। পূর্বদিকে বঙ্গালদেশে স্বাধীন রাজারা মাথা তুলিয়াছেন। পশ্চিম ও দক্ষিণেও তাই। ভারতের পূর্বার্ধে সার্বভৌম নরপতি কেহ নাই।

মহীপালদেব দীপঙ্করকে বিক্রমশীলার মহাচার্যের আসনে বসাইয়াছিলেন। তারপর অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। দীপঙ্কর সগৌরবে উক্ত আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

বিক্রমশীল বিহার মগধের অঙ্গদেশে গঙ্গার তীরে অবস্থিত। উচ্চ শিলাপট্টের উপর প্রাচীর-বেষ্টিত বিস্তীর্ণ বিহারভূমি ; মধ্যস্থলে চৈত্য ঘিরিয়া বিশাল উপাসনাগৃহ। উপাসনাগৃহকে আবেষ্টন করিয়া ছয় দিকে ছয়টি দেবায়তন। সর্বশেষে সীমা-প্রাচীরের সমান্তরালে অষ্টোত্তরশত মন্দিরের শ্রেণী। একশত চৌদ্দজন আচার্য আছেন, তাঁহারা অগণিত বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেবল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রই নয়, বেদ ব্যাকরণ শব্দবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা যোগশাস্ত্র জ্যোতিষ সঙ্গীত, সকল বিদ্যারই পঠন-পাঠন হয়। সকলের উপরে আছেন সর্ববিদ্যার আধার মহাচার্য দীপঙ্কর। মহারাত্রির সায়াহ্নে নালন্দার গৌরব গরিমা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছে, কিন্তু বিক্রমশীল মহাবিহারের জ্ঞান-দীপ এখনও ভাস্বর শিখায় জ্বলিতেছে।

তিন

আজ হইতে নয় শতাব্দী পূর্বের একটি শারদ অপরাহ্ণ। বিক্রমশীল বিহারের পাষাণ-তট-লেহী গঙ্গার জল স্বচ্ছ হইয়াছে। গাঢ় নীল আকাশে একটি দুটি লঘু মেঘ ভাসিতেছে। গঙ্গার বুকে যেন ওই মেঘেরই প্রতিচ্ছবির ন্যায় একটি পাল-তোলা নৌকা। অস্তমান সূর্য পশ্চিম দিগন্তে স্বর্ণরেণুর প্রলেপ দিতেছে। চারিদিক শান্ত উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন।

বিহারভূমির মধ্যেও প্রসন্ন শান্তি বিরাজ করিতেছে। বিদ্যায়তনগুলি শূন্য, বিদ্যার্থীরা বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা বিহারে বাস করে তাহারা নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে অন্তর্হিত হইয়াছে। বিদ্যায়তন ও সীমান্ত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী শষ্পাকীর্ণ মাঠে চৈত্যচূড়ার ছায়া দীর্ঘতর হইতেছে। মাঠে ইতস্তত অশোক কদম্ব বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ। একটি বকুল বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া তিনজন আচার্য বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বাহিরে আর কাহাকেও দেখা যায় না। বিহারের অসংখ্য অধিবাসী এই সময়টিতে যেন বল্মীকের ন্যায় বিবরপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

চৈত্যচূড়ার চারিপাশে চতুষ্কোণ ছাদ, উপাসনাগৃহের স্তম্ভগুলি এই ছাদকে ধরিয়া রহিয়াছে। সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী বাহিয়া ছাদে উঠিতে হয় ; কিন্তু উপরে উঠিয়া আর সঙ্কীর্ণতা নাই, স্তম্ভের স্থূল চূড়া ঘিরিয়া প্রশস্ত ছাদ অঙ্গনের মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ছাদের এক কোণে একটি দারুনির্মিত প্রকোষ্ঠ ; অবশিষ্ট স্থান অসংখ্য মৃৎকুণ্ডে পূর্ণ। প্রত্যেকটি কুণ্ডে একটি করিয়া শিশুবৃক্ষ বা লতা ; চম্পা মল্লিকা জাতী কুরুবক শেফালী ; পারস্য দেশের দ্রাক্ষালতা, মহাচীনের চারুকেশর, তিব্বতের সূচীপর্ণ। মহাচার্য দীপঙ্কর এই দারু-প্রকোষ্ঠে বাস করেন এবং অবসরকালে শিশুবৃক্ষগুলিকে সন্তানস্নেহে লালন করেন।

আজ সায়াহ্নে তিনি ছাদের উপর একাকী পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিলেন। শাস্ত্রচিন্তা নয়, ধর্মচিন্তা নয়, নিতান্তই ঐহিক ভাবনা তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। কার্পাসের মত শুভ্র একখণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে মধ্যাকাশ হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছে। প্রথমে মেঘের প্রান্তে রক্তিমার স্পর্শ লাগিল, তারপর মেঘ পশ্চিম আকাশের লাবণ্য শোষণ করিয়া লইয়া সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিল। দীপঙ্কর দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনে বহিঃপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব পড়িতেছে না।

ষাট বৎসর বয়সে দীপঙ্করের মুখে জরার চিহ্নমাত্র নাই। মুখের গঠন দৃঢ় ; মস্তক ও শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডিত না হইলে যোদ্ধার মুখ বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। চক্ষু উজ্জ্বল অথচ শান্ত। দেহের আয়তন অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব বলা চলে, কিন্তু স্কন্ধ বাহু ও বক্ষ দৃঢ় পেশীবদ্ধ। পরিধানে পীতবর্ণ সংঘাটি স্কন্ধ হইতে জানু পর্যন্ত আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং দেহের মুক্ত অংশে চম্পকতুল্য বর্ণাভা সঞ্চারিত করিয়াছে। দীপঙ্করকে একবার দেখিলে তাঁহার পৌরুষই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, তাঁহাকে মহাতেজস্বী কর্মবীর বলিয়া মনে হয়। তিনি যে সকল বিদ্যার পারঙ্গম দিগ্বিজয়ী জ্ঞানবীর তাহা অনুমান করা যায় না।

ছাদে পরিক্রমণ করিতে করিতে দীপঙ্কর চিন্তা করিতেছিলেন—লোকজ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়...সত্য কথা...কিন্তু হিংসা ও আপৎ নিবারণ এক বস্তু নয়, রাগদ্বেষ অনুভব না করিয়া বিগতজ্বর হইয়া যুদ্ধ করা যায়। কিন্তু যুদ্ধ করিবে কে ? রাজার ইচ্ছায় যুদ্ধ। ভারতবর্ষের শতাধিক রাজা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করিতে ব্যস্ত। যে-সব রাজারা যুদ্ধ করিতে ভালবাসে তাহারাও বহিরাগত বর্বর আততায়ীর কথা ভাবে না, নিজের প্রতিবেশী রাজার গলা কাটিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। চাণক্যনীতি ! এই চাণক্যনীতি দেশের সর্বনাশ করিয়াছে।...মহীপালদেব ছিলেন দূরদর্শী রাজা ; তিনি বুঝিয়াছিলেন এই বিধর্মী দুর্বৃত্তগুলাকে সময়ে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে তাহারা সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিবে, আর্যাবর্তের অপৌরুষেয় সংস্কৃতি শোণিতপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে। মহীপাল তুরস্কদের দূর করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু দেশের দুরদৃষ্ট, তিনি বাঁচিলেন না। এখন কে দেশ রক্ষা করিবে ? নয়পাল মহীপালের পুত্র হইলেও পিতার ন্যায় ভবিষ্যচিন্তক নয়, যুদ্ধবিগ্রহেও রুচি নাই। অন্য যাহারা আছে তাহারা শৌর্যবীর্যে রণকৌশলে তুরস্কদের সমকক্ষ নয়। তুরস্কগণ নিষ্ঠুর যোদ্ধা, তাহার উপর ঘোর বিশ্বাসঘাতক। তাহাদের ধর্মজ্ঞান নাই ; যুদ্ধে তাহাদের কে পরাস্ত করিবে ? সমস্ত

banglabooks.in

আর্য রাজাগণ একত্র হইলে পরাস্ত করিতে পারে। কিন্তু আর্য রাজারা কখনও একত্র হইবে না, তাহারা একে একে মরিবে তবু একত্র হইবে না। আজ যদি একজন একচ্ছত্র চক্রবর্তী সম্রাট থাকিত ! অশোকের মত—হর্ষবর্ধনের মত—ধর্মপাল দেবপালের মত ! কিন্তু সে দিন আর নাই। একটি সিংহের পরিবর্তে ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক পাল ফেরু !...তুরস্করা অস্ত্রশস্ত্রেও ভারতবাসী অপেক্ষা উন্নত ; তাহাদের অসিতে ধার বেশি, ভল্ল অধিক তীক্ষ্ণ।...হায়, যদি রামায়ণ মহাভারতের অলৌকিক অস্ত্রের ন্যায় শতঘ্ন সহস্রঘ্ন বাণ থাকিত— ! সেকালে অগ্নিবাণ বরুণবাণ কি সত্যই ছিল ? না কবিকল্পনা ? হয়তো কিছু সত্য ছিল, কবিকল্পনারও অবলম্বন চাই।...যদি ঐরূপ অলৌকিক অস্ত্র বর্তমানে থাকিত দুর্ধর্ষ ম্লেচ্ছগুলাকে হিমালয়ের পরপারে তাড়াইয়া দেওয়া যাইত, রাজাদের সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন হইত না...

দীপঙ্করের চিন্তা কোনও দিকে নিষ্ক্রমণের পথ না পাইয়া নিষ্ফল কল্পনা বিলাসের চক্রপথ ধরিয়াছে এমন সময় সোপান বাহিয়া আর এক ব্যক্তি ছাদে উপস্থিত হইলেন। ইনি বিক্রমশীল বিহারের মহাধ্যক্ষ রত্নাকর শান্তি। বয়সে দীপঙ্কর অপেক্ষা কিছু বড়, জ্যেষ্ঠের অধিকারে দীপঙ্করকে নাম ধরিয়া ডাকেন ; কিন্তু সকল সময় গুরুর ন্যায় মান্য করেন। শরীর কিছু স্থূল, জরার প্রকোপে চর্ম লোল হইয়াছে ; মুখে বিপুল দায়িত্ব বহনের কিণচিহ্ন। বিক্রমশীল বিহারের সহস্র কর্মভারে অবনত এই বৃদ্ধের তুলনায় দীপঙ্করকে তরুণ বলিয়া মনে হয়।

রত্নাকরের কটিলম্বিত কুঞ্চিকাগুচ্ছের ঝুম ঝুম শব্দে দীপঙ্কর পরিক্রমণ স্থগিত করিয়া দাঁড়াইলেন। রত্নাকর তাঁহার কাছে আসিলেন, কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস টানিয়া বলিলেন—'আজকাল সিঁড়ি উঠতে হাঁফ ধরে।'

দীপঙ্কর উদ্বিগ্নচক্ষে রত্নাকরকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর কটিবদ্ধ কুঞ্চিকাগুচ্ছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—'ওই প্রকাণ্ড চাবির গোছা নিয়ে ছাদে উঠতে কার না হাঁফ ধরে ? সম্প্রতি চাবির গোছা কি আরও বেড়েছে ?—কিন্তু তুমি এলে কেন। ডেকে পাঠালেই তো আমি তোমার কাছে যেতাম।'

রত্নাকর হাত নাড়িয়া যেন ও প্রসঙ্গ সরাইয়া দিলেন, বলিলেন—'চন্দ্রগর্ভ, তিব্বতীরা আট দিন হল এসেছে, তাদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

দীপঙ্কর ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। তিব্বতীরা আসিয়াছে তিনি জানিতেন, কেন আসিয়াছে তাহাও অনুমান করিয়াছিলেন, তাই তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। এখন বলিলেন—'ওরা আবার এসেছে কেন ? গতবারে আমাকে তিব্বতে নিয়ে যেতে এসেছিল, আমি অস্বীকার করেছিলাম। আবার কি চায় ?'

রত্নাকর বলিলেন—'কিছু বলছে না। এবার তোমার জন্য অনেক উপঢৌকন এনেছে।'

দীপঙ্কর হাসিলেন—'উপঢৌকন !'

'হাঁ। তিব্বতের রাজা পাঠিয়েছেন। ওদের সঙ্গে আমার যা দু'চারটে কথা হয়েছে তা থেকে মনে হয় তিব্বতে ধর্মের গ্লানি বেড়ে গেছে, তুমি গিয়ে ধর্মসংস্থাপন করবে এই তাদের আশা। কিন্তু স্পষ্ট কিছু বলছে না। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'দেখা করব। কিন্তু তিব্বতরাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তো সম্ভব নয়। একবার না বলেছি, আবারও না বলতে হবে।'

'উপায় কি ?'

'বেশ, তুমি তাদের এখানেই পাঠিয়ে দাও।'

রত্নাকর কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন—'অতীশ, তুমি যদি তিব্বতে যাও তিব্বতে ধর্মের দীপ জ্বলে উঠবে, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে যাবে। অগণ্য তুরস্ক সৈন্য

ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। তিব্বতীদের মধুর বাক্যে সেকথা ভুলে যেও না।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'আমি থাকলেই কি তুরস্কদের রোধ করতে পারব ?'

'তবু তো আপৎকালে তুমি কাছে থাকবে।'

'ভয় নেই, আমি তিব্বতে যাব না। তুমি ওদের পাঠিয়ে দাও।'

রত্নাকর নামিয়া গেলেন। অর্ধদণ্ড পরে চারিজন তিব্বতী ভিক্ষু ছাদে উপস্থিত হইলেন। তিব্বতীদের যিনি অগ্রণী তাঁহার নাম আচার্য বিনয়ধর, তিব্বতী নাম ট্‌ষল্‌ খ্রিম গ্যাল্‌বা। তাঁহার সহচরগণ একটি গুরুভার বেত্র-পেটিকা ধরাধরি করিয়া আনিতেছে।

বিনয়ধর ভূমিষ্ঠ হইয়া দীপঙ্করকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার সঙ্গীরাও করিলেন। দীপঙ্কর সকলকে আলিঙ্গন করিলেন।

তখন সূর্যাস্ত হইয়াছে, কিন্তু ছাদের উপর যথেষ্ট আলো আছে। দীপঙ্কর তাঁহার দারুকক্ষ হইতে তৃণাস্তরণ আনিয়া পাতিয়া দিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

কিছুক্ষণ শিষ্টাচার ও কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর বিনয়ধর বলিলেন—'আর্য, গতবার যাঁর আজ্ঞায় আপনার চরণদর্শন করতে এসেছিলাম সেই তিব্বতরাজ লাহ-লামা-যে-শেস্‌-এর মৃত্যু হয়েছে। বড় শোচনীয় তাঁর মৃত্যু, সে কাহিনী পরে আপনাকে জানাব। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আপনাকে একটি পত্র লিখেছিলেন, সে-পত্রও আমি সঙ্গে এনেছি, যথাকালে নিবেদন করব। বর্তমান রাজা চান্‌-চুব পূর্বতন রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র। এবার তিনিই আমাদের পাঠিয়েছেন।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'ভাল। নূতন তিব্বতরাজ সদ্ধর্মে নিষ্ঠাবান জেনে সুখী হলাম। কিন্তু তিনি আবার আপনাদের এই দুর্গম পথে কেন পাঠিয়েছেন আচার্য ?'

আচার্য বিনয়ধর একটু হাস্য করিলেন। তাঁহার কৃশ দেহ, অস্থিসার মুখ এবং তির্যক চক্ষু দেখিয়া মনে হয় না যে তাঁহার প্রাণে বিন্দুমাত্র রস আছে ; কিন্তু তাঁহার শান্ত অত্বরিত বাক্‌ভঙ্গিতে এমন একটি মসৃণ সমীচীনতা আছে যাহা প্রবীণ রাষ্ট্রদূতগণের মধ্যেও বিরল। তিনি ধীরস্বরে বলিলেন—'বারবার একই প্রস্তাব নিয়ে আপনার সম্মুখীন হতে আমি বড় সঙ্কুচিত হচ্ছি আর্য। কিন্তু ও কথা এখন থাক। আমাদের নবীন রাজা আপনাকে যে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন তাই আগে নিবেদন করি।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'কিন্তু আমাকে উপঢৌকন কেন ? আমি তো রাজা নই, সামান্য ভিক্ষু।'

বিনয়ধর বলিলেন—'আপনি রাজার রাজা, রাজাধিরাজ।'

বিনয়ধর ইঙ্গিত করিলেন, বাকি তিনজন ভিক্ষু বেত্র-পেটিকাটিকে তুলিয়া দীপঙ্করের সম্মুখে রাখিল এবং ডালা খুলিয়া দিল। দীপঙ্কর দেখিলেন পেটিকাটি কপিত্থ ফলের ন্যায় গোলাকৃতি বস্তুতে পূর্ণ। গোলকগুলি পোড়া মাটি দিয়া প্রস্তুত মনে হয়। দীপঙ্কর ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ উত্থিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—'এ কী বস্তু ?'

বিনয়ধর পেটিকা হইতে একটি গোলক তুলিয়া লইয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন—'আর্য, এর নাম অগ্নিকন্দুক। চীন দেশ থেকে কারুকর আনিয়ে আমাদের রাজা এই কন্দুক নির্মাণ করিয়েছেন। এর সাহায্যে আপনি বিধর্মী তুরস্কদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারবেন।'

দীপঙ্কর বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই নিম্নে বিহারভূমি হইতে বহুজনের রূঢ় কলকোলাহল আসিল।

চার

শান্তরসাস্পদ বিহারভূমিতে দিবাবসানকালে বহু নরকণ্ঠের উগ্র কোলাহল কোথা হইতে আসিল তাহার বৃত্তান্ত কিছু পূর্ব হইতে জানা প্রয়োজন।

পাল রাজা যেমন মগধে রাজত্ব করিতেন, তেমনি মগধের দক্ষিণ-পশ্চিমে নর্মদাতীরে চেদি রাজ্য ছিল ; কলচুরি-রাজ লক্ষ্মীকর্ণ সেখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নাম ত্রিপুরী। নয়পাল ও লক্ষ্মীকর্ণের মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। লক্ষ্মীকর্ণের পিতা গাঙ্গেয়দেব এবং নয়পালের পিতা মহীপাল অক্লান্তভাবে সারা জীবন পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ মধ্যবয়সে রাজা হইয়া মহানন্দে পিতৃব্রত মাথায় তুলিয়া লইলেন। তিনি অতি ধূর্ত ও দুষ্টবুদ্ধি লোক ছিলেন। প্রকাণ্ড দেহ, হস্তিতুল্য বলশালী ; নানাপ্রকার ব্যসনের মধ্যে যুদ্ধকার্যই ছিল তাঁহার প্রধান ব্যসন। তিনি ধর্মে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু সেকালে বৈষ্ণব বলিলে বিষ্ণু-উপাসক বুঝাইত, পরবর্তী কালের কণ্ঠিধারী নিরামিষ বৈষ্ণব বুঝাইত না। লক্ষ্মীকর্ণ প্রত্যহ অন্যান্য খাদ্যাখাদ্যের সহিত একটি আস্ত ময়ূর ভক্ষণ করিতেন এবং প্রচুর মদ্যপান করিতেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না ; কেবল দুই কন্যা, বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী। পাটরানীর মৃত্যুর পর আর মহিষী গ্রহণ করেন নাই ; রাজপুরীর দাসী কিঙ্করীরা কেহ কেহ উপ-মহিষী হইয়া থাকিত। আত্মসুখ ও পরনিগ্রহ ভিন্ন লক্ষ্মীকর্ণদেবের অন্য চিন্তা ছিল না।

অপরপক্ষে নয়পাল ছিলেন ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তিনিও মধ্যবয়সে রাজা হইয়াছিলেন ; পিতার জীবনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার যুদ্ধে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। তাই তিনি ক্ষাত্রতেজ সংবরণ করিয়া যেটুকু পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। অবসরকালে পট্ট মহিষীর সহিত পাশা খেলিতেন, অথবা বৌদ্ধ আচার্যদের ডাকিয়া তন্ত্রের গূঢ় প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। যুবরাজ বিগ্রহপালের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে, একথা মহিষী বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিলেও নয়পাল সেদিকে কর্ণপাত করিতেছিলেন না। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ, পুত্রের বিবাহ দিতে গেলে রাজকন্যা অন্বেষণ করিতে হইবে, বিবাহ উৎসবে সমস্ত রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে, দীর্ঘকালব্যাপী একটা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড চলিবে ; তাই কর্তব্য বুঝিয়াও নয়পালের মন পরাঙ্মুখ হইয়া ছিল। তিনি এমন প্রকৃতির লোক যে বাহির হইতে প্রবল খোঁচা না খাইলে কোনও কাজে অগ্রসর হইতে পারেন না।

লক্ষ্মীকর্ণ নয়পালের শান্ত নির্বিরোধ প্রকৃতির কথা জানিতেন। তদুপরি একটা গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাইলেন যে পাটলিপুত্রে নয়পাল অনেকগুলি তান্ত্রিক সাধুকে লইয়া মাতিয়াছেন, দিবারাত্র গোপনে বীরাচারের অভ্যাস চলিয়াছে ; তাঁহার সৈন্যগণও অবিন্যস্ত, যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত। লক্ষ্মীকর্ণের মন অনেকদিন যাবৎ যুদ্ধ করিবার জন্য উস্‌খুস্ করিতেছিল, কেবল সুযোগের অভাবে এতদিন লাগিয়া পড়িতে পারেন নাই। তিনি দেখিলেন এই সুযোগ। এক মাসের মধ্যে ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য, এই ফাঁকে মগধের দক্ষিণে অঙ্গদেশটা দখল করিয়া বসিবেন। সংবাদ পাইয়া নয়পাল যদি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আসে তখন দেখা যাইবে।

লক্ষ্মীকর্ণ বুদ্ধিটা ভালই খেলাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিসাবে একটু ভুল ছিল। তাঁহার গুপ্তচর পাটলিপুত্র হইতে ত্রিপুরীতে আসিতে একপক্ষ কাল লইয়াছিল, তিনি নিজে সৈন্য সাজাইয়া যাত্রা করিতে এক মাস লইয়াছিলেন ; তারপর সসৈন্যে অঙ্গদেশে পৌঁছিতে আরও এক মাস লাগিয়াছিল। এই আড়াই মাসে পাটলিপুত্রের পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

তান্ত্রিকেরা এক মাস চেষ্টা করিয়াও যখন ভৈরবীচক্রে দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটাইতে পারিল না তখন নয়পাল বীতশ্রদ্ধ হইয়া তান্ত্রিকদের তাড়াইয়া দিলেন। তারপর সপরিবারে সেনা পরিবৃত হইয়া চম্পা নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চম্পা অঙ্গদেশের প্রধানা নগরী।

এইখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। পাল রাজাদের কোনও স্থায়ী রাজধানী বা মহাস্থানীয় ছিল না। পাল রাজ্যকালের আরম্ভে ধর্মপাল ও দেবপাল প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এক স্থানে বসিয়া এই বিপুল ভূভাগ শাসন করিবার সুবিধা ছিল না। তাই তাঁহারা সৈন্যসামন্ত অমাত্য সচিব শ্রেষ্ঠী পরিষৎ সঙ্গে লইয়া সাম্রাজ্যের একস্থান হইতে স্থানান্তরে পর্যটন করিয়া বেড়াইতেন। বারাণসী মুদ্‌গগিরি গৌড় মহাস্থান, যখন যেখানে যাইতেন সেখানে অস্থায়ী রাজধানী বা স্কন্ধাবার বসিত। কিন্তু কালক্রমে যখন পালরাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া মগধের সীমানায় আবদ্ধ হইল তখনও রাজা পুরাতন রীতি ত্যাগ করিলেন না। পাটলিপুত্রে রাজার স্থায়ী পীঠ রহিল বটে কিন্তু মাঝে মাঝে রাজা রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইয়া পড়িতেন। ভ্রমণও হইত, দূরস্থ রাজকর্মচারীদের উপর দৃষ্টিও রাখা চলিত।

যা হোক, নয়পাল মন্দ মন্থরগতিতে চম্পার দিকে আসিতেছেন, ওদিকে লক্ষ্মীকর্ণ যথাসম্ভব চুপিচুপি আসিতেছেন; চম্পা নগরীর সন্নিকটে উভয়পক্ষে দেখা হইয়া গেল। নয়পাল লক্ষ্মীকর্ণের এই তঞ্চকতায় অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগ হইলে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ক্ষাত্রতেজ বিস্ফুরিত হয়, তিনি আক্রমণের আজ্ঞা দিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ ভাবিলেন নয়পাল তাঁহার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে, নিশ্চয় তাহার সঙ্গে বিশ হাজার সৈন্য আছে। নয়পালের দলে অধিকাংশ লোকই যে অসামরিক তাহা তিনি কি করিয়া জানিবেন? তিনি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যরাও মন দিয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না, দুই চারি ঘা মার খাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

পলায়ন ছাড়া লক্ষ্মীকর্ণের আর গত্যন্তর রহিল না। তিনি অল্পাধিক এক সহস্র সৈন্য লইয়া পূর্বদিকে পলাইয়া চলিলেন। নয়পালের তখন রোখ চড়িয়া গিয়াছে, তিনি অসামরিক সহচরদের পিছনে রাখিয়া দুই সহস্র সৈন্য সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পুত্র বিগ্রহপাল সঙ্গে রহিল।

নয়পাল কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণকে ধরিতে পারিলেন না। লক্ষ্মীকর্ণ পলায়ন করিতে করিতে গোধূলি কালে বিক্রমশীল বিহারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার মাথায় আর একটি বুদ্ধি খেলিয়া গেল। নয়পাল ধর্মে বৌদ্ধ, তিনি কখনই সশস্ত্র সৈন্য লইয়া বিহারভূমিতে প্রবেশ করিবেন না। অতএব—

বিহারভূমিতে প্রবেশের কোনই বাধা নাই; প্রাচীরগাত্রে বিস্তৃত উন্মুক্ত তোরণদ্বার, যে-কেহ যখন ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে। লক্ষ্মীকর্ণ সদলবলে বিহারভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

ইহাদেরই রূঢ় কোলাহল দীপঙ্কর ছাদ হইতে শুনিয়াছিলেন।

নয়পাল যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন মূষিক বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি পবিত্র বিহারভূমিতে সৈন্য লইয়া পদার্পণ করিলেন না, তোরণের বাহিরে অনতিদূরে থানা দিয়া বসিলেন।

পাঁচ

দীপঙ্কর ছাদের কিনারায় গিয়া দেখিলেন বন্যার ঘোলা জলের ন্যায় সৈন্যস্রোত তোরণপথে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সন্ধ্যার আলোয় ঝিকঝিক করিতেছে। দীপঙ্কর ত্বরিতে নীচে নামিয়া গেলেন। তিব্বতী চারিজন তাঁহার পিছনে রহিলেন।

নীচে তখন ভারি গণ্ডগোল। সংঘভূমির চারিদিকে লোক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। সংঘের যাহারা বাসিন্দা তাহারা নিজ নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিয়াছে, ভয়ার্তেরা নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কয়েকটা মশাল জ্বলিয়া উঠিল ; মশালগুলা অন্ধকারে আলেয়ার অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় শূন্যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দীপঙ্কর নামিয়া আসিয়া চারিদিকে চাহিলেন। মশালের আলো সত্ত্বেও মনে হয় অসংখ্য প্রেত ছুটাছুটি করিতেছে। একস্থানে তিনি লক্ষ্য করিলেন কয়েকটা মশাল স্থির হইয়া আছে এবং কয়েকটি লোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। একজন লোকের আকৃতি বিশাল, সে মেঘমন্দ্র স্বরে আদেশ দিতেছে, অন্য সকলে সেই আদেশ পালনের জন্য দৌড়িতেছে। দীপঙ্কর সেইদিকে গেলেন ; দেখিলেন শালপ্রাংশু ব্যক্তি ও তাহার আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে সকলের অঙ্গে লৌহজালিক, হস্তে তরবারি। সুতরাং ইহারাই এই সৈন্যদলের অধিনায়ক সন্দেহ নাই। দীপঙ্কর তাহাদের সম্মুখীন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরা কারা ? পবিত্র বিহারক্ষেত্রে তোমাদের কী প্রয়োজন ?'

শালপ্রাংশু ব্যক্তি দীপঙ্করের দিকে ব্যাঘ্র-দৃষ্টি ফিরাইলেন। মশালের অস্থির আলোকে তাঁহার বৃহৎ মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর দেখাইল। তিনি রূঢ়স্বরে বলিলেন—'তুমি কে ?'

দীপঙ্কর ধীরকণ্ঠে বলিলেন—'আমি বিক্রমশীল বিহারের একজন ভিক্ষু। তুমি কে ?'

ব্যাঘ্র-চক্ষু ব্যক্তির মুখ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এই ধৃষ্ট ভিক্ষুটাকে হত্যা করা কর্তব্য কিনা তিনি এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময় তাঁহার পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি কথা কহিল। তরুণকান্তি যুবক, যোদ্ধৃবেশ সত্ত্বেও তাহাকে যোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না। সে বলিল—'ইনি ত্রিপুরীর মহারাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মীকর্ণদেব।'

দীপঙ্করের ভ্রূ বিস্ময়ে ঈষৎ উত্থিত হইল। তিনি বলিলেন—'চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণদেব ! মহারাজ, আপনি নিজ রাজ্য থেকে বহুদূরে এসে পড়েছেন।'

ভিক্ষুটা তাঁহাকে চেনে দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণের মন একটু নরম হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় কূটবুদ্ধিরও উদয় হইল। সংঘভূমিতে রক্তপাত করিয়া লাভ নাই ; বিশেষত নয়পাল পিছনে বসিয়া আছে। বরং মিষ্টকথায় যদি কার্যসিদ্ধি হয় সেই চেষ্টাই করিয়া দেখা যাক না। তিনি কণ্ঠস্বরে প্রসন্নতা আনিয়া বলিলেন—'তুমি আমার নাম জান, তুমি তো সামান্য ভিক্ষু নও। তোমার নাম কি ?'

শীর্ণকায় বিনয়ধর দীপঙ্করের পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলিলেন—'ইনি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, এই বিহারের মহাচার্য।'

লক্ষ্মীকর্ণ চকিত হইলেন। অতীশ দীপঙ্করের নাম জানে না এমন মানুষ তখন ভারতে ছিল না। লক্ষ্মীকর্ণের পাশে যে দাঁড়াইয়া ছিল তাহার চক্ষে সম্ভ্রম ফুটিয়া উঠিল। লক্ষ্মীকর্ণ মস্তক ঈষৎ আনত করিয়া বলিলেন—'আপনি অতীশ দীপঙ্কর ! ধন্য।'

দীপঙ্কর স্থির নেত্রে লক্ষ্মীকর্ণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মহারাজ, আপনি কি মগধ আক্রমণ করেছেন ?'

মহারাজ দুই হাত নাড়িয়া উচ্চহাস্য করিলেন। হাস্য করিলে তাঁহার মুখখানি অশোকস্তম্ভের শীর্ষস্থিত সিংহের মুখের মত দেখায়। তিনি অসি কোষবদ্ধ করিয়া বলিলেন—'না না, সে কি কথা! আমরা মৃগয়ায় বেরিয়েছিলাম, পথ ভুলে মগধের সীমানায় ঢুকে পড়েছি।'

কথাটা এতই মিথ্যা যে তাঁহার পার্শ্বস্থ যুবক এবং অন্য লোকগুলি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিল। লক্ষ্মীকর্ণ কিন্তু তিলমাত্র লজ্জিত না হইয়া সহাস্যমুখে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দীপঙ্করের মুখেও একটু হাসির আভাস দেখা দিল। তিনি বলিলেন—'বিক্রমশীল বিহারেও কি মহারাজ মৃগয়ার উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়েছেন?'

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'না, নিরুপায় হয়ে ঢুকেছি। আমাদের সঙ্গে যা খাদ্য ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই আপনার আশ্রয় নিয়েছি। মহাশয়, আপনি ধার্মিক ব্যক্তি, আমরা নিরাশ্রয়। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করুন।' নয়পালের তাড়া খাইয়া যে তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন সে কথা লক্ষ্মীকর্ণ চাপিয়া গেলেন।

এই সময় বিহারের একজন শ্রমণ সেইদিক দিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে মশালের আলোকে দীপঙ্করকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কাছে আসিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—'মহাচার্য, দস্যুরা আর্য রত্নাকর শান্তির কাছ থেকে কুঞ্চিকা কেড়ে নিয়ে অন্নকোষ্ঠ লুণ্ঠন করছে।'

দীপঙ্করের মুখ কঠিন হইল। তিনি লক্ষ্মীকর্ণকে বলিলেন—'এই কি আশ্রয় যাঞার রীতি?'

লক্ষ্মীকর্ণ আবার অট্টহাস্য করিলেন, তারপর ছদ্ম বিনয়ের ব্যঙ্গবঙ্কিম স্বরে বলিলেন—'ওরা ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্তের অন্নস্পৃহা স্বাভাবিক। আপনি ওদের ক্ষমা করুন।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ, ধর্মের প্রতি যদি আপনার নিষ্ঠা থাকে এই দণ্ডে আপনার অনুচরদের বিহারভূমি ত্যাগ করতে আদেশ করুন।'

লক্ষ্মীকর্ণের মুখ আবার গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন—'অসম্ভব। আমাদের আশ্রয় এবং খাদ্যের প্রয়োজন।'

'বিহার ত্যাগ করবেন না?'

'না।' লক্ষ্মীকর্ণ ব্যাঘ্র-চক্ষু মেলিয়া একবার দীপঙ্করকে দেখিলেন, তারপর নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন।

দীপঙ্করের অন্তর ব্যর্থতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুর্বৃত্তদের দমন করিবার কোনও অহিংস পন্থা কি নাই; তথাগত, তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে বলিয়াছ, কিন্তু—

বিনয়ধর চুপি চুপি তাঁহার কানে বলিলেন—'মহাচার্য, যদি আদেশ করেন আমরা এদের তাড়াবার চেষ্টা করতে পারি।'

দীপঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া কিছুক্ষণ বিনয়ধরের পানে চাহিয়া রহিলেন, কি করিয়া বিনয়ধর এতগুলা বর্বরকে তাড়াইবেন বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন—'চেষ্টা করুন।'

বিনয়ধর ও তাঁহার তিব্বতী সঙ্গীরা নিঃশব্দে সংঘের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দীপঙ্কর দাঁড়াইয়া রহিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ আর তাঁহার দিকে ফিরিলেন না, নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। মশালধারীরা মশাল ঊর্ধ্বে তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিল। লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে যুবক ব্যতীত আর যে কয়জন পুরুষ ছিল তাহারা সকলেই বয়স্থ এবং পুষ্টদেহ; বোধহয় তাহারা লক্ষ্মীকর্ণের সেনাধ্যক্ষ। লক্ষ্মীকর্ণ তাহাদের সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে বোধকরি কূট-পরামর্শ করিতেছেন। যুবক একটু দূরে সরিয়া গিয়া এদিক ওদিক কৌতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর আচম্বিতে এই মশালবিদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে যে কাণ্ড আরম্ভ

হইল তাহার বর্ণনা করা দুষ্কর। হঠাৎ দুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল ; মাটি হইতে খানিকটা আগুন ছিটকাইয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূরে আবার দুম্ করিয়া শব্দ এবং আগুনের উচ্ছ্বাস ! মাটি কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিহারভূমির চতুর্দিক বিকট দুম্‌দাম্ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন অনৈসর্গিক শব্দ কেহ কখনও শোনে নাই। যেন ভূগর্ভ ফাটিয়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘোর শব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে।

শুধু শব্দই নয়। হঠাৎ আগুনের একটা সাপ স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতে করিতে মাটির উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আর একটা ! আর একটা ! চারিদিকে বিসর্পিত স্ফুলিঙ্গ কিল্‌বিল্ করিতে লাগিল।

প্রথম দুইবার বিকট শব্দ হইবার পরই মশালধারীরা মশাল ফেলিয়া দৌড় মারিয়াছিল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। এ কী বীভৎস ব্যাপার ! বৌদ্ধরা কি পিশাচসিদ্ধ ! এরূপ প্লীহা-চমকপ্রদ শব্দ ও আগুনের খেলা প্রেত-পিশাচ ছাড়া আর কে সৃষ্টি করিতে পারে ? লক্ষ্মীকর্ণদেব যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও ভয় পান নাই, কিন্তু আজ তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল।

দুম্ দাম্ দড়াম্ শব্দের ফাঁকে ভয়ার্ত চিৎকার আসিতে লাগল। লক্ষ্মীকর্ণের সৈন্যগণ কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়িতে ছাড়িতে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে যেদিকে পাইল পলাইল, কেহ প্রাচীর ডিঙাইয়া ছুট দিল, কেহ অন্ধ ত্রাসে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বিহারভূমি শূন্য হইয়া গেল। কেবল লক্ষ্মীকর্ণ ও তাঁহার সহচরগণ অভিভূত বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দীপঙ্করও কম অভিভূত হন নাই। কিন্তু তিনি অস্পষ্টভাবে ব্যাপার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

দুম্ দাম্ শব্দ কমিয়া আসিতেছে। হঠাৎ লক্ষ্মীকর্ণের পশ্চাদ্দেশে ফর্‌র্ শব্দ করিয়া আগুনের একটা উৎস জ্বলিয়া উঠিল, যেন ভূতলস্থ কোনও ছিদ্রপথে অগ্নিশ্বাস রাক্ষস ফুৎকার দিতেছে। লক্ষ্মীকর্ণ সভয়ে পলাইতে গিয়া পড়িয়া গেলেন ; আবার উঠিয়া পলায়নের চেষ্টা করিবেন এমন সময় একজন সেনাধ্যক্ষ তাঁহার পিঠের উপর পড়িল। তার উপর আর একজন পড়িল। সর্বোপরি পড়িল যুবক। সকলে মিলিয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিলেন।

মশালগুলি নিভিয়া গিয়াছে ; দুম্ দাম্ শব্দ প্রায় থামিয়া আসিয়াছে ; আগুনের উৎস আর স্ফুরিত হইতেছে না। চারিদিক ঘোর অন্ধকার।

দীপঙ্করের স্বর শোনা গেল—'মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ, আপনি আছেন তো ?'

মাটির নিকট হইতে লক্ষ্মীকর্ণের উত্তর আসিল—'এই যে আমি এখানে। মহাচার্যদেব, আপনার পিশাচদের সম্বরণ করুন।'

অন্ধকারে দীপঙ্কর হাসিলেন।

সংঘের ভিতর হইতে একটি আলোকবর্তিকা বাহির হইয়া আসিতেছে। কাছে আসিলে দেখা গেল, তিব্বতী আচার্য বিনয়ধর দীপ হস্তে আসিতেছেন। দীপের প্রভায় দেখা গেল, লক্ষ্মীকর্ণ সপারিষৎ মৃত্তিকার উপর উপবিষ্ট আছেন।

দীপঙ্কর বলিলেন—'মহারাজ, আপনার সৈন্যেরা বোধহয় আপনার অনুমতি না নিয়েই বিহারভূমি ত্যাগ করেছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ দীপঙ্করের কথা শুনিতে পাইলেন কিনা সন্দেহ। তিনি পূর্বে কখনও তিব্বতী দেখেন নাই, প্রদীপের আলোয় বিনয়ধরের মুখ দেখিয়া তাঁহার বুক গুরুগুরু করিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন—পিশাচ। দীপঙ্করের পোষা পিশাচ। তিনি হাত জোড় করিয়া কম্পিত স্বরে

বলিলেন—'আচার্য দীপঙ্কর, আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি যা বলবেন তাই শুনব।'

দীপঙ্কর মৃদু হাস্যে বলিলেন—'ভয় নেই। আসুন আমার সঙ্গে। অস্ত্র ত্যাগ করে আসুন।'

ছয়

নয়পাল তাঁহার দুই সহস্র সৈন্য লইয়া বিহার-তোরণ হইতে তিন-চারি রজ্জু দূরে বসিয়াছিলেন। রাত্রি আসন্ন, সঙ্গে রাত্রিবাসের উপযোগী বস্ত্রাবাস আচ্ছাদন কিছুই নাই, লক্ষ্মীকর্ণকে তাড়া করিবার সময় সবই পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আজ রাত্রিটা নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে কাটাইতে হইবে।

শুধু তাহাই নয়। প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে সামরিক নিয়মানুযায়ী এক বেলার খাদ্য, অর্থাৎ দুই মুষ্টি চণক বা তণ্ডুল বা যবচূর্ণ আছে বটে, কিন্তু রাজা বা রাজপুত্রের সঙ্গে কণামাত্র আহার্য নাই; অতএব পেটে কিল মারিয়া রাত্রিযাপন করা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। সঙ্গে যে কয়জন সেনানী আছেন তাঁহাদেরও সেই অবস্থা।

মহারাজ নয়পাল তাহাতে বিশেষ বিচলিত হন নাই। তিনি বয়স্থ ব্যক্তি, জঠরের অগ্নি মন্দ হইয়াছে; পবিত্র গঙ্গাজল পান করিয়া তাঁহার চলিয়া যাইবে। তিনি লক্ষ্মীকর্ণের উদ্দেশ্যে কিছু গালিগালাজ বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। সেনানীরাও সৈন্যদের কাছে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া যাহোক একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু যুবরাজ বিগ্রহপাল?

বিগ্রহপাল যুবাপুরুষ, জঠরাগ্নি বিলক্ষণ প্রবল। সৈনিকদের নিকট কণা-ভিক্ষা তিনি প্রাণ গেলেও করিবেন না। তাই সারারাত্রি না খাইয়া কাটাইবার সম্ভাবনায় তাঁহার মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। রাজপুত্রদের উপবাস করার অভ্যাস কোনও কালেই নাই।

বিগ্রহপালের বয়স এই সময় কুড়ি বৎসর। উজ্জ্বল কাংসফলকের ন্যায় শুক্লপীতাভ দেহের বর্ণ, নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব আকৃতি, মুখে পৌরুষের লাবণ্য। রাজপুত্র বটে, কিন্তু দেহে যেমন লেশমাত্র মেদ নাই, মনে তেমনি বিন্দুমাত্র অভিমান নাই। ক্রীড়াচটুল কৌতুকোচ্ছল প্রগল্‌ভ প্রকৃতি। রাজপুত্রদের মধ্যে এরূপ প্রকৃতি প্রায়শঃ দেখা যায় না; বোধকরি বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বর্তমানে যুবরাজ ক্ষুৎপীড়িত অবস্থায় বিচরণ করিতেছেন। অন্ধকারে সৈন্যগণ মাটির উপর বসিয়া শুষ্ক শস্য চিবাইতে চিবাইতে গল্প করিতেছিল; মহারাজ তাঁহার সেনানীদের লইয়া সৈন্য-মণ্ডলীর মাঝখানে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু যুবরাজ সৈন্যচক্রের মাঝখানে নিরাপদ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই, চক্রের বাহিরে আসিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। পশ্চিমে দিনের চিতা নিভিয়া গিয়াছে। অদূরে গঙ্গার স্রোতঃপ্রবাহ দেখা যাইতেছে না কিন্তু তাহার কলধ্বনি কানে আসিতেছে। সম্মুখে বিহারের উর্ধ্বোত্থিত চূড়া বিপুলায়তন প্রস্তরীভূত অন্ধকারের আকার ধারণ করিতেছে; বিহারভূমি হইতে কোলাহলের শব্দ আসিতেছে...কয়েকটি মশাল জ্বলিয়া উঠিল...

সেনা-মণ্ডলীর সীমান্ত পরিক্রমণ করিতে করিতে যুবরাজ বিগ্রহপাল চিন্তা করিতেছিলেন—বুড়া লক্ষ্মীকর্ণ একটা গ্রন্থিচ্ছেদক...চোর...দিব্য বিহারে ঢুকিয়া চর্ব্যচুষ্য খাইতেছে, আর আমরা...দূর হোক। আজ যদি প্রিয়বয়স্য অনঙ্গপাল সঙ্গে থাকিত নিশ্চয় একটা বুদ্ধি বাহির করিত...অন্ধকারে চুপি চুপি বিহারে ঢুকিয়া পড়িলে কেমন হয়? আমাকে তো কেহ চেনে না। ...কিন্তু পিতৃদেবের নিষেধ সশস্ত্রভাবে বিহারে প্রবেশ করিবে না। ...কী উপায়! আজ রাত্রে খাদ্যসংগ্রহ করিতেই হইবে। নিরস্ত্র হইয়া বিহারে প্রবেশ করিলে কেমন হয়? একবার আর্য

দীপঙ্করের কাছে পৌঁছিতে পারিলে আর ভয় নাই...কিন্তু আর্য দীপঙ্কর কিরূপ আছেন কে বলিতে পারে ! হয়তো মহাপিশুন লক্ষীকর্ণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তা যদি করিয়া থাকে, পাষণ্ডের মুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিব...

এই সব চিন্তার জালে বিগ্রহপালের মন জড়াইয়া গিয়াছে এমন সময় বিহারভূমি হইতে বিকট শব্দ আসিল—দুম্ ! তারপর দ্রুত পরম্পরায়—দুম্ দাম্ দড়াম্ ! নয়পালের দুই হাজার সৈন্য একযোগে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ কি ভয়ানক শব্দ ! সকলে কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া বিহারের দিকে চাহিয়া রহিল। শব্দটা বিহারের প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ আছে তাই কেহ পলায়ন করিল না, নচেৎ অবশ্য পলায়ন করিত। বিগ্রহপাল ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন, তারপর কটি হইতে তরবারি খুলিয়া ফেলিয়া দ্রুতহস্তে দেহের বর্মচর্ম মোচন করিতে লাগিলেন। যেখানে উত্তেজক ব্যাপার ঘটিতেছে সেখান হইতে বিগ্রহপালকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব।

দুম্ দাম্ শব্দ চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাহার সহিত ভীত মনুষ্যকণ্ঠের কলকল শব্দ মিশিল। তারপর বিহারের চারিদিক হইতে ছায়ামূর্তির মত মানুষ ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল ; বল্মীকস্তূপের উপর পদাঘাত করিলে যেমন পিল্‌পিল্ করিয়া কীট বাহির হয় তেমনি। নয়পালের সৈন্যদল যেখানে যূথবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল সেদিকে কেহ আসিল না, বিভিন্ন দিকে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

বিগ্রহপালের কৌতূহল ও আগ্রহ আর বাধা মানিল না। পিতার অনুমতি লইতে গেলে অনেক সময় লাগিবে, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিহারের দিকে ছুটিলেন। দুম্ দাম্ শব্দ এতক্ষণে থামিয়া আসিয়াছে, পলায়মান মানুষগুলাও অদৃশ্য হইয়াছে।

বিগ্রহপাল বিহার-তোরণের সম্মুখে যখন পৌঁছিলেন তখন বিহার নিস্তব্ধ ও অন্ধকার। বিড়ালের ন্যায় লঘুপদক্ষেপে তিনি সোপান অতিক্রম করিয়া বিহারভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

বিহারভূমি জনশূন্য, কেবল একটি কটু ধূমের গন্ধ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বিগ্রহপাল বিহারের কেন্দ্রস্থিত ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি পূর্বে কয়েকবার পিতার সঙ্গে বিক্রমশীল বিহারে আসিয়াছেন, স্থানটি তাঁহার অপরিচিত নয়। মহাচার্য দীপঙ্কর ছাদের কাষ্ঠ-প্রকোষ্ঠে বাস করেন তাহাও তিনি জানেন। তবু ছাদে উঠিবার সিঁড়িটা সহসা খুঁজিয়া পাইলেন না। একে সূচীভেদ্য অন্ধকার, তার উপর কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই।

সতর্কভাবে এদিক ওদিক হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে সহসা দূরে আলোকের প্রভা তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি অতি সন্তর্পণে সেইদিকে চলিলেন। সংঘ শত্রু কিম্বা মিত্র কাহার অধিকারে তাহা জানা নাই, সাবধানে চলা ভাল।

আলোকপ্রভার কাছাকাছি আসিয়া তিনি দেখিলেন একটি প্রকোষ্ঠে তিন-চারিটি দীপ জ্বলিতেছে, কয়েকজন লোক আহারে বসিয়াছে। দুইজন ভিক্ষু পরিবেশন করিতেছে। ভোক্তাদের মধ্যে একজন বিশালকায় পুরুষ গোগ্রাসে আহার করিতেছে, তাহার পাত্রে খাদ্যদ্রব্য পড়িতে পড়িতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

আজ দ্বিপ্রহরে বিগ্রহপাল এই বিশালকায় লোকটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বহুদূর হইতে দেখিয়াছিলেন—নিশ্চয় লক্ষ্মীকর্ণ। বিগ্রহপাল বাহিরের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কর্ণে আসিল একটি শান্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর। দীপঙ্কর প্রকোষ্ঠের মধ্যেই আছেন, বাহির হইতে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। বিগ্রহপাল শুনিতে পাইলেন, দীপঙ্কর বলিতেছেন—'মহারাজ লক্ষীকর্ণ, বৌদ্ধবিহারে রাজকীয় খাদ্য-পানীয় নেই, রাজকীয় রতিগৃহের পালঙ্কশয্যাও নেই। আজ ভিক্ষুর খাদ্য এবং ভিক্ষুর শয্যাতে আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আপনারা পথক্লান্ত, আহারের পর বিশ্রাম করুন। পাশের প্রকোষ্ঠে আপনাদের তৃণশয্যা রচিত

হয়েছে। ভয় নেই, প্রেত পিশাচ বা মানুষ, কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না। কাল প্রাতে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে। তারপর আপনি যদি ইচ্ছা করেন নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে পারবেন। আজ আমি চললাম। আমার কিছু অন্য কাজ আছে।—আরোগ্য।'

উত্তরে লক্ষ্মীকর্ণ গলার মধ্যে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিলেন। দীপঙ্কর একটি দীপ হস্তে লইয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন। বিগ্রহপালকে তিনি দেখিতে পাইলেন না, অলিন্দ দিয়া একদিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বিগ্রহপাল নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অলিন্দের প্রান্তে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। দীপঙ্কর সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়াছেন এমন সময় পিছনে অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বিগ্রহপাল তাঁহার কাছে আসিয়া নত হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিলেন।

প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া দীপঙ্কর বিগ্রহপালের মুখ দেখিলেন, বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—'এ কি বিগ্রহ! তুমি এখানে কোথা থেকে এলে?'

'ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে এসেছি আর্য।' বলিয়া দ্রুত নিম্নকণ্ঠে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া দীপঙ্কর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—'এতক্ষণে লক্ষ্মীকর্ণের ব্যাপার বুঝলাম। ভাল হয়েছে, ভাল হয়েছে।—তুমি এখন ফিরে যাও, তোমার পিতৃদেবকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'যে আজ্ঞা। কিন্তু আর্য, কিসের এমন বিকট শব্দ হচ্ছিল?'

'পরে শুনো। এখন যাও, শীঘ্র মহারাজকে নিয়ে এস।'

'আজ্ঞা। কিন্তু আর্য, বড় পেট জ্বলছে, ফিরে এসে যেন খেতে পাই।'

দীপঙ্কর তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'পাবে।'

সাত

রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিহারের একটি কক্ষে খড়ের শয্যায় শয়ন করিয়া মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ সানুচর নিদ্রা যাইতেছেন। তৃণশয্যার জন্য নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই, মহারাজের নাসারন্ধ্র হইতে থাকিয়া থাকিয়া বীরোচিত সিংহনাদ বাহির হইতেছে। অন্যথা বিহার নিস্তব্ধ এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

কেবল ছাদে দীপঙ্করের দারু-কক্ষে দীপ জ্বলিতেছে। কক্ষটি আয়তনে প্রশস্ত, ভূমির উপর তৃণাস্তরণ; চারি কোণে স্তূপীকৃত তালপাতার পুঁথি ছাড়া কক্ষে আর কিছু নাই। এই কক্ষের মাঝখানে পাঁচটি মানুষ অর্ধচন্দ্রাকারে বসিয়াছেন। দীপঙ্করের একপাশে নয়পাল ও বিগ্রহপাল, অন্যপাশে আচার্য বিনয়ধর ও মহাধ্যক্ষ রত্নাকর শান্তি।

বিগ্রহপালের পেট ঠাণ্ডা হইয়াছে, নয়পাল যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াছেন। গুরুতর আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যদিও এত রাত্রে ছাদে কেহ নাই, তবু যথাসম্ভব নিম্নকণ্ঠে কথা হইতেছে।

মহারাজ নয়পাল গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'কাল সকালে লক্ষ্মীকর্ণকে বিহারের বাহিরে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর নাক কেটে নেব।' নয়পালের চক্ষু দুটি ঈষৎ রক্তাভ; অন্তরের অগ্নিশিখা প্রশমিত হইয়া এখন কেবল অঙ্গার জ্বলিতেছে।

দীপঙ্কর হাসিলেন—'অতটা প্রয়োজন হবে না। লক্ষ্মীকর্ণ বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে। যে অদ্ভুত ব্যাপার আজ সে দেখেছে—'

নয়পাল বলিলেন—'অদ্ভুত ব্যাপার—অসম্ভব ব্যাপার ! মানুষ যে এমন শব্দ সৃষ্টি করতে পারে তা কল্পনা করা যায় না ।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'লক্ষ্মীকর্ণ ভেবেছে এ পিশাচের কাণ্ড ।'

আচার্য বিনয়ধর নিজের কেশহীন কঙ্কালসার মুখে আঙ্গুল বুলাইয়া বলিলেন—'শুধু তাই নয়, আমাকেই তিনি পিশাচ মনে করেছেন ।'

অন্য সকলের মুখে হাসির স্ফুরণ দেখা দিল, কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিলেন । দীপঙ্কর বলিলেন—'আচার্য বিনয়ধর, তিব্বতের নবীন মহারাজা যে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন তার তুল্য মূল্যবান বস্তু পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ । সোনারূপা মণিমাণিক্য এর কাছে তুচ্ছ ।'

নয়পাল বলিলেন—'এ বস্তু পেলে একজন সামান্য রাজা সারা পৃথিবী জয় করতে পারে ।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'ঠিক এই কথা আমিও ভাবছিলাম । পৃথিবী জয়ের কথা নয়, সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে উৎপাত এসেছে তাকে দূর করার কথা । বর্বর তুরস্কদের বিতাড়িত করতে হলে এই বস্তুটির একান্ত প্রয়োজন ।'

বিনয়ধর ধীরে ধীরে বলিলেন—'আচার্য দীপঙ্কর, আজ আপনারা অগ্নিকন্দুকের যে-ক্রিয়া দেখেছেন তা এর শক্তির সামান্য নিদর্শন মাত্র । অমিতশক্তি এই অগ্নিপদার্থ, এর সাহায্যে মুষ্টিমেয় লোক একটা রাজ্য ছারখার করে দিতে পারে, অগণিত শত্রুকে নাশ করতে পারে ।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'সম্ভব । যেখানে শক্তি আছে সেখানে শক্তি-প্রয়োগের কৌশল জানা থাকলে কিছুই অসম্ভব নয় । আচার্য বিনয়ধর, এই অগ্নিকন্দুক আপনি কত এনেছেন ?'

'যা এনেছিলাম সবই প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আর্য, কেবল একটি অবশিষ্ট আছে ।' বলিয়া বিনয়ধর নিজের জটিল বস্ত্রাবরণের ভিতর হইতে একটি গোলক বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে রাখিলেন ।

সকলের নিষ্পলক নেত্র ক্ষুদ্র গোলকের উপর নিবদ্ধ হইল । এই বিশেষত্বহীন ক্ষুদ্রকন্দুকের মধ্যে যে এত শক্তি নিহিত আছে তাহা বিশ্বাস হয় না । বিগ্রহপাল একবার সেদিকে লোলুপ হস্ত প্রসারিত করিয়া আবার হাত টানিয়া লইলেন । বিনয়ধর সহাস্যে বলিলেন—'আপনি স্বচ্ছন্দে ওটি হাতে নিতে পারেন । সজোরে আছাড় না মারলে ওর শক্তি আত্মপ্রকাশ করে না ।'

বিগ্রহপাল সন্তর্পণে গোলকটি তুলিয়া লইয়া পরম কৌতূহলভরে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর আবার সন্তর্পণে রাখিয়া দিলেন । দীপঙ্কর একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—'মাত্র একটি । কিন্তু একটি দিয়ে তো তুরস্কদের তাড়ানো যাবে না । অনেক চাই । আচার্য বিনয়ধর, আপনি এই বস্তুর নির্মাণ কৌশল জানেন ?'

বিনয়ধর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন—'না আর্য । তিব্বতে কেউ এ গূঢ়বিদ্যা জানে না । কেবল চীনদেশে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানবিৎ আছেন যাঁরা এর রহস্য জানেন । আমাদের মহারাজ তাঁদেরই একজন আনিয়ে এই অগ্নি-ক্রীড়নকগুলি প্রস্তুত করিয়ে আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন । এগুলি খেলার সামগ্রী মাত্র ; এর চেয়ে শতগুণ ভীষণ অস্ত্র তাঁরা নির্মাণ করতে জানেন ।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না । দীপশিখার আলোকে পাঁচটি মূর্তি সম্মুখস্থ অগ্নিকন্দুকের পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন । অবশেষে দীপঙ্কর বলিলেন—'এই গূঢ়বিদ্যা যদি কেউ শিখতে চায় তাঁরা কি শেখাবেন ?'

বিনয়ধর বলিলেন—'সকলকে শেখাবেন না । দুষ্ট লোকের হাতে এ বিদ্যা সর্বনাশা হয়ে উঠতে পারে, মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে । তাই তাঁরা এ বিদ্যা সহজে কাউকে দেন না । তবে যদি কোনও শুদ্ধ-সাত্ত্বিক সাধু ব্যক্তি লোকহিতের জন্য শিখতে চান তাহলে শেখাতে পারেন ।'

দীপঙ্কর বিনয়ধরের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সাগ্রহকণ্ঠে বলিলেন—'আচার্য বিনয়ধর, আপনি জানেন ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে এক মহা আপৎ উপস্থিত হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধির মত এ আপৎ ক্রমে পূর্বদিকে এগিয়ে আসছে। একে যদি সময়ে শাসন করা না যায় তাহলে ভারতের সংস্কৃতি ঐতিহ্য কিছু থাকবে না, সংঘ এবং ধর্ম ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, এই বিক্রমশীল বিহার ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে। আমাদের এই মহা আশঙ্কার দিনে মহাচীনের বিজ্ঞানবিৎ সাধুরা কি আমাদের সাহায্য করবেন না ?'

বিনয়ধর বলিলেন—'অবশ্য করবেন। কিন্তু মহাচার্য, অযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁরা এই মহা গুহ্যবিদ্যা দেবেন না।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'না, না, অযোগ্য ব্যক্তিকে এ বিদ্যা দান করা কদাপি উচিত নয়।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ নয়পাল যদি চৈনিক গুণীদের ভারতে আসতে আমন্ত্রণ করেন, তাঁরা আসবেন কি ?'

বিনয়ধর মাথা নাড়িলেন—'না আর্য, আসবেন না। আমাদের মহারাজ অতি কষ্টে একজন গুণীকে তিব্বতে আনিয়েছেন, আর অধিক দূর তিনি আসবেন না। হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।'

দীপঙ্কর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—'মনে করুন, বিক্রমশীল বিহারের কোনও বিদ্যার্থী বা আচার্য যদি তিব্বতে যান, তিনি শেখাবেন কি ?'

বিনয়ধরের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি খেলিয়া গেল, তিনি বলিলেন—'জানি না আর্য। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি। বিক্রমশীল বিহারের মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যদি যান, তাঁকে অবশ্য শেখাবেন।'

দীপঙ্কর কিছুক্ষণ বিনয়ধরের গূঢ়হাস মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে তাঁহার অধরকোণেও একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। 'বুঝেছি'—বলিয়া তিনি করলগ্নকপোলে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

বিনয়ধরের কৌশল অন্য সকলেও বুঝিয়াছিলেন। রত্নাকর শান্তি সন্ত্রস্ত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'অতীশ, তুমি যদি চলে যাও—'

দীপঙ্কর মুখ তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'আমিই তিব্বতে যাব। বিনয়ধর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। হয়তো বুদ্ধেরও তাই ইচ্ছা।' তিনি অগ্নিকন্দুকটি সাবধানে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'আজ মন্ত্রণা স্থগিত হোক, রাত্রি অনেক হয়েছে।—মহারাজ, আপনি আর কুমার বিগ্রহ এই কক্ষেই শয়ন করুন, আমরা ছাদে থাকব। কাল প্রাতে লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।'

রত্নাকরও উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কাকুতি-ভরা স্বরে বলিলেন—'চন্দ্রগর্ভ, কিন্তু তোমার অবর্তমানে—'

দীপঙ্কর তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'রত্নাকর, আমাকে তিব্বতে যেতেই হবে। এ বিদ্যা না শিখতে পারলে ভারতের রক্ষা নেই। সামনেই হিমঋতু, সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রা করব। তুমি চিন্তা কোরো না, গূঢ়বিদ্যা শিখে আমি অবিলম্বে ফিরে আসব।'

আট

পরদিন পূর্বাহ্ণে আবার সভা বসিয়াছে। এবার ছাদে নয়, নিম্নের একটি প্রকোষ্ঠে। দীপঙ্কর মাঝখানে বসিয়াছেন, একপাশে সপুত্র নয়পাল, অন্যপাশে লক্ষ্মীকর্ণ ও তাঁহার সহচর নবীন যুবা। রত্নাকর শান্তি ও বিনয়ধর আজিকার সভায় উপস্থিত নাই। গত সন্ধ্যাকালে বিহারে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, রত্নাকর শান্তি তাহার শোধন-সংস্কারে ব্যস্ত আছেন, বিদ্যার্থীরা ভয়চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের শান্ত করিতেছেন। আর আচার্য বিনয়ধর সঙ্গীদের লইয়া বিহারভূমির একটি আমলক বৃক্ষতলে বসিয়া সহর্ষে হাত ঘষিতেছেন এবং বলিতেছেন—'জয় সিদ্ধার্থ! দীপঙ্কর তিব্বতে যাবেন! জয় সিদ্ধার্থ!' তিনি মাঝে মাঝে গিয়া বিগলিত চিত্তে মন্ত্রণাগৃহে উঁকি মারিয়া আসিতেছেন।

মন্ত্রণাগৃহের বাতাবরণ কিছু আতপ্ত। প্রকাশ্যে নয়পাল বা লক্ষ্মীকর্ণ কোনও প্রকার পারুষ্য প্রকাশ করিতেছেন না বটে, কিন্তু উভয়েরই রক্ত প্রবাহ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নয়পাল স্থির-কষায় নেত্রে লক্ষ্মীকর্ণকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, নরাধমটাকে হাতে পাইয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না এই ক্ষোভ তাঁহার অন্তরে তুষানলের মত জ্বলিতেছে। অপরপক্ষে লক্ষ্মীকর্ণের পারুষ্য দেখাইবার মত অবস্থা নয়, তিনি বড়ই বিপাকে পড়িয়া গিয়াছেন; নিরস্ত্র নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুর সম্মুখীন হইয়া বিক্রম প্রকাশের সুবিধা পাইতেছেন না। সৈন্যগুলা যদি পিশাচের ভয়ে না পলাইত তাহা হইলেও বা কথা ছিল। লক্ষ্মীকর্ণ মাঝে মাঝে তির্যকভাবে নয়পালের দিকে ব্যাঘ্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

বিগ্রহপাল ও অপরপক্ষীয় যুবকটি কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়। দুইজনের বয়স প্রায় সমান, বিগ্রহপাল সম্ভবত দুই তিন বছরের ছোট, দুইজনেরই দু'জনকে ভাল লাগিয়াছে। বিপক্ষদল না হইলে তাঁহারা এতক্ষণ ভাব করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁহারা কেবল পরস্পরের প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই নিবৃত্ত আছেন।

মন্ত্রণাসভার আলোচনা কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইতেছে। দীপঙ্কর বলিতেছেন—'কৌটিল্যনীতি আমি অবগত আছি—অন্তরহীন রাজ্যের অধিপতিরা পরস্পর শত্রু। সুখের বিষয়, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও একথা আংশিক সত্য। প্রতিবেশীদের মধ্যে যেমন বৈরভাব থাকতে পারে তেমনি মৈত্রভাবও থাকতে পারে। সজ্জন প্রতিবেশী পরস্পর ভরণ করে, কেবল দুর্জন প্রতিবেশী পরস্পর অনিষ্টচিন্তা করে। একথা সামান্য গৃহস্থ সম্বন্ধে যেমন সত্য রাজাদের সম্বন্ধেও তেমনি সত্য।'

লক্ষ্মীকর্ণ যেন অবোধ শিশুকে বুঝাইতেছেন এমনি ধীরতার অভিনয় করিয়া বলিলেন—'মহাশয়, সামান্য গৃহস্থের সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা তুলনীয় নয়। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম।' তিনি মৃগয়া করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে মগধরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এই হাস্যকর ভান বহুপূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দীপঙ্কর ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন—'যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম একথা আপনি কোথায় পেলেন?'

'আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আছে।' লক্ষ্মীকর্ণ এমনভাবে কথাটা বলিলেন যেন ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন বিনা তিনি এক পা চলেন না।

দীপঙ্কর দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'কদাপি নয়। আর্তের ত্রাণই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। মহারাজ, আপনি ধর্মে বৈষ্ণব, স্মরণ করুন স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন। ধর্মযুদ্ধই শ্রেয়ঃ, তস্করবৃত্তি ক্ষাত্রধর্ম নয়।'

লক্ষ্মীকর্ণ উগ্রভাবে উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এই সময় তাঁহার চোখে পড়িল দ্বারের

নিকট হইতে গতরাত্রের পিশাচটা উঁকি মারিতেছে। মহারাজের ক্ষাত্রতেজ অমনি প্রশমিত হইল। একে তো দীপঙ্করের সঙ্গে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তর্কে জয়ের আশা নাই, লোকটা ঘোর পণ্ডিত ; উপরন্তু তাহার পোষা পিশাচ আছে। মহারাজ ঢোক গিলিয়া নীরব হইলেন।

নয়পাল অধীরভাবে বলিলেন—'মহাচার্য, পাথরে জল ঢেলে লাভ কি ? পাথর গলবে না। এখন কর্তব্য কি তাই আদেশ করুন।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'কর্তব্য শান্তি রক্ষা, মৈত্রী রক্ষা। দেশে বহিঃশত্রু দেখা দিয়েছে, এ সময় যদি আপনারা কলহ করেন তাহলে দু'জনেই ধ্বংস হবেন।'

নয়পাল কহিলেন—'আমি কলহ করিনি। কলহ বিবাদ আমার ভাল লাগে না।'

লক্ষ্মীকর্ণ কথা কহিলেন না, কেবল নাকের মধ্যে একপ্রকার শব্দ করিলেন। নয়পালের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। দীপঙ্কর হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন, বলিলেন—'এভাবে প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। যেখানে এক পক্ষ কলহ করবার জন্য বদ্ধপরিকর সেখানে কলহ অপরিহার্য। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে পাণ্ডবেরা শান্তি চেয়েছিল, কিন্তু শান্তি রক্ষা হয়নি। আমি কাল রাত্রে অনেক চিন্তা করেছি। আমার একটি প্রস্তাব আছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ সন্দিগ্ধ চক্ষে দীপঙ্করের পানে চাহিলেন। নয়পাল বলিলেন—'আদেশ করুন আর্য।'

দীপঙ্কর একবার দুই পার্শ্বস্থ দুই রাজার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর অত্বরিত কণ্ঠে বলিলেন—'স্বভাব বশে যদি দুই রাজার মধ্যে মৈত্রী না হয় তখন কুটুম্বিতার দ্বারা মৈত্রী স্থাপনের প্রথা আছে। মহারাজ নয়পাল, আপনার পুত্র যুবরাজ বিগ্রহপালের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে। আমার প্রস্তাব, কুমার বিগ্রহের সঙ্গে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার বিবাহ হোক।'

প্রকোষ্ঠের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বিগ্রহপাল চকিতে মুখ তুলিয়া লক্ষ্মীকর্ণের পানে চাহিলেন। লক্ষ্মীকর্ণের সহচর যুবক উৎফুল্ল মুখে বিগ্রহের প্রতি কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন—'অসম্ভব ! আমার কন্যা—অসম্ভব !' নয়পালও নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণের লম্ফঝম্ফ দেখিয়া তাঁহার মন বিপরীত-মুখী হইল। লক্ষ্মীকর্ণের যখন আপত্তি তখন তাহার কন্যার সহিত তিনি বিগ্রহের বিবাহ দিবেন। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

লক্ষ্মীকর্ণ আরও কয়েকবার অসংলগ্নভাবে 'অসম্ভব' বলিয়া ক্রমশ নীরব হইলেন। তাঁহার বিরাগপূর্ণ অসম্মতি ভেদ করিয়া কূটবুদ্ধি ও পিশাচভীতি আবার মাথা তুলিল। এরূপ অবস্থায় ঝগড়া করা চলে না, কৌশলে আত্মরক্ষার প্রয়োজন। কৌশল ! সাপও মরিবে দণ্ডও ভাঙিবে না। তারপর একবার এই বেড়া-জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারিলে—

রাজাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া দীপঙ্করের মুখ গম্ভীর হইয়াছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন—'মহারাজ নয়পাল, আপনার আপত্তি আছে ?'

নয়পাল পরম ভক্তিভরে বলিলেন—'আপনি আমার গুরু, আপনার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। আপনি যদি চণ্ডাল কন্যা ঘরে আনতে বলেন, তাও আনতে পারি।'

বক্রোক্তিটা লক্ষ্মীকর্ণ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই দীপঙ্কর তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'আপনার যে সম্মতি নেই তা বুঝতে পারছি। ভাল—আমার সাধ্যমত আপনার ইষ্টচেষ্টা আমি করলাম, কিন্তু তা যখন আপনার মনঃপূত নয় তখন আমি আর কি করতে পারি। আপনারা পবিত্র সংঘের বাহিরে গিয়ে পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করুন। আমার আর কিছু বলবার নেই।'

দীপঙ্কর গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

তিনি ইতিমধ্যে একটি ফন্দি বাহির করিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন—'না না, আচার্য, আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। কন্যার বিবাহ দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার কন্যা বিবাহিতা ; বিবাহিতা কন্যাকে তো দ্বিতীয়বার সম্প্রদান করতে পারি না। এই দেখুন আমার জামাতা। এঁর নাম জাতবর্মা। বংগাল দেশের মহাপরাক্রান্ত রাজা বজ্রবর্মা এঁর পিতা।'

লক্ষ্মীকর্ণ পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবককে নির্দেশ করিলেন। বাকি তিনজন এতক্ষণে যুবককে ভাল করিয়া দেখিলেন। বিগ্রহপালের মুখে চকিত হাসির বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। দীপঙ্কর বলিলেন—'ইনি আপনার জ্যেষ্ঠ জামাতা। কিন্তু আপনার আর একটি অনূঢ়া কন্যা আছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ আবার বিপদে পড়িয়া গেলেন। এই ভিক্ষুগুলা সব খবর রাখে, কোন্ রাজার কয়টা মেয়ে তাহাও ইহাদের অজ্ঞাত নয়। মনে মনে সমস্ত ভিক্ষুসমাজকে নিরয়গামী করিয়া তিনি স্খলিতস্বরে কহিলেন—'অ্যাঁ—তা—আমার কনিষ্ঠা কন্যা—অর্থাৎ—'

সহসা তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে আর একটি সুবুদ্ধি জন্মলাভ করিল ; তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'আচার্যদেব, আমাকে ক্ষমা করুন। অবস্থাবিপর্যয়ে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাই প্রকৃত কথা ভাল করে বলতে পারছি না। এখন বলি শুনুন।—আমার বংশে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি প্রথা চলে আসছে, প্রত্যেক রাজা অন্তত একটি কন্যাকে স্বয়ংবরা করবেন। সহস্র বৎসরের মধ্যে চেদিবংশে এই প্রথার অন্যথা হয়নি। আমার দুই কন্যা। প্রথমা কন্যা বীরশ্রীর স্বয়ংবর হয়নি, সৎপাত্র পেয়ে তাঁর হাতেই কন্যা সমর্পণ করেছিলাম। সুতরাং কনিষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর করতেই হবে। যদি না করি পিতৃপুরুষেরা রুষ্ট হবেন, পিণ্ডোদক গ্রহণ করবেন না। এখন আপনিই বিচার করুন, কি করে কুমার বিগ্রহপালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে পারি।'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলেন। দীপঙ্কর মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—লক্ষ্মীকর্ণ সম্ভবত মিথ্যা গল্প বানাইয়া বলিতেছে, কিন্তু গল্প না হইতেও পারে। তাঁহার মনে পড়িল, অনুমান ত্রিশ বৎসর পূর্বে গাঙ্গেয়দেবের এক কন্যা, অথাৎ লক্ষ্মীকর্ণের ভগিনী স্বয়ংবরা হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় বংশের ধারা লঙ্ঘন করিতে জোর করিলে উৎপীড়ন করা হয়।

দীপঙ্কর একবার বিগ্রহপালের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। সুন্দরকান্তি যুবা, রাজবংশেও এমন সুপুরুষ দুর্লভ। দীপঙ্কর মনস্থির করিয়া বলিলেন—'মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ, আপনার অবস্থাবিপর্যয়ে আমাদের আনন্দ নেই, আপনাকে পীড়ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দুই রাজবংশে মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ় হয় ইহাই কাম্য।—আপনি কবে আপনার কন্যার স্বয়ংবর সভা আহ্বান করবেন মনস্থ করেছেন ?'

লক্ষ্মীকর্ণ কিছুই মনস্থ করেন নাই, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলিলেন—'আগামী চৈত্র মাসে।'

'ভাল। স্বয়ংবর সভায় আপনি অনেক মিত্র রাজাকে আমন্ত্রণ করবেন। কুমার বিগ্রহকে আমন্ত্রণ করবেন কি ?'

লক্ষ্মীকর্ণ কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—'অবশ্য অবশ্য।'

'কন্যা কুমার বিগ্রহের গলায় মাল্যদান করলে আপনার আপত্তি হবে না ?'

'কিছুমাত্র না।'

দীপঙ্কর নয়পালের পানে একবার চাহিলেন—'তাহলে এই স্থির রইল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কন্যার স্বয়ংবর সভায় কুমার বিগ্রহকে আহ্বান করবেন। কন্যা যদি কুমারের গলায় বরমাল্য দান করে তাহলে দুই রাজবংশের মধ্যে কুটুম্ব-মৈত্রী স্থাপিত হবে। সমস্যার সম্যক সমাধান যদিও হল না, তবু মন্দের ভাল। আশা করি অন্তে শুভ হবে।'

লক্ষ্মীকর্ণ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'অবশ্য অবশ্য। আমি তাহলে নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে পারি ?'

দীপঙ্কর বলিলেন—'পারেন।'

নয়

আবার অপরাহ্ণ। আকাশে দুই একটি লঘু মেঘ ভাসিতেছে, গঙ্গায় দুই একটি পাল-তোলা নৌকা। পশ্চিম দিগন্তে স্বর্ণকুঙ্কুমের প্রলেপ।

দীপঙ্কর ছাদে একাকী বিচরণ করিতেছেন। এক অহোরাত্রের মধ্যে কত অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। দীপঙ্কর মনের মধ্যে এক অনভ্যস্ত উত্তেজনা অনুভব করিতেছেন। তিব্বত যাইবার কোনও সঙ্কল্পই ছিল না, অথচ ঘটনাচক্রের আবর্তনে তিব্বত যাওয়া স্থির হইয়াছে। কী অদ্ভুত আসুরিক বিদ্যা! এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। তিব্বতের পথ হিম-দুর্গম, উপরন্তু দস্যু-অধ্যুষিত। তিনি ফিরিয়া আসিতে পারিবেন কি?—বুদ্ধের ইচ্ছা—সকলই বুদ্ধের ইচ্ছা।

আজ দ্বিপ্রহরে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ জামাতা ও সহচরদের লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মনে কী আছে তিনিই জানেন। সুখের বিষয় তাঁহার পলাতক সৈন্য ফিরিয়া আসে নাই। নয়পাল এখনও আছেন ; তাঁহার সৈন্যদল নিকটবর্তী গ্রাম হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। কাল প্রাতে নয়পাল সসৈন্যে চম্পা নগরীতে চলিয়া যাইবেন। আপাতত তিনি পুত্রসহ সংঘেই আছেন।

নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া দীপঙ্কর তাঁহার শিশুতরুশ্রেণীর মধ্যে বিচরণ করিতেছেন এমন সময় রত্নাকর শান্তি ও বিনয়ধর আসিলেন। দীপঙ্কর হাসিয়া বলিলেন—'রত্নাকর, তুমি তোমার চাবির গোছা ফিরে পেয়েছ দেখছি।'

রত্নাকরের নিকট হইতে হাসির উত্তর আসিল না। বিষণ্ণমুখে তিনি বলিলেন—'অতীশ, তিব্বতে যাওয়া তবে স্থির ? এ বিষয়ে আর একবার চিন্তা করে দেখবে না ?'

দীপঙ্কর বলিলেন—'চিন্তা করবার আর কি আছে রত্নাকর ? বুদ্ধের নাম নিয়ে যাত্রা করলেই হল। সামনে হিমঋতু, তার আগে তিব্বতে পৌঁছানো প্রয়োজন। আশীর্বাদ কর যেন সিদ্ধার্থ হই।'

রত্নাকর ক্ষুব্ধমুখে নীরব রহিলেন দেখিয়া বিনয়ধর সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—'আর্য রত্নাকর, আপনি মুহ্যমান হচ্ছেন কেন ? আগামী বৎসর এই সময় অতীশ ফিরে আসবেন।'

রত্নাকর গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ তুলিলেন, বিনয়ধরকে বলিলেন—'অতীশ না থাকলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাবি ওঁর হাতে, ওঁর অবর্তমানে সেই সব প্রতিষ্ঠান শূন্য হয়ে যাবে। চারিদিকের অবস্থা দেখে মনে হয় ভারতবর্ষের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে ; আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছি। তবু আশীর্বাদ করি তোমরা অতীশকে নিয়ে তোমাদের দেশে ফিরে যাও, সকল প্রাণীর কল্যাণে অতীশের কর্ম ও সেবা নিয়োজিত হোক।—অতীশ, তোমার অনুপস্থিতি কালে আমি কি করব বলে দাও।'

দীপঙ্কর রত্নাকরের স্কন্ধে হাত রাখিলেন, চারিদিকের শিশুবৃক্ষগুলির উপর স্নেহক্ষরিত দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন—'আমার অবর্তমানে এই গাছগুলির পরিচর্যা কোরো। এরা যখন বড় হবে তখন বিহারভূমিতে এদের রোপণ কোরো। দেখো যেন সেবার অভাবে এরা শুকিয়ে না

যায়।'—

দিনের আলো মুদিত হইয়া আসিতেছে। রত্নাকর ও বিনয়ধর নীচে নামিয়া গিয়াছেন। দীপঙ্কর একাকী।

বিগ্রহপাল আসিয়া প্রণাম করিলেন।

দীপঙ্কর বলিলেন—'কী বিগ্রহ ?'

বিগ্রহপাল সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—'একটি ভিক্ষা আছে।'

'ভিক্ষা ! কি ভিক্ষা ?'

'ওই অগ্নিকন্দুকটি আমায় দান করুন।'

দীপঙ্কর হাসিলেন।

'ছেলেমানুষ ! ও নিয়ে কি করবে ?'

'তা জানি না। কাছে রাখব। হয়তো কোনও দিন কাজে লাগবে।'

'এস দিচ্ছি। কিন্তু ওর অপব্যবহার কোরো না।'

নিজের দারু-প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া দীপঙ্কর বিগ্রহপালকে অগ্নিকন্দুকটি বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—'এটিকে শুষ্ক স্থানে রেখো, যেন ভিজে না যায়। বিনয়ধর বলছিলেন জল লাগলে এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়।'

'যে আজ্ঞা।'

'আর একটা কথা।—লক্ষ্মীকর্ণের নিমন্ত্রণ পেলে স্বয়ংবর সভায় যেও। তারপর বুদ্ধের ইচ্ছা।'

'যে আজ্ঞা।'

এইখানেই বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে দীপঙ্কর অল্পকাল মধ্যেই তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন ; তারপর সেখানে ত্রয়োদশ বর্ষ যাপন করিয়া সেইখানেই দেহরক্ষা করেন, আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। তিনি গূঢ়বিদ্যা শিখিয়াছিলেন কিনা এবং শিখিয়া থাকিলে কেন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন না এ সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

এক মাস চম্পা নগরীতে যাপন করিয়া মহারাজ নয়পাল স্কন্ধাবার তুলিয়া পাটলিপুত্রে ফিরিয়া গেলেন। দীপঙ্কর তিব্বতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কোনও সংবাদ নাই। লক্ষ্মীকর্ণও চুপচাপ।

কুমার বিগ্রহ অগ্নিকন্দুকটি অতি যত্নে একটি ক্ষুদ্র পেটরার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন, অগ্নিকন্দুকের কথা পিতামাতাকেও বলেন নাই। কেবল একজনকে বলিবার জন্য তাঁহার মন ছটফট করিতেছে, সে তাঁহার প্রাণের বন্ধু অনঙ্গপাল। অনঙ্গপাল পালবংশেরই সন্তান, বিগ্রহপালের দূরস্থ দায়াদ। সে উত্তরাধিকার সূত্রে বহু ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছে, পালবংশে জন্মগ্রহণ করিলে কাহাকেও বৃত্তি-চিন্তা করিতে হয় না, যোগ্যতা অনুযায়ী রাজকর্ম জুটিয়া যায়। অনঙ্গপাল কিন্তু কোনও বৃত্তি অবলম্বন করে নাই। সে একজন শিল্পী ; ছবি আঁকে, মূর্তি গড়ে, গান যায়, বাঁশি বাজায়। আবার সাঁতার কাটিতে, অশ্বপৃষ্ঠে মৃগয়া করিতেও সে পটু। সে সঙ্গে নাই বলিয়া চম্পা নগরীতে আসিয়া বিগ্রহপালের মনে সুখ ছিল না। পাটলিপুত্রে ফিরিবার পর

দুই বন্ধুর মিলন হইল।

রাজপুরীর দীর্ঘিকায় পাশাপাশি বসিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে বিগ্রহপাল বন্ধুকে বিক্রমশীলা ঘটিত সমস্ত কাহিনী বলিলেন। শুনিয়া অনঙ্গপাল অগ্নিকন্দুকের কথা বিশ্বাস করিল না, বলিল—'মহাপুরুষ দীপঙ্কর বিভূতি দেখিয়েছেন। যা হোক, গোলাটা রেখে দিস, হয়তো ওতে এখনও মন্ত্রের তেজ আছে।' লক্ষ্মীকর্ণ ও স্বয়ংবরের প্রসঙ্গে সে বলিল—'ছিপ দিয়ে কুমীর ধরা যায় না। বুড়ো ঘড়িয়ালটাকে যখন হাতে পাওয়া গিয়েছিল তখন ঠেঙ্গিয়ে মারলেই ভাল হত। যাক, বুড়ো যদি স্বয়ংবরে না ডাকে তখন দেখা যাবে।'

অতঃপর আরও এক মাস কাটিয়া গেল। বিগ্রহপাল বন্ধু অনঙ্গপালের সঙ্গে পাশা খেলিয়া, মাছ ধরিয়া, কদাচ মৃগয়া করিয়া কালহরণ করিলেন। স্বয়ংবরের নিমন্ত্রণ লিপি কিন্তু আসিল না।

গূঢ়পুরুষ আসিয়া মহারাজ নয়পালকে সংবাদ দিল, লক্ষ্মীকর্ণ স্বয়ংবরের আয়োজন করিতেছেন, বহু রাজা এবং রাজপুত্রের নিকট লিপি প্রেরিত হইয়াছে। নয়পাল ক্রুদ্ধ হইয়া স্থির করিলেন মিথ্যাবাদী তস্করের কন্যার সহিত তিনি পুত্রের বিবাহের কোনও চেষ্টাই করিবেন না। তিনি কাশী কোশল কলিঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে ভাট পাঠাইলেন ; যদি উপযুক্ত রাজকন্যা পাওয়া যায় তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন।

মাসাবধি কাল পরে ভাটেরা একে একে ফিরিয়া আসিল। কাশী কোশল প্রভৃতি দেশের রাজারা সকলেই মগধের যুবরাজকে জামাতারূপে পাইতে উৎসুক ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাশীরাজকন্যা ইতিপূর্বেই বিবাহিতা ও বহুপুত্রবতী, কোশলরাজের কন্যা অন্যের বাগ্‌দত্তা ; কলিঙ্গরাজের একটি কন্যা আছে বটে, কিন্তু সেটি দাসীকন্যা, মহারাজ নয়পাল যদি তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন—

নয়পাল রাগে ফুলিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে এ সমস্তই লক্ষ্মীকর্ণের নষ্টামি। শৃগাল খাল পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, শত্রুতা করিতেছে। ক্রুদ্ধ নয়পাল কয়েকজন তেজস্বী বজ্রযানী সাধককে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্মীকর্ণকে সংহার করা যায় কিনা তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বিগ্রহপাল সকল সংবাদ পাইতেছিলেন ; তাঁহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি অনঙ্গপালকে গিয়া বলিলেন—'চল অনঙ্গ, ত্রিপুরী যাই। বুড়ো শেয়ালের মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে আসি।'

অনঙ্গপাল আপন গৃহে বসিয়া মাটির মূর্তি গড়িতেছিল—একটি পীনপয়োধরা যক্ষিণীমূর্তি। অনঙ্গপাল বিপত্নীক, দুই বছর পূর্বে পত্নীকে হারাইয়া সে আর বিবাহ করে নাই ; বাঁশি বাজাইয়া, চিত্র আঁকিয়া, যক্ষিণী কিন্নরীর মূর্তি গড়িয়া যৌবনের ক্ষুধা মিটাইতেছিল। সে বিগ্রহপালের দিকে একবার চক্ষু ফিরাইল, তারপর একতাল মৃত্তিকা যক্ষিণীর বক্ষে জুড়িয়া দিয়া নিপুণহস্তে গড়িতে গড়িতে বলিল—'কেড়ে আনতে হলে সৈন্য নিয়ে যেতে হয়, তাতে সুবিধা হবে না। স্বয়ংবরের আগে সেখানে অনেক রাজা আসবে, তারাও লড়বে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তবে চল, চুরি করে আনি।'

'সে কথা মন্দ নয়'—অনঙ্গপাল জলপূর্ণ কটাহে হাত ধুইয়া বিগ্রহের কাছে আসিয়া বসিল—'কিছু ফন্দি মাথায় এসেছে নাকি ?'

'না। আয় দু'জনে ফন্দি বার করি।'

দুই বন্ধুর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্ত্রণা চলিল। উচ্চ হাসি ও চটুল রসালাপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রণা। অবশেষে অভিসন্ধি পাকা হইলে অনঙ্গ বলিল—'মহারাজকে কোনও কথা বলা হবে

না। চল, ভট্ট যোগদেবের কাছে যাই। তিনি রসিক ব্যক্তি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে দেবেন।'

দুই বন্ধু উপসচিব যোগদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যোগদেবের বয়স চল্লিশের নীচে, মন্ত্রিত্বের নিম্নতন সোপানে পা রাখিয়াছেন ; রাজনীতির ইক্ষুযন্ত্রে তাঁহার মন এখনও ছিব্‌ড়া হইয়া যায় নাই। বিগ্রহপালকে তিনি ভালবাসিতেন ; পরবর্তী কালে বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি রাজার মহাসচিব হইয়াছিলেন।

মন্ত্রণা শুনিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—'শঠে শাঠ্যম্। —ভাল, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। ত্রিপুরীতে আমার অগ্রজ রন্তিদেব বাস করেন, তিনি ওখানকার বড় জ্যোতিষী। আমি তাঁকে পত্র লিখে দেব, ওখানকার ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন।'

দুই

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন রথে চড়িয়া, ফিরিলেন গো-শকটে আরোহণ করিয়া। যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল ছয় সহস্র সৈন্য, ফিরিয়া আসিল গুটি চার-পাঁচ সেনানী। জামাতা জাতবর্মা পথেই শ্বশুর মহাশয়ের পদধূলি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, শ্বশুরের সান্নিধ্যে তাঁহার আর রুচি ছিল না। নিজগৃহে শ্বশুরকন্যাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন সেইদিকে তাঁহার মন টানিতেছিল।

বলা বাহুল্য লক্ষ্মীকর্ণের মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। রাজপুরীতে ফিরিয়া ময়ূর মাংস সহযোগে মাধ্বী পান করিতে করিতে তিনি মাঝে মাঝে দন্ত কড়মড় করিতেছিলেন। প্রিয় কিঙ্করীরা নানাভাবে সেবা করিয়াও তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিতেছিল না।

লক্ষ্মীকর্ণ এমন অপদস্থ জীবনে হন নাই। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই, তাহাতে লজ্জা নাই। কিন্তু এ তো পরাজয় নয়, নয়পাল তাঁহার মুখে চুন-কালি দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এর প্রতিশোধ লইতে না পারিলে—

কিন্তু প্রতিশোধ লওয়া সহজ নয়। আবার সৈন্য সাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ফল ভিন্নরূপ হইবে কি ? ওই দুষ্টবুদ্ধি দীপঙ্করটা আছে, তাহার পোষা পিশাচ আছে। কী ভয়ঙ্কর পিশাচ ! কী তার হৃৎপ্রকম্পী ক্রিয়াকলাপ ! এরূপ পিশাচের বিরুদ্ধে কে যুদ্ধ করিবে ?

স্বয়ংবর ! কন্যা যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর দিবার অভিপ্রায় তাঁহার কস্মিনকালেও ছিল না, দীপঙ্করকে ভুলাইবার জন্য একটা ছুতা করিয়াছিলেন মাত্র। অবশ্য যৌবনশ্রীর সপ্তদশ বৎসর বয়স হইয়াছে, সে সুন্দরী ; সুতরাং তাহার স্বয়ংবর দিলে মন্দ হয় না। লক্ষ্মীকর্ণের মস্তকে কুবুদ্ধি অঙ্কুরিত হইল—ঠিক হইয়াছে ! লক্ষ্মীকর্ণ স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিবেন, ভারতবর্ষের সমুদয় রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু মগধের যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিবেন না। একটি বানরের মূর্তি গড়াইয়া স্বয়ংবর সভায় বসাইয়া দিবেন ; ভাট মূর্তির পরিচয় দিবে—মগধের যুবরাজ। দেখিয়া সভারূঢ় রাজকুল অট্টহাস্য করিবে, সেই অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি মগধের রাজসিংহাসনে গিয়া পৌঁছিবে—

এই কূট-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া লক্ষ্মীকর্ণের প্রতিহিংসা-পিপাসু মন অনেকটা শান্ত হইল। তিনি মহা উদ্যমে স্বয়ংবর সভা আহ্বানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উত্তরাপথের ও দাক্ষিণাত্যের রাজারা কুঙ্কুমরঞ্জিত চন্দন সুরভিত নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন ; উপরন্তু দূতমুখে তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশের সন্দেশ পাইলেন। দূতগণের বাক্‌চাতুর্যের ইঙ্গিতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে মগধের যুবরাজ আপন উচ্ছৃঙ্খলতার দোষে রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহাকে

তুমি সন্ধ্যার মেঘ

স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করা হয় নাই।

যাহার স্বয়ংবর সে কিন্তু কিছুই জানিল না।

একদিন অপরাহ্নকালে রাজকুমারী যৌবনশ্রী আপন ভবনে বাতায়ন তলে বসিয়া রঘুবংশম্ পাঠ করিতেছিলেন।

বিরাট দ্বি-ভূমক রাজপুরীর বহু শাখা-প্রশাখা। তন্মধ্যে দ্বিতলের একটি প্রশাখা যৌবনশ্রীর নিজস্ব। বাতায়ন দিয়া পিছনের দীর্ঘিকা দেখা যায়, আম্রকাননের সুগন্ধি মর্মর ভাসিয়া আসে, অস্তমান সূর্যের কনকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়। এইরূপ একটি বাতায়ন তলে কোমল অজিনাসনে পা ছড়াইয়া বসিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা শীতের রৌদ্র সেবন করিতে করিতে কুমারী যৌবনশ্রী কালিদাসের মহাকাব্য কোলে লইয়া পাঠ করিতেছেন। ষষ্ঠ সর্গ পাঠ করিতে করিতে মন বসিয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে রাজকুমারী যৌবনশ্রীর দেহ নবোদ্ভিন্ন লাবণ্যের রসে টলমল করিতেছে, যেন এইমাত্র তিনি লাবণ্যের সরসীনীরে স্নান করিয়া আসিলেন। মন কিন্তু কৌমার্যের প্রশান্তিতে নিস্তরঙ্গ ; সেখানে যৌবনসুলভ প্রগল্‌ভতা নাই, রাজকন্যাসুলভ গর্ব নাই। মুখখানিতে একটু মধুর গাম্ভীর্য, চোখ দুটিতে স্নিগ্ধ বুদ্ধির প্রভা। পিছন হইতে চুলের উপর সূর্যের আলো পড়িয়া একটি স্বর্ণাভ মণ্ডল রচনা করিয়াছে। একাকী বসিয়া কাব্য পড়িতে পড়িতে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন।

যৌবনশ্রীর সৌম্যশুচি রূপলাবণ্য দেখিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারে না যে তিনি দৈত্যাবতার লক্ষ্মীকর্ণের কন্যা। লক্ষ্মীকর্ণের মহিষী পরম রূপবতী ছিলেন, ভাগ্যক্রমে কন্যা মাতার রূপ পাইয়াছে। নহিলে কন্যার স্বয়ংবর করা চলিত না।

রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়িতে পড়িতে দ্বারের কাছে দ্রুত চঞ্চল পদধ্বনি শুনিয়া যৌবনশ্রী চক্ষু তুলিলেন। বান্ধুলি আসিতেছে। বান্ধুলি তাঁহার প্রিয় সহচরী ও পর্ণসম্পুট বাহিনী। সে অন্যান্য পুরাঙ্গনার মত রাজপুরীতে বাস করে না, দ্বিপ্রহরে গৃহে যায়, আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুরীতে ফিরিয়া আসে। রাত্রে কখনও গৃহে যায় কখনও কুমারীর পালঙ্কের পায়ের কাছে শুইয়া রাত কাটাইয়া দেয়। দুইজনে প্রায় সমবয়স্কা, দুইজনের মধ্যে বড় প্রীতি। বান্ধুলির এখনও বিবাহ হয় নাই।—কিন্তু বান্ধুলির প্রসঙ্গ থাক, তাহার সম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিতে হইবে।

যৌবনশ্রী বান্ধুলির চোখে-মুখে উৎফুল্ল উত্তেজনা দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—'কি রে বান্ধুলি ?'

বান্ধুলি আসিয়া যৌবনশ্রীর কাছে বসিল, একটু হাঁপাইয়া বলিল—'ও পিয়সহি, তুমি শোনোনি ? তোমার যে স্বয়ংবর।'

যৌবনশ্রী রঘুবংশের পুঁথি মুড়িয়া বান্ধুলির মুখের পানে চাহিলেন, তাঁহার নবকিশলয়ের মত ঠোঁট দুটি একটু বিভক্ত হইল। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করা বা অধিক কথা বলা তাঁহার স্বভাব নয়। একটু মৌন থাকিয়া তিনি বলিলেন—'আমি শুনিনি। তুই কোথায় শুনলি ?'

বান্ধুলি গাঢ়স্বরে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—'লম্বোদর বলেছে। বাহিরে এখনও প্রকাশ নেই, কিন্তু রাজাদের কাছে লিপি গেছে।'

রাজকুমারীর নবনীতুল্য গাল দুটি একটু উত্তপ্ত হইল, স্খলিত আঁচলটি তুলিয়া তিনি বুকের উপর টানিয়া দিলেন। ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বান্ধুলির দিকে দৃষ্টি নামাইলেন, একটু হাসির উন্মেষ তাঁহার অধর কোণে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তারপর কিছু না বলিয়া তিনি আবার ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মহাকবির কাব্য এখন তাঁহার কাছে নূতন অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

গ্র

বান্ধুলি সাগ্রহে বলিল—'পিয়সহি, মহারাজ তোমাকে কিছু বলেননি ?'

যৌবনশ্রী স্মিতমুখ তুলিয়া বলিলেন—'না।' তারপর আবার কাব্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

বান্ধুলি বোধহয় প্রিয়সখীর নিকট অন্যরূপ প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিল। সে একটু নিরাশ হইল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—'তোমার চুল বেঁধে দেব ?'

যৌবনশ্রী পুঁথি হইতে চোখ না তুলিয়া বলিলেন—'দে।'

তিন

বিগ্রহ মাতার কাছে গিয়া বলিলেন—'মা, আমি দেশ ভ্রমণে যাব। পাটলিপুত্র আর ভাল লাগে না।'

মাতা উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন—'কোথায় যাবি ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'কোথাও যাব না, নৌকায় চড়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াব। তুমি ভেব না মা, অনঙ্গ আমার সঙ্গে থাকবে।'

মাতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, কারণ অনঙ্গপালের উপর তাঁহার অগাধ আস্থা। অনঙ্গ বুদ্ধিমান ও সাহসী, সে বিগ্রহকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিবে। বলিলেন—'মহারাজের অনুমতি নিয়েছিস ?'

'না। তুমি মহারাজকে বল।'

মহারাজ শুনিয়া আপত্তি করিলেন না। তাঁহার আয়ু ফুরাইয়া আসিতেছে, ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। একবার সিংহাসনে বসিবার পরে পর-রাজ্যে ভ্রমণের আর সুযোগ থাকিবে না ; সুতরাং এইবেলা কাজটা সারিয়া আসুক। স্বয়ংবরের ব্যাপারে সে বোধহয় মনে আঘাত পাইয়াছে, দু'দিন ঘুরিয়া আসিলে মন ভাল হইবে।

মাঘ মাসের এক দ্বিপ্রহরে অনঙ্গকে লইয়া বিগ্রহ নৌকায় উঠিলেন। নৌকাটি বেশ বড়, উপরে সুসজ্জিত রইঘর ; নীচে রন্ধনের ও হালী মাঝিদের থাকিবার স্থান। ছয়জন দাঁড়ী, একজন হালী, একজন দিশারু ; ভৃত্য বা পাচক সঙ্গে নাই। অনঙ্গপাল নিজে উৎকৃষ্ট পাচক ; দিশারুর কাজ কম, সেও রাঁধিবে। সর্ব-সাকুল্যে নৌকায় দশজন মানুষ। সকলেই অস্ত্রধারণ করিতে জানে। সঙ্গে অস্ত্রও যথেষ্ট আছে। এদিকে জলদস্যু নাই, দক্ষিণে গৌড় বঙ্গে জলদস্যুর বড় দৌরাত্ম্য। তবু সাবধানের মার নাই ; জলপথে বা স্থলপথে যে পথেই হোক, বিদেশযাত্রার সময় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইতে হয়।

অনুকূল পবনে পাল তুলিয়া নৌকা মরালগতিতে উজান চলিল। গুণবৃক্ষের মাথায় রাজকীয় লাঞ্ছন নাই, নৌকায় যে রাজপুত্র চলিয়াছেন তাহা অনুমান করা যায় না ; মনে হয় প্রয়াগ বা বারাণসীর কোনও বণিকের নৌকা, সাগর হইতে ফিরিতেছে। বিগ্রহের উদ্দেশ্যও তাই, আত্মপরিচয় প্রকাশ না করিয়া তিনি ত্রিপুরী নগরীতে প্রবেশ করিতে চান।

দাঁড়ীরা দাঁড় ধরিল ; নৌকার বেগ বর্ধিত হইল। ঘাটে দাঁড়াইয়া দাসীপরিবৃতা রানী সাশ্রুনেত্রে নৌকার পানে চাহিয়া রহিলেন। বিগ্রহপাল নৌকার ছাদে দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে হাত্ নাড়িতে লাগিলেন।

ক্রমে পাটলিপুত্রের শত সৌধচূড়া নদীর বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিগ্রহপাল ছাদ হইতে নামিয়া রইঘরে আসিয়া বসিলেন। মন স্ফূর্তিতে পূর্ণ ; তিনি যেন রাজহংসের মত রেবাতীরস্থ কমলবনের উদ্দেশে উড়িয়া চলিয়াছেন। সেখানে কমলবনের পরাগ-সুরভিত জলে একটি

রাজহংসী বাস করে—

অনঙ্গপাল একটি বীণাযন্ত্রের কর্ণমর্দন করিতে করিতে তন্ত্রীতে সুর বাঁধিতেছিল, বিগ্রহপাল তাহার পৃষ্ঠে সস্নেহ মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন—'যাত্রা ভালই হয়েছে, কি বলিস ? ঘাটের ধারে দুটো খঞ্জনপাখি ল্যাজ নাচাচ্ছিল।'

অনঙ্গপাল বীণার তন্ত্রীতে তর্জনীর টঙ্কার দিয়া বলিল—'খঞ্জন নয়, ও-দুটো কাদাখোঁচা।'

'না না, খঞ্জন। কাদাখোঁচা কখনো ল্যাজ নাচায় ! তা সে যাহোক, কতদিনে ত্রিপুরীতে পৌঁছুব বল দেখি ?'

'তোর মন যে বাতাসের আগে উড়ে চলেছে ! এ কি মনপবনের নাও ? এত বেশি আগ্রহ কিসের ? যাকে চুরি করতে যাচ্ছিস তাকে তো চোখেও দেখিসনি !'

বিগ্রহপালের চক্ষু উত্তেজনায় নাচিয়া উঠিল—'তাতে কি ! চুরি করাটাই আসল। আর মেয়েটা নিশ্চয় সুন্দর, নইলে স্বয়ংবর হত না।'

বীণা নামাইয়া রাখিয়া অনঙ্গ বলিল—'তা কি বলা যায় ? রাজারা কি শুধু রূপ দেখেই বিয়ে করে, অনেক সময় রাজনৈতিক চালও থাকে। দশটা রানীর মধ্যে গোটা তিন-চার সুন্দরী থাকলেই হল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কন্যাটি হয়তো বাপের মত দেখতে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'যদি তা হয় তাহলে তাকে হরণ করে এনে তোর সঙ্গে বিয়ে দেব।'

অনঙ্গ বলিল—'তুইও ভীষ্ম নয়, আমিও বিচিত্রবীর্য নই, তোর হরণ করা মেয়ে আমি বিয়ে করব কেন ? তোকেই বিয়ে করতে হবে।'

'আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। আগে বল ত্রিপুরীতে পৌঁছুব কখন ?'

অনঙ্গ দিশারুকে ডাকিল। দিশারুর নাম গরুড়ধ্বজ, চেহারা গিরগিটির মত। সে গুণবৃক্ষে উঠিয়া দিগ্‌দর্শন করিতেছিল, নামিয়া আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—'গরুড়, ত্রিপুরী যেতে কতদিন লাগবে ?'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, নৌকা ত্রিপুরী পর্যন্ত যাবে না। ত্রিপুরী নগরী হল গিয়ে নর্মদা নদীর তীরে, শোণ নদের শেষ ঘাট থেকে চার ক্রোশ দূরে।'

'অর্থাৎ শোণ নদের শেষ ঘাটে নেমে স্থলপথে যেতে হবে। সেখানে যানবাহন পাওয়া যাবে ?'

'আজ্ঞা, মাঝে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পথ আছে, বণিকেরা পণ্য নিয়ে যাতায়াত করে।'

'এখান থেকে শোণ নদের শেষ ঘাটে পৌঁছুতে কতদিন লাগবে ?'

'গঙ্গাতে উজান ঠেলে যেতে হচ্ছে, শোণেও উজান ঠেলে যেতে হবে। সারা পথ উজান, দশ দিন লাগবে। ফেরার সময় পাঁচ দিনে হবে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'দশ দিন ! হা হতোস্মি !—আর গঙ্গা-শোণ মোহানায় পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে ?'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, শোণের মোহানা এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ ; বাতাস যদি অনুকূল থাকে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছাতে পারি। দু'ঘটি দেরি হলেও ক্ষতি নেই ; আজ শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী, আকাশে চাঁদ থাকবে।'

'তাহলে আজ রাত্রে গঙ্গা-শোণ সঙ্গমেই নৌকা বাঁধবে ?'

'আজ্ঞা, তাই ইচ্ছা।'

'ভাল, যাও তুমি নিজের কাজ কর গিয়ে।'

গরুড় চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আজ্ঞা, আড়কাঠে উঠেছিলাম, দেখলাম সামনে অনেক দূরে একটা নৌকা যাচ্ছে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'বটে ! কি রকম নৌকা ?'

গরুড় বলিল—'দূর থেকে বংগাল দেশের নৌকা মনে হল। সঙ্গে একটি ছোট ডিঙি আছে।'

'বংগাল দেশের নৌকা ! হয়তো পশ্চিমে বাণিজ্যে যাচ্ছে।'

'আজ্ঞা, হতে পারে। তবে বংগাল দেশের নৌকা পশ্চিমে বড় আসে না। পশ্চিম দেশের নৌকাই বংগাল দেশ দিয়ে সাগরে যায়।'

'আচ্ছা, তুমি যাও। আশঙ্কার কিছু নেই তো ?'

'আজ্ঞা, মনে তো হয় না। তবে যদি বংগাল দেশের নৌকা হয়, সতর্ক থাকা ভাল।'

চার

শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলে বিগ্রহপাল নৌকার ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। অনঙ্গ বীণা লইয়া মৃদু মৃদু বাজাইতে লাগিল। মিঠা লঘু চৈতালি সুর, যেন অদূর বসন্তকে চুপি চুপি ডাকিতেছে।

ছাদের উপর আতপ্ত রৌদ্র ও শীতল বাতাসের সংমিশ্রণ বড়ই উপাদেয়। চারিদিকের দৃশ্যও চিত্তগ্রাহী। নৌকা স্রোতের ঠিক মাঝখান দিয়া যাইতেছে না ; মাঝখানে স্রোতের বেগ বেশি, তাই একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে ; বাম দিকের তীর নিকটে, দক্ষিণ দিকের তীর দূরে। মাঘ মাসের কৃশাঙ্গী গঙ্গা দুই তীরে সিকতাঞ্চল বিছাইয়া দিয়াছে। নদীর বুকেও স্থানে স্থানে বালুচর জাগিয়াছে। চরের শুষ্ক বালুকার উপর অগণিত হংস লীন হইয়া রোদ পোহাইতেছে, নৌকা কাছে আসিলে গ্রীবা তুলিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। শীতের আরম্ভে হিমালয়ের হ্রদগুলি যখন হিমাবৃত হয় তখন ইহারা দলে দলে ভারতের নদ-নদীতে নামিয়া আসে, শীতের অন্তে আবার হিমালয়ে ফিরিয়া যায়।

গঙ্গার দক্ষিণ তীর নৌকা হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। সৈকতসীমা পার হইয়া উচ্চ পাড় ; পাড়ের উপর কোথাও কর্কশ কাশ-স্তম্ব, কোথাও পীতপুষ্পিত সরিষার ক্ষেত, কোথাও তৃণশীর্ষ ছোট গ্রাম। নৌকা আগে চলিয়াছে, গ্রাম পিছাইয়া যাইতেছে ; আবার কাশের বন, আবার পীতপুষ্পিত সরিষার ক্ষেত, আবার গ্রাম। বিগ্রহ হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

ক্রমে সূর্য পাটে বসিল। আর একটি অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রাম ; গ্রাম-বধূরা নদীতে জল ভরিতে আসিয়াছে, একপাল গরু বাছুর জলের কিনারায় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া জল পান করিতেছে। ঘাট হইতে অদূরে চক্রবাক মিথুন কাতর কলধ্বনি করিয়া পরস্পর বিদায় লইল। সন্ধ্যা নামিতেছে, আকাশের গায়ে বৈরাগ্যের গৈরিক উত্তরীয়।

অতঃপর শোণ-সঙ্গম পর্যন্ত আর গ্রাম নাই, কেবল কাশের ক্ষুপ। শোণের মোহানা এক স্থানে স্থির থাকে না, কখনও পশ্চিমে সরিয়া যায়, আবার কখনও পাটলিপুত্রের দিকে সরিয়া আসে। স্মরণাতীত কাল হইতে এই চলিতেছে। তাই এই অব্যবস্থিত চিত্ত নদের মুখের কাছে জনবসতি নাই।

বিগ্রহপালের নৌকা যখন গঙ্গা-শোণ সঙ্গমে পৌঁছিল তখন দিনের আলো আর নাই, চাঁদের আলো ফুটিফুটি করিতেছে। অনচ্ছ চন্দ্রকিরণে জলস্থল অবাস্তব আলো-আঁধারিতে পরিণত হইয়াছে। বাতাস মন্থর হইয়া ক্রমশ থামিয়া আসিতেছে।

গরুড় আসিয়া বলিল—'আজ এখানেই নৌকা বাঁধি। বংগাল দেশের নৌকাটা সামনেই বেঁধেছে।'

বিগ্রহপাল হিম-কুহেলির ভিতর দিয়া সম্মুখে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, দেখিলেন চার-পাঁচ রজ্জু দূরে কিনার ঘেঁষিয়া একটি নৌকার অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যাইতেছে। পাল নামানো, গুণবৃক্ষটি শীর্ণ তর্জনীর মত ঊর্ধ্বদিকে নির্দিষ্ট।

অনঙ্গপালও দেখিতেছিল, বলিল—'মোহানার কাছে নৌকা বেঁধেছে, ওরাও বোধহয় শোণ নদে যাবে।'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, তাই মনে হয়। ওরা বেলা থাকতে থাকতে নৌকা বেঁধেছে, গঙ্গা দিয়ে যাবার হলে মোহানা পেরিয়ে নৌকা বাঁধত।'

অনঙ্গ বলিল—'তুমি এখানেই নৌকা বাঁধো, আর বেশি কাছে গিয়ে কাজ নেই।'

অতঃপর পাল নামাইয়া নৌকা তীরের আরও কাছে লইয়া গিয়া কাদায় বাঁশ পুতিয়া বাঁধা হইল। দাঁড়ী মাঝিরা সারা দিন পরে বিশ্রাম পাইল।

গরুড় রইঘরে দীপ জ্বালিয়া দিল, চারি কোণে দণ্ডের মাথায় চারিটি ঘৃতদীপ। দুই বন্ধু পাশা পাতিয়া খেলিতে বসিলেন। গরুড় নীচে রন্ধন করিতে গেল। অনঙ্গ তাহাকে বলিয়া দিল—'গরুড়, বেশি কিছু রাঁধতে হবে না, কেবল ভাত আর অলাবুর দধিপাক। মহারানী প্রচুর মাছ রেঁধে সঙ্গে দিয়েছেন, তাতেই আজ রাতটা চলে যাবে। তোমরাও পাবে।'

পাল রাজ-বংশীয়েরা বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াও তাঁহারা মাছ-ভাতের নেশা ছাড়িতে পারেন নাই।

যথাকালে অন্ন প্রস্তুত হইলে দুই বন্ধু আহার করিলেন। অনঙ্গপাল পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসিল। এলা দারুচিনি ও কেয়া-খয়ের দেওয়া সুগন্ধি তাম্বূল ; দুইজনে পান চিবাইতে চিবাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, কালপুরুষকে মধ্যে লইয়া অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আকাশে ঝলমল করিতেছে।

সহসা দূর হইতে মধুর স্ত্রীকণ্ঠের সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। দুই বন্ধু চকিত হইয়া চাহিলেন ; সম্মুখের নৌকা হইতে স্বরলহরী আসিতেছে। বিগ্রহ কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন—'ধন্য ! কথা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভারি মিষ্ট গলা।'

অনঙ্গ বলিল—'দেশ-বরাড়ী রাগ, যতি তাল। সঙ্গে সুষির বাজছে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'ওদের সঙ্গে যখন স্ত্রীলোক আছে, তখন ওরা নিশ্চয় চোর ডাকাত নয়।'

অনঙ্গ মাথা নাড়িল—'বলা যায় না, হয়তো মেয়ে-গলার গান শুনিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করবার একটা ছল, ব্যাধ যেমন বাঁশি বাজিয়ে হরিণ ধরে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তোর সব তাতেই সন্দেহ। যদি ওদের সত্যিই কোনও দুরভিসন্ধি থাকে, আমার সঙ্গে অগ্নিকন্দুক আছে।'

অনঙ্গ কিছু বলিল না। অগ্নিকন্দুক সম্বন্ধে তাহার মনে বিশেষ ভরসা ছিল না। মায়াবী যন্ত্রের সাহায্যে মায়া দেখায়, সেই যন্ত্র পাইলে প্রাকৃতব্যক্তি মায়া দেখাইতে পারে কি ? যা হোক, গান বন্ধ হইলে অনঙ্গ গরুড়কে ডাকিয়া রাত্রে সতর্ক থাকিবার অনুজ্ঞা দিল, তারপর দুই বন্ধু রইঘরে গিয়া পাশাপাশি শয্যায় শয়ন করিল। দুই দণ্ড পরে গঙ্গার কুলকুল ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

অন্য নৌকার যাত্রীরাও দেখিয়াছিল পাটলিপুত্র হইতে একটি নৌকা দূরে দূরে তাহাদের পিছনে আসিতেছে। তাহারাও সতর্কভাবে রাত্রিযাপন করিল।

পাঁচ

লক্ষ্মীকর্ণদেবের জামাতা জাতবর্মা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট অর্ধপথে বিদায় লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। শ্বশুরের সহিত যুদ্ধযাত্রার সাধ তাঁহার আদৌ ছিল না, নিতান্তই শ্বশুরের সাগ্রহ আহ্বানে অনিচ্ছাভরে জয়যাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। জয়যাত্রা যে এমন প্রহসনে পরিণত হইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

রাজধানী বিক্রমপুরে উপনীত হইয়া জাতবর্মা পিতৃদেবকে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। শুনিয়া মহারাজ বজ্রবর্মা খুব খানিকটা হাসিলেন ; বৈবাহিক বিপাকে পড়িলে কার না আনন্দ হয় ? তারপর বলিলেন—'যাক, প্রাণে প্রাণে ফিরে এসেছ এই যথেষ্ট। ভরসা করি বৈবাহিক মহাশয়ের শিক্ষা হয়েছে। নয়পাল নিরীহ মানুষ, তাই বেঁচে গেলেন।—বিগ্রহপালের সঙ্গে যদি যৌবনশ্রীর বিবাহ হয় তাহলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমাদেরও মঙ্গল। বিগ্রহপাল তোমার শ্যালীপতি হবে। শ্যালীপতিদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা কম। এখন অন্তঃপুরে যাও। বধূমাতা তোমার জন্য উৎকণ্ঠিতা আছেন।'

জাতবর্মা অন্তঃপুরে গেলেন। পত্নীর সহিত মিলন হইল। যেন কতদিনের দীর্ঘ বিচ্ছেদ, দুইজনে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।

বীরশ্রী তাঁহার ভগিনী যৌবনশ্রী অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। দীঘল পূর্ণায়ত দেহ ; সর্বাঙ্গে পরিণত যৌবনের প্রাচুর্য ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখখানি হয়তো যৌবনশ্রীর মত অত সুন্দর নয়, তবু রসে রহস্যে চটুলতায় এমনই প্রাণবন্ত যে নিছক সৌন্দর্যের ন্যূনতা সহসা অনুভব হয় না। দুই ভগিনীর প্রকৃতিও সম্পূর্ণ বিপরীত ; একজন যেমন শান্ত গম্ভীর, অন্যজন তেমনি হাস্যকৌতুকময়ী। তিন বৎসর হইল বীরশ্রীর বিবাহ হইয়াছে, এখনও সন্তানাদি হয় নাই ; স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হইয়া আছেন।

তৎকালে ভারতে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, বিশেষত রাজাদের মধ্যে। তাই বলিয়া সকলেই বহু বিবাহ করিতেন না। এক পত্নীতে যাঁহারা সুখী হইতেন তাঁহারা একনিষ্ঠ থাকিতেন। জাতবর্মাও একনিষ্ঠ ছিলেন।

জাতবর্মা ও বীরশ্রী দুই মাস আনন্দে কাটাইয়া দিলেন। তারপর ত্রিপুরী হইতে পত্র লইয়া দূত আসিল। যৌবনশ্রীর স্বয়ংবরে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা-জামাতাকে আহ্বান করিয়াছেন।

জাতবর্মা প্রথমটা ইতস্তত করিয়াছিলেন, শ্বশুর মহাশয়ের ব্যাপারে আবার জড়াইয়া পড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু বীরশ্রী স্বামীকে শয্যায় পাড়িয়া ফেলিয়া দুই মৃণালভুজে তাঁহার কণ্ঠাশ্লেষ করিয়া ধরিলেন, বলিলেন—'যৌবনার স্বয়ংবরে যদি আমায় না নিয়ে যাও, জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইব না।'

এরূপ অবস্থায় কোনও স্বামীই অধিকক্ষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না, জাতবর্মা তবু বলিলেন—'কিন্তু বীরা, ভেবে দেখ, যৌবনশ্রী যদি স্বয়ংবর সভায় আমার গলায় মালা দেয় তখন যে বড় বিপদ হবে।'

বীরশ্রী মুখ টিপিয়া হাসিলেন—'বেশ তো, ভালই হবে। দুই বোনে কেমন একসঙ্গে থাকব।'

জাতবর্মা বলিলেন—'তোমাদের দুই বোনের না হয় ভালই হবে। কিন্তু আমি ? একটি বোনকেই সামলাতে পারি না—'

বীরশ্রী স্বামীর মুখের উপর মুখ রাখিয়া চুপিচুপি বলিলেন—'ভয় নেই, তোমাকে আমি

স্বয়ংবর সভায় যেতে দেব না, ঘরে বন্ধ করে রাখব।'

সুতরাং রাজী হইতে হইল। মহারাজ বজ্রবর্মাও আপত্তি করিলেন না। যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন হইল। বাংলা দেশ হইতে ত্রিপুরী যাইতে হইলে জলপথই প্রশস্ত। স্থলপথে যাইলে অনেক লোকজন সঙ্গে লইতে হয়, জলপথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জাতবর্মা নৌকা সাজাইয়া বীরশ্রীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বড় নৌকা ; চৌদ্দজন নাবিক, দুইজন ভীমকায় দেহরক্ষী সঙ্গে আছে। উপরন্তু খাদ্যাদি অতিরিক্ত বস্তু বহনের জন্য একটি ছোট ডিঙা।

নৌকা প্রথমে উত্তরমুখে চলিল, তারপর কজঙ্গলের গিরিসংকট পার হইয়া পশ্চিমমুখী হইল। এখান হইতে মগধের সীমান্ত আরম্ভ। এতদিন গুণবৃক্ষের শীর্ষে রাজকীয় কেতন উড়িতেছিল, মগধে প্রবেশ করিয়া জাতবর্মা কেতন নামাইয়া লইবার আদেশ দিলেন। পররাজ্যে আত্মপরিচয় ঘোষণার প্রয়োজন নাই। মগধে অবশ্য বন্দর নাই, নৌ-সৈন্যের দ্বারা শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা নাই। যে-কালে এখানে অসংখ্য বিশাল রণতরীর সমাবেশ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া মনে হইত সে-কাল আর নাই। তবু যথাসম্ভব প্রচ্ছন্নভাবে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যাত্রার এক পক্ষ পরে একদিন প্রত্যূষে জাতবর্মার নৌকা পাটলিপুত্র পার হইয়া গেল। আর কয়েক ক্রোশ পরে গঙ্গা-শোণ সঙ্গম ; সন্ধ্যার পূর্বেই সেখানে পৌঁছানো যাইবে। একবার শোণ নদে প্রবেশ করিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত, সম্মুখে মাত্র সাত-আট দিনের পথ বাকি থাকিবে। এ পর্যন্ত অবশ্য নিরুপদ্রবেই আসা গিয়াছে, কিন্তু নারী লইয়া পথে যাত্রা করিলে মনে সর্বদাই চিন্তা লাগিয়া থাকে। এইজন্যই প্রবাদ আছে—পথি নারী বিবর্জিতা।

সেদিন দ্বিপ্রহরে দেখা গেল পাটলিপুত্রের ঘাট হইতে একটি নৌকা বাহির হইয়া তাঁহাদের পিছু লইয়াছে। জেলেডিঙি বা খেয়াতরী নয়, বেশ বড় নৌকা। অবশ্য ইহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কিছু নাই, নৌকাটি সম্ভবত কাশী বা প্রয়াগ যাইতেছে। সন্ধ্যার মুখে জাতবর্মা শোণের মোহানার কাছে নৌকা বাঁধিলেন। দুই দণ্ড পরে অস্ফুট চন্দ্রালোকে গা ঢাকিয়া অন্য নৌকাটি নিশাচর পেচকের ন্যায় অদূরে আসিয়া পাল নামাইল।

জাতবর্মা মনে মনে খুবই শঙ্কিত হইলেন কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। নাবিক ও রক্ষীরা আপনা হইতেই সতর্ক হইয়াছিল, তাহাদের কিছু বলিতে হইল না। কিয়ৎকাল চিন্তিতভাবে নৌকার পট্টপত্তনের উপর বিচরণ করিয়া জাতবর্মা মুখে প্রফুল্লতা আনিয়া রইঘরে প্রবেশ করিলেন। বীরাকে কিছু বলা হইবে না, সে ভয় পাইতে পারে।

রইঘরে দীপ জ্বলিয়াছে। বীরশ্রী আপন হাতে বেণী রচনা করিয়া দর্পণ হস্তে সীমন্তে সিন্দূর পরিতেছেন। সীমন্তে সিন্দূর পরার রীতি তিনি বিবাহের পর শিখিয়াছেন, বঙ্গ-মগধের বাহিরে দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতে সিঁথির সিন্দূর পরার রীতি নাই ; বিবাহিতা রমণীরা কণ্ঠে মঙ্গলসূত্র ও ললাটে কুঙ্কুমের টিপ পরেন। জাতবর্মা বীরশ্রীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলে বীরশ্রী মৃদু হাসিয়া স্বামীর ভ্রূমধ্যে সিন্দূরের ফোঁটা আঁকিয়া দিলেন। জাতবর্মা আপত্তি করিলেন না। তৎকালে স্ত্রী ও পুরুষের প্রসাধন অনেকটা একই প্রকার ছিল ; বিলাসী পুরুষেরা অঙ্গদ কুণ্ডল পরিতেন, লাক্ষারসে নখ ও অধর রঞ্জিত করিতেন, চোখে কাজল দিতেন। গলায় হার থাকিত, পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা।

জাতবর্মা বাঁশি লইয়া পালঙ্কের পাশে বসিলেন এবং ধীরে ধীরে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বীরশ্রী আসিয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পাশে বসিলেন, তারপর তাঁহার কণ্ঠ হইতে গানের মৃদু গুঞ্জরন বাহির হইল। দুইজনেই সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ। নির্জন গঙ্গার তীরে নৌকার দীপালোকিত রতিগৃহে যেন গন্ধর্বলোকের মায়া সৃষ্ট হইল।

ছয়

পরদিন প্রাতঃকালে দুই নৌকা প্রায় একই সময় কাছি খুলিয়া যাত্রা শুরু করিল। রাত্রে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই, তাই উভয় পক্ষই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—অপর পক্ষ দস্যু তস্কর নয়।

বংগাল দেশের নৌকা আগে আগে শোণ নদে প্রবেশ করিল, তাহার পাঁচ রশি পিছনে বিগ্রহপালের নৌকা। এতক্ষণ তাঁহারা পশ্চিম দিকে চলিতেছিলেন, এখন দক্ষিণ-পশ্চিমে চলিলেন। এই পথে আরও তিন দিন চলিলে মগধের সীমানায় পৌঁছানো যাইবে ; তারপর হইতে চেদিরাজ্যের আরম্ভ।

সূর্যোদয় হইল। শোণের স্বর্ণাভ জল কাঁচা রৌদ্রে ঝলমল করিয়া উঠিল। দুইটি নৌকা আগে-পিছে চলিয়াছে। যাত্রীদের মন নিশ্চিন্ত হইয়াছে বটে কিন্তু দুশ্চিন্তার পরিবর্তে কৌতূহল জাগিয়াছে।—ওরা কারা ? কোথায় যাইতেছে ? ওরাও কি ত্রিপুরী যাইবে ? না যাইতেও পারে ; হয়তো পথে রোহিতাশ্বগড়ে থাকিয়া যাইবে। রোহিতাশ্বগড় শোণ নদের তীরে মগধের দক্ষিণ সীমান্তের প্রহরী।

অনঙ্গপাল নদীতে মাছ ধরার উদ্যোগ করিতেছিল। মাছ না হইলে তাহার চলে না ; সে মুগার সূতা, বঁড়শি প্রভৃতি সঙ্গে আনিয়াছিল। এখন নৌকার পিছন দিকে গিয়া বসিল, বঁড়শিতে টোপ গাঁথিয়া দূরে জলের মধ্যে ফেলিয়া সূতা ধরিয়া বসিয়া রহিল। সকালবেলার নরম রৌদ্র বড় মিঠা।

বিগ্রহপাল বন্ধুর কাছে আসিয়া বসিলেন। দুইজনে অলস জল্পনা করিতে লাগিলেন। গঙ্গার জল ধূসর, শোণের জল সোনালি কেন ? কত জাতের হাঁস চরে বসিয়া রোদ পোহাইতেছে। উহাদের ধরা যায় না ?

তারপর বিগ্রহ বলিলেন—'সামনের নৌকায় কে যাচ্ছে জানবার ভারি কৌতূহল হচ্ছে। হয়তো গৌড় কি সমতট কি প্রাগ্‌জ্যোতিষ থেকে কেউ স্বয়ংবরে যাচ্ছে।'

অনঙ্গ বলিল—'যদি তাই হয় দূরে থাকাই ভাল। তোকে চিনে ফেললেই বিপদ।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আমাকে ওরা কি করে চিনবে ? যদি জানতে চায়, বললেই হবে আমরা বণিক, ত্রিপুরীতে বাণিজ্য করতে যাচ্ছি।'

মন খুঁত খুঁত করিলেও অনঙ্গ আর আপত্তি করিল না। বিগ্রহপাল তখন গরুড়কে ডাকিয়া বলিলেন—'নৌকা আরও জোরে চালাও। সামনের নৌকার পাশাপাশি হয়ে খবর নাও, ওরা কারা, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে। আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে বোলো আমরা ব্যাপারী।'

'আজ্ঞা' বলিয়া গরুড় চলিয়া গেল।

নৌকা এতক্ষণ পালের ভরে চলিতেছিল, সঙ্গে চার দাঁড় ছিল ; এখন ছয় দাঁড় লাগিল। নৌকার গতি শীঘ্র হইল। এক দণ্ডের মধ্যে দুই নৌকা পাশাপাশি হইল, মধ্যে ত্রিশ হস্তের ব্যবধান।

দুই নৌকার দুই দিশারুর মধ্যে সতর্ক বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। গরুড় গলা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল—'কোথা যাও ?'

অন্য দিশারুর চেহারাও টিকটিকির মত ; নাম বোধকরি জটায়ু। সে বলিল—'তুমি কোথা যাও ?'

গরুড় বলিল—'ত্রিপুরীর ঘাট অবধি।'

জটায়ু বলিল—'আমিও ত্রিপুরীর ঘাট অবধি।'

এইখানে ভাষা সম্বন্ধে দু'টা কথা বলিয়া রাখি। তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারতে দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল ; পশ্চিমে শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং পূর্বে মাগধী অপভ্রংশ। উভয় ভাষাই সংস্কৃতের বিকার ; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বেশি ছিল না। বাংলা দেশের মানুষ বিনা ক্লেশে শৌরসেনী ভাষা বুঝিত, পশ্চিম ও মধ্যদেশের লোকেরা মাগধী অপভ্রংশের বঙ্গীয় রূপ বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম হইত না। তখনও বাংলা ও অন্যান্য প্রান্তীয় ভাষাগুলি দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে নাই।

যা হোক, গরুড় বলিল—'কোন কাজে ত্রিপুরী যাও ?'

জটায়ু বলিল—'তুমি কোন কাজে যাও ?'

গরুড় বলিল—'ব্যাপার করতে যাই।'

জটায়ু বলিল—'আম্মো।'

গরুড় বলিল—'তোমার নৌকায় কয়জন যাত্রী ?'

এই সময় জাতবর্মা রইঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অপর নৌকায় বিগ্রহপাল দিশারুদ্বয়ের বাক্‌চাতুর্যে অধীর হইয়া নৌকার পিছন দিক হইতে উঠিয়া আসিলেন। দুইজনে দৃষ্টি বিনিময় হইল। কিছুক্ষণ অবাক থাকিয়া দুইজনেই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

বিগ্রহ বলিলেন—'এ কি, যুবরাজ ভট্টারক জাতবর্মা। শ্বশুরালয়ে চলেছেন ?'

জাতবর্মা বলিলেন—'আপনি ! কুমার—'

বিগ্রহপাল সচকিতে অধরের উপর অঙ্গুলি রাখিলেন, জাতবর্মা থামিয়া গেলেন। ওদিকে অনঙ্গপাল হাসি ও কথার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, সে গলুইয়ে মাছ-ধরা সূতা বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল, কর্ণধারকে বলিয়া আসিল—'তুমি এদিকে একটু দৃষ্টি রেখো।'

অনঙ্গ বিগ্রহপালের পাশে উপস্থিত হইলে বিগ্রহ তাহার কানে কানে জাতবর্মার পরিচয় দিলেন। অনঙ্গ এমনভাবে বিগ্রহের পানে তাকাইল যাহার অর্থ—কেমন, বলেছিলাম কিনা। তারপর সে জাতবর্মার দিকে ফিরিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিল। বিগ্রহ বলিলেন—'আমার বয়স্য অনঙ্গ।'

জাতবর্মা প্রতি-নমস্কার করিলেন। বিগ্রহ বলিলেন—'আপনি আসুন না আমার নৌকায়, ভাল করে আলাপ করা যাক।'

জাতবর্মা বলিলেন—'আপনারা আসুন না, আমি ডিঙা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আপত্তি নেই। আপনি একা যাচ্ছেন তো ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'না, সঙ্গে শ্বশুরকন্যা আছেন।'

বিগ্রহপাল মুখের একটি সকৌতুক ভঙ্গি করিলেন, বলিলেন—'তাহলে আপনিই আসুন।'

জাতবর্মা পলকের জন্য ইতস্তত করিলেন, কিন্তু তাহা অভ্যস্ত সতর্কতার সংস্কার মাত্র। বিগ্রহপালের মনে যে ছল-চাতুরী নাই তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই অনুভব হয়। জাতবর্মা হাসিয়া বলিলেন—'ভাল, কি খাওয়াবেন বলুন। বিক্রমশীল মঠের লঙ্গিকা দিলে কিন্তু যাব না।'

বিগ্রহপাল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন—'না না, মায়ের হাতের কর্চরিকা আর ক্ষীরের লাড়ু আছে। যদি আপত্তি না থাকে আসুন।'

জাতবর্মা বলিলেন—'মায়ের হাতের কুচুরি ! ক্ষীরের লাড়ু ! ধন্য ! আমি এখনি যাচ্ছি। আমার সঙ্গেও কিছু মিষ্টান্ন ছিল, কিন্তু সে অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে।'

জাতবর্মার নৌকার পিছনে ডিঙা বাঁধা ছিল, তাঁহার আদেশে নৌকা পাশে আসিয়া ভিড়িল। তিনি ডিঙায় চড়িয়া বিগ্রহপালের নৌকায় আসিয়া উঠিলেন। দুই নৌকা পাশাপাশি চলিতেই রহিল।

বিগ্রহপাল জাতবর্মাকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন—'প্রথম দর্শনেই আপনার সঙ্গে আলাপ

করবার লোভ হয়েছিল। কিন্তু তখন দৈব ছিল প্রতিকূল—'

জাতবর্মা বলিলেন—'আপনাদের বোধহয় বিশ্বাস আমি শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে মগধ জয় করতে এসেছিলাম। আপনারা আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। শ্বশুর মহাশয় আমাকে মৃগয়ার ছল করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যা হোক, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। আপনি স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন তো ?'

বিগ্রহপাল অনঙ্গের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিলেন, বলিলেন—'কতকটা তাই বটে। আসুন, ভিতরে বসা যাক।'

বিগ্রহ ও জাতবর্মা রইঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন। অনঙ্গপাল মান্য অতিথির জন্য পেটরা হইতে মিষ্টান্নাদি বাহির করিয়া সোনার থালায় সাজাইতে লাগিল।

জাতবর্মা বলিলেন—'কি ব্যাপার বলুন। মনে হচ্ছে কিছু গণ্ডগোল আছে।'

বিগ্রহপাল বলিলেন—'গণ্ডগোল আছে। আমি ত্রিপুরী যাচ্ছি বটে কিন্তু স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রিত হইনি।'

'নিমন্ত্রিত হননি !' জাতবর্মা হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন।

বিগ্রহপাল বলিলেন—'আপনি দেখছি জানেন না। আপনার শ্বশুর মহাশয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। আর্যাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল রাজাই আমন্ত্রিত হয়েছেন, কেবল মগধ বাদ পড়েছে।'

জাতবর্মার মুখ ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; তিনি কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—'লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। শ্বশুর মহাশয় সম্বন্ধে আমার মনে কোনও মোহ নেই, কিন্তু তিনি যে বাক্যদান করে খণ্ডন করবেন এ আমার কল্পনার অতীত।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আপনি ক্ষত্রিয়ের মত কথা বলেছেন। এখন বলুন দেখি, আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন ?'

জাতবর্মার কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—'আমি কি করতাম ? চেদিরাজ্য আক্রমণ করতাম, বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করে আনতাম।'

বিগ্রহপাল কলকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে জাতবর্মার গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, বাহু দিয়া পৃষ্ঠ আবেষ্টন করিয়া বলিলেন—'বন্ধু, আপনি আমার মনের কথাটি বলেছেন।'

বিগ্রহপালের মুক্তকণ্ঠ হাসি জাতবর্মার মুখেও সংক্রামিত হইল। তিনি বলিলেন—'ব্যাপার কি ? আপনি কি তবে— ?'

এই সময় অনঙ্গ স্বর্ণপাত্রে জলযোগ আনিয়া জাতবর্মার সম্মুখে স্থাপন করিল। বিগ্রহ বলিলেন—'আগে একটু মিষ্টিমুখ করুন।'

জাতবর্মা আহার্যগুলিকে সস্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া একটি কর্চরিকা তুলিয়া লইলেন, তাহাতে একটু কামড় দিয়া চক্ষু মুদিয়া চিবাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—'বিগ্রহ, তুমি আমার ভাই, তোমার মা আমার মা। ত্রিপুরী থেকে ফেরবার পথে আমি পাটলিপুত্রে নামব, মায়ের হাতের রান্না পেটভরে খেয়ে তবে দেশে ফিরব। তুমি যদি আপত্তি কর তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে।'

বিগ্রহ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন—'আজ থেকে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, আমি তোমার কনিষ্ঠ, আমার মা তোমার মা। কিন্তু মনে থাকে যেন তোমার মায়ের ভাগও আমাকে দিতে হবে।'

জাতবর্মা নিশ্বাস ফেলিলেন—'আমার মা নেই, জীবনে মায়ের আদর পাইনি। তাই তো তোমার মায়ের ওপর লোভ।'

পরিপূর্ণ হৃদয়ে দুইজন কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। প্রথম দর্শনে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা যেন এখন সুদৃঢ় বন্ধনে পরিণত হইল। নবীন যৌবনে হৃদয় যখন কোমল থাকে তখন এমনি করিয়াই প্রণয় হয়।

অনঙ্গপাল এতক্ষণ ঘরের মধ্যেই ছিল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নিজেকে একটু পিছনে রাখিয়াছিল ; বিগ্রহ প্রাণ-খোলা মানুষ, সে হয়তো জাতবর্মার কাছে গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে, এ-আশঙ্কা তাহার মনে ছিল। কিন্তু জাতবর্মার মনের পরিচয় পাইয়া তাহার শঙ্কা দূর হইল। জাতবর্মা এমন মানুষ যে তাঁহার কাছে মনের গুহ্যতম কথা বলিয়াও পশ্চাত্তাপের ভয় নাই।

অনঙ্গ এখন জাতবর্মার কাছে আসিয়া বসিল, বলিল—'যুবরাজ, আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। মা'র কাছে এত কম খেলে বকুনি খেতে হবে।'

'সেটাও তো খাওয়া। মা'র কাছে বকুনি খাওয়ার সৌভাগ্য কয়জনের হয় ?' জাতবর্মা আবার জলযোগে প্রবৃত্ত হইলেন, 'যাক, বিগ্রহ, এখন বল দেখি তুমি একা একা ত্রিপুরী যাচ্ছ কেন ? যদি আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য, সৈন্য সঙ্গে নেই কেন ? সৈন্য কি স্থলপথে যাচ্ছে ?'

বিগ্রহ মাথা নাড়িলেন—'না। পিতৃদেব সামান্য কারণে যুদ্ধ করার বিরোধী। আমি তাঁকে না জানিয়ে চুপি চুপি ত্রিপুরী যাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন ? কোনও ফন্দি আছে নিশ্চয়।'

'ফন্দি আছে একটা। কিন্তু তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে।'

'কি, বড় ভায়ের কাছে সঙ্কোচ ! শীঘ্র বল কি ফন্দি এঁটেছ।'

'তুমি কাউকে বলবে না ?'

'কাকে বলব ? শ্বশুর মহাশয়কে ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ও বুড়ার ওপর আমার তিলমাত্র শ্রদ্ধা নেই। তাঁকে ঘুণাক্ষরে কিছু বলব না।' জাতবর্মা এই বলিয়া একটু থামিলেন, তারপর বলিলেন—'কিন্তু একটা কথা আছে।'

'কি কথা ?'

'তোমার ভ্রাতৃবধূর কথা, যিনি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি যদি সন্দেহ করেন আমি তাঁর কাছে কথা গোপন করছি তাহলে যেন-তেন প্রকারেণ কথাটি বার করে নেবেন। তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারি এত শক্তি আমার নেই।'

বিগ্রহপাল হাসিলেন—'বধূরানীর কাছে গোপন করতে না পার, তাঁকে বোলো। তিনি নিশ্চয় অন্য কাউকে বলবেন না ?'

জাতবর্মা গম্ভীর মুখে বলিলেন—'বীরশ্রীর ইচ্ছা না থাকলে তার পেট থেকে কথা বার করতে পারে এমন মানুষ আজও জন্মায়নি।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তা হলেই হল। বেশি জানাজানি হলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে।'

'জানাজানি হবে না। তুমি বল।'

বিগ্রহ তখন বলিলেন—'ফন্দি আর কিছু নয়, যৌবনশ্রীকে চুরি করে আনব।'

জাতবর্মা কিয়ৎকাল বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—'চুরি করে আনবে !'

'হাঁ। তোমার আপত্তি নেই তো ?'

'আপত্তি ! চুরি করা আর হরণ করা একই কথা। ক্ষত্রিয় যদি কন্যা হরণ করে বিবাহ করে তাতে অন্যায় হয় না। বিশেষত বর্তমান ক্ষেত্রে যৌবনশ্রীকে চুরি করবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে।—কিন্তু চুরি করবে কি করে ? রাজপুরী থেকে রাজকন্যাকে চুরি করা তো সহজ কাজ নয়।'

'উপায় এখনও কিছু স্থির হয়নি। ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। তোমার তাহলে অমত নেই ?'

'না, অমত নেই। যৌবনশ্রী যদি আমার শ্যালিকা না হয়ে ভগিনী হত তবু অমত হত না। এবং আমার বিশ্বাস বীরা যদি জানতে পারে তারও অমত হবে না। সে—বাঙালী স্বামী তার খুব পছন্দ।' বলিয়া জাতবর্মা বিগ্রহপালের পানে অপাঙ্গে হাসিলেন।

অন্য দুইজনও ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। জাতবর্মা জলযোগ সমাপ্ত করিয়া তাম্বূল মুখে দিতে দিতে পরিতৃপ্ত স্বরে বলিলেন—'ধন্য।'

এই সময় নৌকার পিছন দিক হইতে কর্ণধারের উচ্চ কণ্ঠস্বর আসিল—'ভট্টা, মাছ টোপ গিলেছে। শীঘ্র আসুন।'

অনঙ্গ এক লাফে বাহিরে গেল। বিগ্রহপাল ও জাতবর্মা তাহার পিছনে গেলেন। গলুইয়ে বাঁধা সূতায় টান পড়িয়াছে, জলের তলায় বঁড়শিবিদ্ধ মাছ মুক্তির জন্য প্রাণপণ ছুটাছুটি করিতেছে। অনঙ্গ দ্রুত সূতা নিজের হাতে লইল, তারপর সূতায় অদৃশ্য মাছের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া হাসিমুখে বলিল—'বড় মাছ।'

এক দণ্ড খেলাইয়া অনঙ্গ মৎস্যটিকে নৌকায় তুলিল। সিন্দূরবর্ণ প্রকাণ্ড একটি রোহিত মৎস্য। সকলের মুখের হাসি আকর্ণ প্রসারিত হইল।

বিগ্রহ মুগ্ধ চক্ষে মৎস্যটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'অনঙ্গ, এ মাছ আমাদের জন্য নয়, বধূরানী এ মাছ খাবেন। এখনি তেল-সিঁদুর দিয়ে মাছ ও নৌকায় পাঠিয়ে দাও।'

অনঙ্গ বলিল—'সাধু! এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

জাতবর্মা দুই একবার না না করিলেন, তারপর বলিলেন—'বেশ, কিন্তু একটি শর্ত। এ বেলা আর সময় নেই, কিন্তু রাত্রে তোমরা দু'জন আমার নৌকায় আহার করবে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'ভাল। কিন্তু বধূরানী যদি নিজের হাতে রাঁধেন তবেই খাব।'

জাতবর্মা বলিলেন—'ওকে দিয়েই রাঁধাব। বিয়ের পর ও মাছ রাঁধতে শিখেছে। পিতৃদেবের আজ্ঞা, বধূরা প্রত্যহ স্বামী শ্বশুরের জন্য অন্তত একটি ব্যঞ্জন রাঁধবে।'

রাজমহিষী রাজবধূ নিজ হস্তে রন্ধন করেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সেকালে রাজকুলের কন্যাদের চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে হইত। বিপুল রাজসংসার পরিচালনের ভার তাঁহাদের হাতেই থাকিত। কেবল পালঙ্কে শুইয়া দাসীদের পদসেবা গ্রহণ করিলে তাঁহাদের নিন্দা হইত। কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—বামা কুলস্যাধয়ঃ। বস্তুত রাজারানী ও রাজবংশীয়গণ প্রাকৃতজনের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুন নিজেদের মধ্যে সহজ সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করিতেন।

অতঃপর বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া জাতবর্মা মৎস্য লইয়া নিজ নৌকায় ফিরিয়া গেলেন।

সাত

জাতবর্মা ও বিগ্রহপাল যখন দুই নৌকায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতেছিলেন তখন বীরশ্রী অন্তরাল হইতে তাহা শুনিয়াছিলেন। স্বভাবতই তাঁহার মনে কৌতূহল জাগরূক হইয়াছিল। তারপর জাতবর্মা অন্য নৌকায় চলিয়া গেলেন এবং প্রকাণ্ড একটি মাছ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মাছ দেখিয়া বীরশ্রীর মন আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল। তিনি যতদিন পিত্রালয়ে ছিলেন মাছের স্বাদ জানিতেন না। বংগাল দেশে বিবাহের পর মাছের মহিমা বুঝিয়াছেন। মাছ দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন—'কী সুন্দর পাকা রুই। আমি রাঁধব।'

জাতবর্মা বলিলেন—'ভাল, তুমিই রাঁধ। আজ ও নৌকার দু'জনকে রাত্রে খেতে বলেছি।'

বীরশ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওরা কারা?'

জাতবর্মা অবহেলাভরে বলিলেন—'চেনা লোক।' বলিয়া স্নানের জন্য প্রস্থান করিলেন। বীরশ্রী কিছুক্ষণ চোখ বাঁকাইয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর ভৃত্য ডাকিয়া মাছটির আঁশ ছাড়াইয়া কুটিয়া রাখিবার জন্য ডিঙায় পাঠাইয়া দিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জাতবর্মা তাড়াতাড়ি পালঙ্কে শুইয়া পড়িলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃদু মৃদু নাক ডাকিতে লাগিল। বীরশ্রী মনে মনে হাসিয়া রইঘরের ছাদে চুল শুকাইতে গেলেন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র একটু কড়া বটে কিন্তু পালের আওতায় বসিলে গায়ে রোদ লাগে না, কেবল মধুর উত্তাপটুকু পাওয়া যায়।

নিঃঝুম মধ্যাহ্নে চারদিক তন্দ্রাচ্ছন্ন। অন্য নৌকাটা আবার পিছাইয়া পড়িয়াছে। পাটলিপুত্র হইতে ওই নৌকা তাঁহাদের পিছু লইয়াছে। উহাতে কে যাইতেছে? জাতবর্মার চেনা লোক, সুতরাং কখনই সামান্য লোক নয়—

বীরশ্রীর মনে পড়িল দুই মাস পূর্বে মৃগয়া হইতে ফিরিয়া জাতবর্মা তাঁহাকে ভাসা-ভাসা ভাবে পর্যটনের কাহিনী শুনাইয়াছিলেন, মৃগয়া যে প্রকৃতপক্ষে মৃগয়া নয়, মগধ আক্রমণের ছল তাহাও বলিয়াছিলেন। বিক্রমশীল বিহার...পিশাচের দৌরাত্ম্য...মহারাজ নয়পাল, যুবরাজ বিগ্রহপাল—সব কথা বীরশ্রী মন দিয়া শোনেন নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করেন নাই। বহুদিন পরে স্বামীকে পাইয়া অন্য সব কথা অবান্তর হইয়া গিয়াছিল, পরম প্রাপ্তির মধ্যে কৌতূহলও ডুবিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ওই নৌকায় কাহারা যাইতেছে? জাতবর্মা উহাদের পরিচয় গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে।

চুল শুকাইলে বীরশ্রী নীচে গেলেন। জাতবর্মা শয্যায় পূর্ববৎ শুইয়া আছেন। তাঁহার শয়নের ভঙ্গি দেখিয়া সন্দেহ হয়—কপট নিদ্রা। বীরশ্রী তাঁহার পায়ের তলায় অতি কোমলভাবে অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলেন। জাতবর্মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বীরশ্রী মধুর হাসিয়া বলিলেন—'পদসেবা করছিলাম। পতির পদসেবা করা সতীর ধর্ম।'

জাতবর্মা গলার মধ্যে একটি শব্দ করিয়া আবার শয়নের উপক্রম করিলেন। বীরশ্রী কিন্তু তাঁহাকে শুইতে দিলেন না, দুই বাহু দিয়া কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া খাড়া রাখিলেন। বলিলেন—'এবার কিন্তু কানে কাঠি দেব। মট্‌কা মেরে শুয়ে থাকলেই কি আমার হাত এড়াতে পারবে?'

জাতবর্মা যেন ঈষৎ সচেতন হইয়াছেন এমনিভাবে হাই তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'কি হয়েছে?'

বীরশ্রী বলিলেন—'হয়নি কিছু। ওরা কারা? সত্যি কথা বল, সহধর্মিণীর কাছে মিথ্যে কথা বলতে নেই।'

জাতবর্মা অবাক হইয়া বলিলেন—'ওরা? কাদের কথা বলছ?'

'আহা, কিছুই যেন জানেন না! ওই নৌকার ওরা।'

'ও—ওদের কথা বলছ! বলেছি তো ওরা চেনা লোক।'

'চেনা লোক তা বুঝেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে পরিচয় হল কি করে? কোথায় পরিচয় হল?'

'এঁ—বিক্রমশীল বিহারে দেখা হয়েছিল।'

'বিক্রমশীল বিহারে তো ভিক্ষুরা থাকে। এরা কি ভিক্ষু?'

'না। এরা—মানে—বণিক, শ্রেষ্ঠী। স্বয়ংবর উপলক্ষে ত্রিপুরীতে বাণিজ্য করতে যাচ্ছে।'

'নাম কী?'

'নাম? নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—' জাতবর্মা মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

'এত চেনা-শোনা, আর নাম মনে পড়ছে না !'

'হাঁ হাঁ, বিক্রমপাল।'

বীরশ্রী বিশ্বাস করিলেন না। জাতবর্মার ভাবভঙ্গি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি সত্য গোপন করিতেছেন। বীরশ্রী তখন বৃথা তর্ক ত্যাগ করিয়া জাতবর্মাকে শয্যার উপর চিৎ করিয়া ফেলিলেন এবং নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। ঘটয় ভুজ বন্ধনম্ জনয় রদ খণ্ডনম্—কবি জয়দেব এই জাতীয় উৎপীড়নের বিশদ বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। যুগযুগ ধরিয়া প্রেমবতী যুবতীরা পতিদেবতাদের এইভাবে নির্যাতন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কেহ কিছু বলে না। জাতবর্মা বেশিক্ষণ এই নির্যাতন প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

'আচ্ছা—বলছি।'

'বল—শীঘ্র বল। নইলে—'

'বলছি—বলছি।'

অতঃপর শান্তি স্থাপিত হইল, দুইজনে পাশাপাশি শয়ন করিলেন ; জাতবর্মা সত্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মীকর্ণের মগধ-অভিযান হইতে আজ প্রাতঃকালের ঘটনা পর্যন্ত সমস্তই প্রকাশ পাইল। শুনিয়া বীরশ্রী শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়াহত নেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

'বাবা এই কাণ্ড করেছেন ?'

'করেছেন। এখন বল, এ প্রস্তাবে তোমার অমত আছে ?'

বীরশ্রীর মন সম্পূর্ণরূপে যৌবনশ্রীর হরণ প্রস্তাবে সায় দিয়াছিল। কিন্তু যুবতীরা কোনও কালেই এক কথায় কোনও প্রস্তাবে সম্মত হন না। বীরশ্রী স্রস্ত চুলগুলিকে জড়াইয়া কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে গূঢ় হাসিলেন। বলিলেন—'আগে মানুষটিকে দেখি।'

অনন্তর বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া বীরশ্রী কোমরে আঁচল জড়াইয়া মৎস্য রন্ধনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

নদীর মাঝখানে মকরপৃষ্ঠের মত একটি লম্বা বালুচর জাগিয়া উঠিয়াছে। সূর্যাস্ত হইলে জাতবর্মা এই চরের পাশে নৌকা ভিড়াইলেন। বিগ্রহপালের নৌকা এক রশি পিছনে পাল নামাইল। আজ রাত্রিটা এই বালুচরের পাশেই কাটানো হইবে। তীরের চেয়ে নদীর মধ্যস্থিত চর অধিক নিরাপদ। রাজহংস জাতীয় জলচর পাখিরাও রাত্রে নদীতীরে বাস করে না, এইরূপ চরে আসিয়া রাত্রিযাপন করে।

নৌকা বাঁধা হইলে বিগ্রহপাল অনঙ্গকে বলিলেন—'আয়, বালির ওপর একটু বেড়াই। মনে হচ্ছে কতদিন মাটিতে পা দিইনি।'

অনঙ্গ বলিল—'তোকে তো ও নৌকায় নেমন্তন্ন খেতে হবে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তার এখনও দেরি আছে। রাত্রি হোক, তারপর যাব। তুইও তো যাবি।'

অনঙ্গ মাথা নাড়িয়া হাসিল—'না, আমি যাব না, তুই একা যা। আমি গেলে রসভঙ্গ হবে। বলে দিস্, আমার কান কট্‌কট্ করছে।'

বিগ্রহপাল বুঝিলেন, অনঙ্গের কথা যথার্থ। যেখানে দুই পক্ষে ঘনিষ্ঠতার আগ্রহ সেখানে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি বরবধূর মিলন-মন্দিরে ননদিনীর মত, বাধারই সৃষ্টি করে। বিগ্রহ জোর করিলেন না।

নৌকা হইতে বালুচরের কিনারা পর্যন্ত পাটাতন ফেলিয়া সেতু রচিত হইল, বিগ্রহপাল অবতরণ করিলেন। বালুর উপরিভাগ শুষ্ক, স্থানে স্থানে কাশের অঙ্কুর গজাইয়াছে। অসমতল

বালুর খাঁজে নদীর জল ধরা পড়িয়াছে ; স্বচ্ছ অগভীর জলে ছোট ছোট শফরী খেলা করিতেছে।

বিগ্রহপাল সামনের নৌকার দিকে না গিয়া পিছন দিক দিয়া দ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। কয়েকটি ময়ূরকণ্ঠী রঙের ছোট হাঁস জলের ধারে রাত্রিবাসের উদ্যোগ করিতেছিল, তাহারা উড়িয়া গিয়া দ্বীপের অপর অংশে বসিল। একটি হ্রস্বপুচ্ছ দীর্ঘজঙ্ঘ সারস মানুষের অভ্যাগমে বিরক্ত হইয়া অন্য দ্বীপের সন্ধানে উড়িয়া গেল।

জলের ধারে ধারে পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করিয়া বিগ্রহপাল যখন জাতবর্মার নৌকার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন চাঁদের আলো ফুটিয়াছে। জাতবর্মা নিজ নৌকা হইতে নামিয়া বালুর উপর দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন—'এস ভাই, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। অনঙ্গ কোথায় ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'সে এল না। দাঁত কন্‌কন্ করছে।'

অনঙ্গ সম্বন্ধে আর কথা হইল না। দুইজনে নৌকায় উঠিলেন।

রইঘর বহু দ্বীপের আলোকে উজ্জ্বল। জাতবর্মা প্রবেশ করিয়া বলিলেন—'বীরা, এই নাও তোমার দেবর—আমার ভাই বিগ্রহ।'

বীরশ্রী দেখিলেন, বিগ্রহপাল ননীর পুতুল নয়, লৌহ ভীমও নয় ; কমকান্তি নবীন যুবা। মুখ হইতে কৈশোরের সৌকুমার্য সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। চরিত্রে গাম্ভীর্যের হয়তো একটু অভাব আছে, কিন্তু অসংযত লঘুতাও নাই। চোখের দৃষ্টি তীরের মত ঋজু, অধরোষ্ঠ কৌতুকের পুষ্পধনু। বীরশ্রী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে যৌবনশ্রীকে বিগ্রহপালের পাশে দাঁড় করাইলেন। দিব্য মানাইবে।

বিগ্রহপাল দেখিলেন, বীরশ্রী যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মী। পরিধানে রত্নদ্যুতিখচিত পট্টাম্বর, কণ্ঠে কর্ণে কটিতে মণিময় অলঙ্কার, মণিবন্ধে শশিকলার ন্যায় শঙ্খবলয়, সীমন্তে সিন্দূর, মাথায় অবগুণ্ঠন সীমন্ত পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। বিগ্রহ মনে মনে ভাবিলেন, যৌবনশ্রী যদি দিদির মত দেখিতে হন—

তিনি দ্রুত গিয়া বীরশ্রীর পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—'দেবি, আমি আপনার শরণ নিলাম।'

বীরশ্রী অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া কৌতুক-তরল কণ্ঠে বলিলেন—'বিজয়ী হও—তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক।'

জাতবর্মা মহানন্দে হাসিয়া উঠিলেন।

তারপর হাস্য পরিহাস পান আহার চলিল। বীরশ্রী বিগ্রহপালের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলেন যেন বিগ্রহ তাঁর অল্পবয়স্ক দেবর, একটু দুষ্ট অকালপক্ক দেবর। বিগ্রহপালও বীরশ্রীর জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ছেলেমানুষ হইয়া রহিলেন। বীরশ্রী যে সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

স্বয়ংবর ও যৌবনশ্রী সম্বন্ধে কোনও কথা হইল না। বিগ্রহপাল বুঝিলেন, ও প্রসঙ্গ স্থগিত রহিল মাত্র, পরে উত্থাপিত হইবে।

অবশেষে চন্দ্র অস্ত যায় দেখিয়া বিগ্রহপাল পূর্ণ তৃপ্ত হৃদয়ে নিজ নৌকায় ফিরিয়া গেলেন।

অনঙ্গ জাগিয়া ছিল। বিগ্রহপাল শয়ন করিলে জিজ্ঞাসা করিল—'দেবী বীরশ্রীকে কেমন দেখলি ?'

বিগ্রহ গাঢ়স্বরে বলিলেন—'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। এমন মহিমময়ী নারী আর দেখিনি।'

অনঙ্গ বলিল—'বাপের মত নয় ?'

বিগ্রহ হাসিয়া উঠিলেন—'দূর ! একেবারে বিপরীত।'

'ভাল। ভরসা করা যেতে পারে, দেবী যৌবনশ্রী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত হবেন, বাপের মত হবেন না। এবার তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

বিগ্রহপালের কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘুম আসিল না। তিনি অনঙ্গকে আজিকার রাত্রির সমস্ত ঘটনা, সমস্ত বাক্যালাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনাইলেন। শুনিয়া অনঙ্গ বলিল—'লক্ষণ তো ভালই ঠেকছে। ওঁরা যদি সাহায্য করেন কার্যোদ্ধার করা শক্ত হবে না। তবে যদি দেবী যৌবনশ্রী তোকে অপছন্দ করেন—'

বিগ্রহপাল অন্ধকারে হাসিলেন। ও আশঙ্কা তাঁহার ছিল না।

আট

অতঃপর সপ্তাহকাল একটি দীর্ঘ সোনালি সুখস্বপ্নের মত কাটিয়া যায়। আকাশে চন্দ্র দিনে দিনে পূর্ণ হইয়া ওঠে, শোণ নদ অলক্ষিতে শীর্ণ হইতে থাকে। দুইটি নৌকা যেন অদৃশ্য বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইয়া একসঙ্গে চলিয়াছে। যখন অনুকূল বাতাস থাকে না তখন দাঁড় চলে, কিম্বা নাবিকেরা তীরে নামিয়া গুণ টানে। তীরে দূরান্তরিত গ্রাম, গ্রামের আশেপাশে মাষকলায় ও চণকের ক্ষেত। নৌকার যাত্রীরা কখনও তীরে নামিয়া ক্ষেত হইতে কাঁচা মাষকলায় ও চণকের শিম্বী আহরণ করিয়া ভক্ষণ করেন, কখনও গ্রামে গিয়া দুগ্ধ ও নবনীত সংগ্রহ করেন, শাক ফল মূল সংগ্রহ করেন।

নৌকা চলিতে থাকে। মগধের সীমানা শেষ হইয়া যায়, পাষাণদুর্গ রোহিতাশ্বগড় পিছনে পড়িয়া থাকে, তীরভূমি উপল-বন্ধুর হইয়া ওঠে। জাতবর্মা নিজ নৌকায় রাজকীয় লাঞ্ছন উড়াইয়া দেন। বিগ্রহপালের নৌকা কেতনহীন থাকে।

বিগ্রহ প্রত্যহ অন্য নৌকায় যান। কত খেলা হয় ; পাশা খেলা, গুটি খেলা, দশ-পঁচিশ খেলা। কত জল্পনা হয়। বিগ্রহ বীরশ্রীর সহিত খুনসুড়ি করেন।—বলেন—দেবি, নিশ্চয় আপনি শ্বশুরবাড়ির দেশ থেকে কৈ-ডিম্ব নিয়ে যাচ্ছেন, নইলে আপনার রান্না এমন মিষ্ট হয় কি করে ? বীরশ্রী কপট ক্রোধে শাসন করেন—দাঁড়াও না, বাপের বাড়ি গিয়ে তোমাদের সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেব। যৌবনশ্রীর কানে এমন মন্ত্র দেব সে তোমার পানে ফিরেও চাইবে না।

পরামর্শ সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। বীরশ্রী গিয়া যৌবনশ্রীকে রাজী করাইবেন, তারপর স্বয়ংবরের পূর্বেই একদিন বিগ্রহপাল তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিবেন, একেবারে নৌকায় তুলিয়া পাটলিপুত্র লইয়া যাইবেন। ঘরের ইঁদুর যদি বেড়া কাটে, কে কি করিতে পারে ? লক্ষ্মীকর্ণ যখন জানিতে পারিবেন তখন আর উপায় থাকিবে না। তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করা সহজ হইবে।

ষড়যন্ত্রকারীদের মনে আনন্দ আর উত্তেজনা। আহার বিহার ক্রীড়া কৌতুকে দিন কাটিয়া যায়। অনঙ্গ মাছ ধরে, গান গায়। জাতবর্মা বাঁশি বাজান। দুই দিশারুর মধ্যে ভাব হইয়াছে। জাতবর্মার দিশারুর নাম জটায়ু নয়, শুভঙ্কর। রাত্রে নৌকা বাঁধা হইলে তাহারা বালুতে নামিয়া পাশাপাশি বসে, মৃদুস্বরে জল্পনা করে—তুমি কয়বার সমুদ্রে গিয়াছ ? আমি কান্যকুব্জে গিয়াছি। সুবর্ণভূমি দেখিয়াছ ? আমি সিংহল গিয়াছি।—সিংহলের মেয়েরা বড় কুৎসিত—কিন্তু—

অবশেষে অষ্টম দিনের পূর্বাহ্ণে দূরে শোণ নদের শেষ ঘাট দেখা গেল। শোণ নদ এইখানে

পাহাড় হইতে নামিয়া অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার আগে আর নৌকা চলে না। ঘাটটি নদীর পশ্চিম তীরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

জাতবর্মা নৌকাযোগে আসিতেছেন এ সংবাদ পূর্বেই ত্রিপুরীতে পৌঁছিয়াছিল। রোহিতাশ্বগড়ে লক্ষ্মীকর্ণদেবের একজন গূঢ়পুরুষ ছিল ; সে নৌকা যাইতে দেখিয়াছিল, নৌকার শীর্ষে কেতন চিনিয়াছিল। বেগবান অশ্বে চড়িয়া সে লক্ষ্মীকর্ণকে জানাইয়াছিল। কথাটা এমন কিছু গোপনীয় নয়। তাই রাজপুরী হইতে ক্রমশ নগরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। স্বয়ংবর উপলক্ষে প্রথম আসিলেন রাজ-জামাতা ; তিনিও কি স্বয়ংবর সভায় বসিবেন না কি ? নাগরিকদের মধ্যে নানাবিধ জল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য স্বয়ংবরের কথাটা এখন আর গোপন নাই ; রাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ পুরোভূমিতে মণ্ডপ নির্মাণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

জাতবর্মার নৌকা বেলা দ্বিপ্রহরে যখন ঘাটে আসিয়া লাগিল তখন লক্ষ্মীকর্ণ ও যৌবনশ্রী ঘাটে উপস্থিত আছেন। লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা-জামাতাকে আগ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে অনেক অশ্বারোহী রক্ষী। যৌবনশ্রী দিদিকে দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, তিনিও পিতার সঙ্গে রথে আসিয়াছেন।

আর একজন লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার নাম লম্বোদর। কথিত আছে, গুপ্তচর রাজাদের কর্ণ। লম্বোদর ছিল মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কর্ণ, সকল সময় তাঁহার কাছে থাকিত।

জাতবর্মা ও বীরশ্রী নৌকা হইতে অবতরণ করিলে লক্ষ্মীকর্ণ কন্যার মস্তক আঘ্রাণ, জামাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। যৌবনশ্রী ঈষৎ লজ্জিতভাবে একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বীরশ্রী ছুটিয়া তাঁহার কাছে গেলেন—'ওমা ! যৌবনা, তুই এতবড় হয়েছিস !' দুই ভগিনী পরস্পর কণ্ঠলগ্ন হইলেন। তিন বৎসর পরে সাক্ষাৎ ; বিবাহের পর বীরশ্রী যখন পতিগৃহে যান তখন যৌবনশ্রীর বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর।

ওদিকে শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে কথা হইতেছিল। কুশল প্রশ্নের পর নৌকা সম্বন্ধে লক্ষ্মীকর্ণের অনুসন্ধিৎসার উত্তরে জাতবর্মা বলিতেছিলেন—'...দ্বিতীয় নৌকাটি আমার নয়, পাটলিপুত্র থেকে ওরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।'

পাটলিপুত্রের নামে লক্ষ্মীকর্ণ কান খাড়া করিলেন—'পাটলিপুত্র থেকে ! ওরা কারা জানো ?'

জাতবর্মা তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন—'বণিক। স্বয়ংবর উপলক্ষে ত্রিপুরীতে বাণিজ্য করতে এসেছে।'

লক্ষ্মীকর্ণের সন্দেহ দূর হইল না। বিগ্রহপালের নৌকা ঘাটের অন্য প্রান্তে বাঁধা হইয়াছিল, তিনি ভ্রূকুটি করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সময় রইঘর হইতে অনঙ্গ বাহির হইয়া আসিল এবং উৎসুক নেত্রে ঘাটের জন-সমাবেশ দেখিতে লাগিল। তাহার পরিধানে মহার্ঘ বেশ, মাথায় পাগ, পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা। বিগ্রহপাল কিন্তু বাহিরে আসিলেন না। লক্ষ্মীকর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলে সর্বনাশ।

লক্ষ্মীকর্ণ কিয়ৎকাল বিরাগপূর্ণ নেত্রে অনঙ্গকে নিরীক্ষণ করিয়া ঘাটের এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইলেন। লম্বোদর অদূরে একটি নিম্ববৃক্ষ তলে দাঁড়াইয়া অচঞ্চল চক্ষে লক্ষ্মীকর্ণের পানে চাহিয়া ছিল ; তাহার সহিত চোখাচোখি হইতেই লক্ষ্মীকর্ণ শিরঃসঞ্চালন করিয়া অনঙ্গকে

দেখাইলেন। লম্বোদর একবার অনঙ্গের পানে চক্ষু ফিরাইয়া সপ্রশ্ন ভ্রূ তুলিল, তারপর ঘাড় নাড়িল।

অতঃপর লক্ষ্মীকর্ণ জামাতা ও কন্যাদের লইয়া ঘাটের বাহিরে গেলেন। ঘাট-সংলগ্ন ভূমিতে ক্ষুদ্র একটি জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি চালা ঘর, একটি বিপণি, দুই চারিটি গো-শকট ; এই পথে যে-সকল যাত্রী যাতায়াত করে তাহাদের পথের প্রয়োজন মিটাইয়া ইহারা জীবন নির্বাহ করে। আজ সহসা রাজ-সমাগমে স্থানটি অনভ্যস্ত জনবাহুল্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অশ্বারোহী রক্ষীর দল অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া এইখানে অপেক্ষা করিতেছিল ; দুইটি রথও ছিল। লক্ষ্মীকর্ণ জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রথে যাবে ? না ঘোড়ার পিঠে ?'

'ঘোড়ার পিঠে' বলিয়া জাতবর্মা এক লাফে একটি অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। দীর্ঘকাল নৌকায় বাস করিয়া তাঁহার হস্তপদে কিছু জড়ত্ব আসিয়াছিল, অশ্ব চালাইলে তাহা দূর হইবে। —'আপনারা রথে যান।'

লক্ষ্মীকর্ণ একবার চোখ পাকাইলেন। জামাতা বাবাজী বয়সে নবীন হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কি মনে করেন লক্ষ্মীকর্ণ একেবারেই অথর্ব হইয়া পড়িয়াছেন ? তিনি আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—'আমিও ঘোড়ার পিঠে যাব।'

কন্যাদের রথে আসিবার আদেশ দিয়া তিনি ঘোড়া চালাইলেন। অধিকাংশ রক্ষীর দল তাঁহার সঙ্গে চলিল, বাকি রথের অনুগমন করিবে বলিয়া রহিয়া গেল। যে দুইজন অশ্বারোহীর অশ্ব জাতবর্মা ও লক্ষ্মীকর্ণ লইয়াছিলেন তাহারা অন্য রথে ফিরিবে।

ঘাটের অঙ্গন প্রায় শূন্য হইয়া গেলে বীরশ্রী এবং যৌবনশ্রী হাত ধরাধরি করিয়া রথের দিকে চলিলেন। রাজরথের বৃদ্ধ সারথি বীরশ্রীকে প্রণাম করিল। বীরশ্রী আবদার করিয়া বলিলেন—'সম্পৎ, আমি রথ চালাব।'

বৃদ্ধ সম্পৎ চক্ষু মুদিয়া দন্তহীন হাসিল—'সে আমি জানি। তাই মন্দুরা থেকে সবচেয়ে সুবোধ ঘোড়া দুটোকে জুতে এনেছি। কিন্তু তুমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে রথ চালাতে ভুলে যাওনি তো ? বংগাল দেশে শুনেছি ঘোড়া নেই, কেবল হাতি।'

বীরশ্রী ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'আমার শ্বশুরবাড়ির নিন্দা করলে ভাল হবে না সম্পৎ। রথ চালাতে আমি মোটেই ভুলিনি। তোমার চেয়ে ভাল চালাব, দেখে নিও।'

সম্পৎ আবার চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া হাসিল—'আচ্ছা আচ্ছা। তোমরা দুই বোন আমার রথে চড়। আমি পিছনের রথে থাকব।'

দুই ভগিনী রথে চড়িতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় একটি শব্দ তাঁহাদের কানে আসিল—'বম্ শঙ্কর—বম্ বম্।'

দুইজনে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। অদূরে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ তলে প্রস্তরের চক্রবেদী, তাহার উপর বসিয়া আছেন এক সন্ন্যাসী। মাথায় সর্পিল জটা, মুখে গাঢ় ভস্ম প্রলেপ, কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম। মেরুযষ্টি কঠিন করিয়া তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন এবং গালবাদ্য করিতেছেন—বম্ বম্ ববম্ বম্!

বীরশ্রী বলিলেন—'ওমা, সন্ন্যাসী!—আয় ভাই, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করি।'

দুই বোন অশ্বত্থবৃক্ষের দিকে চলিলেন।

ওদিকে অনঙ্গ নৌকায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। লক্ষ্মীকর্ণ ও জাতবর্মা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া যাইবার পর সে বিগ্রহপালকে ডাকিল। বিগ্রহ রইঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে সাধারণ বেশভূষা, রাজপুত্র বলিয়া মনে হয় না। ধরা পড়িবার আশঙ্কা আর নাই

দেখিয়া তিনি নৌকা হইতে ঘাটে নামিলেন। নির্লিপ্ত লম্বোদর যে নিম্বতলে দাঁড়াইয়া আছে তাহা কাহারও চোখে পড়িল না।

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী ভক্তিভরে বেদীর উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন—'চিরায়ুষ্মতী হও। ভর্তার বহুমতা হও। স্বর্ণপ্রসূ হও।' তাঁহার মুখে ভস্মাচ্ছাদিত প্রসন্নতা ক্রীড়া করিতে লাগিল।

বীরশ্রী বলিলেন—'ঠাকুর, আপনি সিদ্ধপুরুষ। আমার এই বোনটির শীঘ্রই বিয়ে হবে। ওর করকোষ্ঠী একবার দেখুন না।'

যৌবনশ্রীর মুখখানি অরুণাভ হইয়া উঠিল। মনে যথেষ্ট কৌতূহল, কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করিতে লজ্জা করিতেছে। বীরশ্রী তখন জোর করিয়া তাঁহার বাঁ হাতখানি সাধুর সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিলেন।

সাধু যৌবনশ্রীর প্রসারিত করতলের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিলেন, তারপর সম্মুখে ঝুঁকিয়া অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেন। তাঁহার মুখে আবার ছাই-ঢাকা হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি যৌবনশ্রীর মুখের পানে মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন—'রাজনন্দিনি, তোমার প্রিয়-সমাগমের আর বিলম্ব নেই। অদ্যই তুমি ভাবী পতির সাক্ষাৎ পাবে।'

যৌবনশ্রী অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চোখ তুলিলেন। বীরশ্রী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—'অ্যাঁ—কি বললেন প্রভু— ?'

এই সময় বাধা পড়িল। সহসা পিছন হইতে একটি হাত আসিয়া যৌবনশ্রীর প্রসারিত করতলের উপর ন্যস্ত হইল, একটি মন্দ্র-মন্থর পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল—'সাধুবাবা, আমার হাতটা একবার দেখুন তো !'

চমকিয়া যৌবনশ্রী ঘাড় ফিরাইলেন। রাজকন্যার হাতের উপর হাত রাখে কোন্ ধৃষ্ট !

যে মুখখানি যৌবনশ্রী দেখিতে পাইলেন তাহাতে একটু দুষ্টামিভরা হাসি লাগিয়া আছে, আরও কত কি আছে। চোখে চোখে দৃষ্টি বিনিময় হইল। যৌবনশ্রীর দেহ একবার বিদ্যুৎপৃষ্টের মত কাঁপিয়া উঠিল, সবেগে নিশ্বাস টানিয়া তিনি একেবারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া গেলেন ; তাঁহার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি নিজের প্রসারিত হাতখানি আগন্তুকের করতল হইতে সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী বিগ্রহপালের করকোষ্ঠী দেখিতেছিলেন, বলিলেন—'বৎস, তুমি রাজকুলোদ্ভব—'

'চুপ চুপ !'—বিগ্রহপাল সচকিতে চারিদিকে চাহিলেন। ভাগ্যক্রমে কাছে পিঠে কেহ নাই।

বীরশ্রী বিগ্রহপালের এই হঠকারিতায় চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভয় হইল, আর বেশিক্ষণ এখানে থাকিলে বিগ্রহ না জানি আরও কি প্রগল্‌ভতা করিয়া বসিবে। তিনি যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইলেন। বলিলেন—'চল, যৌবনা, আমরা যাই।'

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত যৌবনশ্রী সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। বীরশ্রী রথে উঠিয়া অশ্বের বল্‌গা হাতে লইলেন। যৌবনশ্রী রথে উঠিবার আগে আপনার অবশে একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। প্রগল্‌ভ যুবক দুষ্টামিভরা মুখে তাঁহার পানেই চাহিয়া আছে। তিনি বিহ্বলভাবে রথে উঠিয়া পড়িলেন।

রথ চলিতে আরম্ভ করিল।

বীরশ্রী বলিলেন—'আশ্চর্য সন্ন্যাসী ! বোধহয় তান্ত্রিক।'

যৌবনশ্রী উত্তর দিলেন না।

রথের গতি ক্রমশ দ্রুত হইল। আরও কিছুক্ষণ চলিবার পর যৌবনশ্রী প্রথম কথা বলিলেন। সম্মুখ দিকে চক্ষু রাখিয়া ঈষৎ স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'দিদি, ও কে ?'

বীরশ্রী ভগিনীর প্রতি একটি তির্যক দৃষ্টি হানিলেন ; তাঁহার অধরপ্রান্ত একটু স্ফুরিত হইল। যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই এমনিভাবে বলিলেন—'কার কথা বলছিস ? সন্ন্যাসী ঠাকুরের ?'

যৌবনশ্রী একবার দিদির পানে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—'বল না।'

'কি বলব ?' বীরশ্রী মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিলেন—'ও ! যে তোর হাতে হাত রেখেছিল তার কথা বলছিস ? তা—সে কে আমি কি জানি।'

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যৌবনশ্রী বলিলেন—'বল না।'

বীরশ্রী হাসিয়া ফেলিলেন—'বণিক। পাটলিপুত্র থেকে ব্যবসা করতে এসেছে।'

এবার যৌবনশ্রী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বীরশ্রী রথ চালাইতে চালাইতে একবার ঘাড় ফিরাইলেন, যৌবনশ্রীর চক্ষু দুটি বাষ্পাকুল, অধর কাঁপিতেছে। বীরশ্রী অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন—'আচ্ছা আচ্ছা, বণিক নয়—রাজপুত্র। এবার হল তো ? ধন্যি মেয়ে তুই ! কোথায় ভেবেছিলাম তোকে অনেক বোঝাতে পড়াতে হবে, অনেক কষ্টে রাজী করাতে হবে। তা নয়, একবার দেখেই মূর্ছা !'

যৌবনশ্রী চক্ষু দুটি কিছুক্ষণ মুদিয়া রহিলেন ; চোখের বাষ্প গলিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

একবার দেখিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলা সকলের জীবনে ঘটে না। মানুষের সহিত মানুষের প্রীতি বড়ই বিচিত্র বস্তু। কখনও দেখা যায়, দীর্ঘ পরিচয়ের পর হঠাৎ একদিন মানুষ বুঝিতে পারিল—ওই মানুষটি না থাকিলে জীবন অন্ধকার। কখনও মনের মানুষ চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবার পর বুঝিতে পারে সে কী হারাইয়াছে। আবার কখনও মেঘমালার ভিতর হইতে তড়িল্লতার মত অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষ হৃদয়ে শেল হানিয়া দিয়া চলিয়া যায়, অন্তর্লোকে অলৌকিক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়।

যাহারা যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ের কথা চিন্তা করে, প্রেম লইয়া মনে মনে জল্পনা করে, তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রেমের আবির্ভাব তেমন মারাত্মক নয়। কিন্তু যাহাদের মনের কৌমার্য ভঙ্গ হয় নাই তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রেম বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই দারুণ ; দুঃসহ জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়।

রাজকুমারী যৌবনশ্রীর তাহাই হইয়াছিল।

দুই

রাজকুমারীরা রথে চড়িয়া চলিয়া গেলেন ; অন্য রথটি এবং বাকি রক্ষীর দল তাঁহাদের পিছনে গেল। ঘাটের অঙ্গন শূন্য হইল। কেবল লম্বোদর অঙ্গনের অন্য প্রান্তে একটি ঘোড়ার রাশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া অনঙ্গ ও বিগ্রহপালের উপর নজর রাখিল।

অনঙ্গ এতক্ষণ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসে নাই, একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছিল ; এখন বিগ্রহপালের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বিগ্রহপাল তখনও বিলীয়মান রথের পানে চাহিয়া আছেন। অনঙ্গ বলিল—'কি হল তোর ? ধন্দ লেগে গেল নাকি ?'

চমক ভাঙিয়া বিগ্রহপাল হাসিলেন। বন্ধুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—'দেখলি ?'

অনঙ্গ বলিল—'দেখলাম।'

'অপরূপ সুন্দরী—না ?'

'হুঁ। কিন্তু এখন ত্রিপুরী যাবার উপায় কি ?'

এই সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর গলা খাঁকারি দিলেন। বিগ্রহপাল সন্ন্যাসীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এখন তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া অনঙ্গকে বলিলেন—'জানিস অনঙ্গ, সাধুবাবা একেবারে ত্রিকালদর্শী পুরুষ। আমার হাত দেখে বলে দিলেন, আমি রাজকুলোদ্ভব !'

অনঙ্গ সাধুবাবাকে ভাল করিয়া পরিদর্শন করিল, তারপর নিজের হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'বলুন তো সাধুবাবা, আমি কে ?'

সাধুবাবা অনঙ্গের হাতের দিকে দৃকপাত করিলেন না, বলিলেন—'তুমি অনঙ্গপাল।'

অনঙ্গ চমকিত হইল, আর একবার সাধুবাবাকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিল ; তাহার মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল—'ও—আপনি জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেব।'

বিগ্রহপাল সবিস্ময়ে বলিলেন—'অ্যাঁ ! আর্য যোগদেবের ভ্রাতা রন্তিদেব— ?'

সাধুবাবা ব্যগ্রস্বরে বলিলেন—'চুপ চুপ, কেউ শুনতে পাবে। —তোমাদের জন্যে কাল থেকে এখানে অপেক্ষা করছি। চারিদিকে লক্ষ্মীকর্ণের গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই ছদ্মবেশে এসেছি। কে জানতো যে লক্ষ্মীকর্ণ স্বয়ং এসে উপস্থিত হবে। —যা হোক, আমি সঙ্গে দুটো ঘোড়া এনেছি, আর একটা গো-শকট। তোমরা ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও, আমি পরে গো-শকটে যাব। তোমাদের সঙ্গে যে তৈজসপত্র আছে তাও গো-শকটে যাবে।'

বিগ্রহপাল বলিলেন—'ধন্য। কিন্তু নগরে গিয়ে আপনার গৃহ খুঁজে পাব কোথায় ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'নগরে গিয়ে কাক কোকিলকে জিজ্ঞাসা করলে রন্তিদেব দৈবজ্ঞের গৃহ দেখিয়ে দেবে। তবে, আমার ভৃত্য তোমাদের চেনে না। এই রুদ্রাক্ষ নাও, ভৃত্যকে দেখালে সে তোমাদের গৃহে স্থান দেবে, আদর যত্ন করবে। আমার ফিরতে সন্ধ্যা হবে।'

রুদ্রাক্ষ লইয়া বিগ্রহপাল বলিলেন—'আপনি সকল ব্যবস্থাই করেছেন দেখছি। অনঙ্গ, তুমি নৌকায় যাও, গরুড়কে বলে দাও আমাদের তৈজসপত্র যেন সাধুবাবার গো-শকটে তুলে দেয়।'

'যাই'—অনঙ্গ রন্তিদেবের দিকে ফিরিয়া বলিল—'গ্রহাচার্য মহাশয়, একটি প্রশ্ন আছে। আমরা দু'জন যে বিগ্রহপাল ও অনঙ্গপাল তা অবশ্য আর্য যোগদেবের পত্রে জানতে পেরেছেন। কিন্তু আমি যে অনঙ্গপাল আর ও যে বিগ্রহপাল তা চিনলেন কি করে ? আগে কি আমাদের দেখেছেন ?'

'না, পঞ্চদশ বৎসর আমি ত্রিপুরীতে আছি।'

'তবে ?'

রন্তিদেব হাসিলেন—'ও যদি অনঙ্গপাল হত তাহলে যৌবনশ্রীর হাতের ওপর হাত রাখত না। শুধু সাজসজ্জা দিয়ে সকলের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না।'

উত্তর শুনিয়া অনঙ্গ পরিতুষ্ট হইল এবং হাসিতে হাসিতে নৌকার দিকে চলিয়া গেল। একজন তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিকে সঙ্কটময় কার্যে সহকারীরূপে পাওয়া কম কথা নয়। লক্ষণ সবই ভাল মনে হইতেছে।

নৌকায় গিয়া অনঙ্গ গরুড়কে তৈজসপত্র সম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ দিল, তারপর বলিল—'আমরা ত্রিপুরী চললাম, কবে ফিরব কিছু স্থির নেই। তোমরা সর্বদা নৌকায় থাকবে, সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। হয়তো এক নিমেষের মধ্যে নৌকা নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে। মনে রেখো।'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা।'

দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। রন্তিদেবের ঘোড়া দুটি চালা ঘরে বাঁধা ছিল, দুই বন্ধু তাহাদের বাহিরে আনিয়া রন্তিদেবের নিকট বিদায় লইলেন, ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ত্রিপুরী অভিমুখে যাত্রা

করিলেন।

লম্বোদর এতক্ষণ দূর হইতে সমস্ত দেখিতেছিল, কিন্তু কথাবার্তা কিছু শুনিতে পায় নাই। অনঙ্গ এবং বিগ্রহপাল যখন বাহির হইয়া পড়িলেন তখন সেও ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

ঘাট হইতে যে পথটি নগরের দিকে গিয়াছে তাহা ঈষৎ আঁকাবাঁকাভাবে মেখল পর্বতকে বেষ্টন করিয়া গিয়াছে। মেখল পর্বত বিন্ধ্য গিরিশ্রেণীর নিতম্বদেশ। এই পর্বত হইতে দুইটি নদ-নদী শোণ ও নর্মদা উৎপন্ন হইয়া পূর্ব ও পশ্চিমে মেখলার মতই ভারতবর্ষের কটিদেশ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।

পথটি মেখল পর্বতকে যথাসম্ভব পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তবু সর্বত্র সমতল হইতে পারে নাই, ক্রমাগত উচ্চ হইতে হইতে আবার নিম্নাভিমুখে গড়াইয়া পড়িয়াছে। এই তরঙ্গায়িত নিরন্তপাদপ পথে দুই অশ্বারোহী ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছেন। মধ্যাহ্নে সূর্যের তাপ কিছু প্রখর বটে কিন্তু গতিবেগের জন্য তাহা অনুভব হয় না।

পাশাপাশি অশ্ব চালাইতে চালাইতে দুইজনের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ হইতেছিল। বিগ্রহপাল বলিলেন—'এ পর্যন্ত যাত্রা বেশ ভালই হয়েছে বলতে হবে। যাত্রার সময় খঞ্জন দেখেছিলাম সে কি মিথ্যে হয়? তুই বললি—কাদাখোঁচা। কাদাখোঁচা হলে কি যাত্রা এত ভাল হত?'

অনঙ্গ বলিল—'যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু ও-কথা যাক। এখানকার খঞ্জনটিকে কেমন মনে হল খুলে বল।'

বিগ্রহপালের চক্ষু রসাবিষ্ট হইয়া উঠিল, তিনি গাঢ়স্বরে বলিলেন—'ভাই, ও খঞ্জন নয়—রাজহংসী। মানস সরোবরের রাজহংস। তুইও তো দেখেছিস। বল, সত্যি কিনা!'

অনঙ্গ ঢোক গিলিয়া বলিল—'হাঁ, তা—সত্যি বৈকি। তোর চোখে যখন ভাল লেগেছে—'

বিগ্রহপাল মহা বিস্ময়ে বলিলেন—'এ কি বলছিস! তোর চোখে ভাল লাগেনি?'

অনঙ্গ বলিল—'না না, ভাল লেগেছে, খুবই সুন্দরী। তবে—'

'তবে কি?'

'ভাই একটু বেশি তন্বী। অত তন্বী হওয়া ভাল নয়। আমার বৌটা ছিল ভীষণ তন্বী, তাই টিকল না। গায়ে একটু মেদমাংস থাকলে হয়তো টিকত।' বলিয়া অনঙ্গ গভীর নিশ্বাস মোচন করিল।

বিগ্রহপাল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—'তুই শিল্পী কিনা, তাই জগদ্দল পাথরের যক্ষিণীমূর্তি না হলে তোর মন ওঠে না। দাঁড়া, এবার, পাটলিপুত্রে ফিরে গিয়ে তোর জন্যে একটি হস্তিনী খুঁজে বার করব।'

অনঙ্গপাল বলিল—'রোগা বৌয়ের অবশ্য একটা সুবিধা আছে, দরকার হলে কাঁধে তুলে নিয়ে পালাতে পারবি।'

রঙ্গ পরিহাসে দুই ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইল। বিগ্রহ বলিলেন—'এ পথে বেশি লোক চলাচল নেই। এতদূর এলাম, একজন পথিকও চোখে পড়ল না।'

অনঙ্গ বলিল—'পথিক যারা ছিল তারা সব এগিয়ে গেছে, পিছনে কেউ নেই।' অলসভাবে পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল—'আছে আছে। একটা লোক পিছনে আসছে।'

বিগ্রহপাল পিছন ফিরিয়া দেখিলেন। প্রায় পাঁচ-ছয় রজ্জু দূরে পথ যেখানে কুব্জ পৃষ্ঠের ন্যায় উঁচু হইয়াছে সেইখানে একজন অশ্বারোহী আসিতেছে। এতদূর হইতে মানুষটার চেহারা ভাল দেখা গেল না, পোশাক পরিচ্ছদেরও আড়ম্বর নাই। বিগ্রহ বলিলেন—'লোকটা আসুক, ওর কাছ থেকে জানা যাবে ত্রিপুরী আর কত দূর।'

লোকটা কিন্তু আসিল না। ইঁহারা ঘোড়া থামাইয়াছেন দেখিয়া সেও ঘোড়া থামাইয়া অবতরণ করিল এবং ঘোড়ার পা তুলিয়া ক্ষুর পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দুইজনে আবার মন্থরগতিতে অশ্ব চালাইলেন। পিছনের পথিকও ঘোড়ায় চড়িয়া মন্থরগতিতে আসিতে লাগিল। তাহাদের মাঝখানের ব্যবধান কমিল না। দুই বন্ধু জোরে ঘোড়া চালাইলেন ; কিছুক্ষণ পরে পিছু ফিরিয়া দেখিলেন পিছনের অশ্বারোহী যত দূরে ছিল তত দূরেই আছে, ব্যবধান বাড়ে নাই।

অনঙ্গ মাথা নাড়িয়া বলিল—'গতিক সুবিধার নয়। বোধহয় মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ আমাদের পিছনে একটি গুপ্তচর জুড়ে দিয়েছেন।'

'আচ্ছা দেখা যাক—' বলিয়া বিগ্রহপাল আবার ঘোড়া থামাইলেন, ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া হাত তুলিয়া লোকটিকে আহ্বান করিলেন। লোকটি যেন দেখিতেই পায় নাই, এমনিভাবে ঘোড়া হইতে নামিয়া আবার ঘোড়ার ক্ষুর পরীক্ষা করিতে লাগিল। তখন আর সন্দেহ রহিল না।

দুইজনে আবার সম্মুখ দিকে অশ্ব চালাইলেন। অনঙ্গ বলিল—'গুপ্তচরই বটে। আমরা কোথায় যাই দেখতে চায়।'

বিগ্রহ বলিলেন—'হুঁ। কিন্তু গুপ্তচর লাগিয়েছে কেন ? আমি কে তা কি জানতে পেরেছে ?'

অনঙ্গ বলিল—'সম্ভব নয়। নূতন লোক দেখলেই বোধহয় পিছনে গুপ্তচর লাগে।' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—'গুপ্তচরটা আমার পিছু নিয়েছে, তোর নয়। কারণ লক্ষ্মীকর্ণ যতক্ষণ ছিলেন তুই ততক্ষণ বাইরে আসিসনি।—এক কাজ করা যাক। নগরে পৌঁছে আমরা দু'জনে দুই পথে যাব। গুপ্তচরটা তখন কী করবে ? নিশ্চয় আমার পিছনে আসবে। তুই তখন নির্বিঘ্নে রন্তিদেবের বাড়িতে গিয়ে উঠিস।'

'তারপর ?'

'তারপর আমরা নগরের মধ্যে হারিয়ে যাব। যদি দেখি গুপ্তচরকে এড়াতে পারলাম না, তখন নগরে কোথাও বাসা নেব। আর যদি ফাঁকি দিতে পারি রন্তিদেবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হব। যদি আজ রাত্রির মধ্যে না যেতে পারি তুই ভাবিসনি।'

দুইজনে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন। ক্রমে ত্রিপুরী নগরী নিকটবর্তী হইতে লাগিল। পথের ধারে দুটি-একটি গৃহ, দুটি-একটি মন্দির, ক্রমশ ঘন সন্নিবিষ্ট লোকালয়।

পথটি নগরে প্রবেশ করিতে গিয়া ত্রিধা হইয়াছে ; একটি পথ নগরের বুক চিরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, অন্য দুইটি দক্ষিণে ও বামে বাহু বিস্তার করিয়া নগরকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। অনঙ্গ ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল গুপ্তচর পিছনে আছে ; দুই বন্ধু দুই পথ ধরিলেন।

অনঙ্গ যে পথ ধরিয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত বিরলগৃহ ; এক পাশে অধিকাংশই মাঠ, অন্য পাশে দুই চারিটা গৃহ আছে। গৃহগুলি মধ্যমশ্রেণীর ; পথে মানুষের যাতায়াত কম। দিবা তৃতীয় প্রহরে স্থানটি নিরাবিল এবং নিদ্রালু।

গুপ্তচর তাহারই পিছনে আসিতেছে দেখিয়া অনঙ্গ প্রীত হইল। সে জোরে ঘোড়া চালাইল। এইবার গুপ্তচর মহাশয়কে ধরিতে হইবে।

কিছুদূর ঘোড়া ছুটাইবার পর অনঙ্গ দেখিল, সম্মুখে একটি শাখা-পথ বাহির হইয়া নগরের অভ্যন্তরের দিকে গিয়াছে। সন্ধিস্থলের কোণে ঘন বাঁশ-ঝাড়ের যবনিকা। অনঙ্গ ঘোড়ার মুখ সেই দিকে ফিরাইয়া শাখা-পথে প্রবেশ করিল, তারপর ঘোড়ার বেগ সংযত করিয়া চুপি চুপি বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে গিয়া লুকাইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। গুপ্তচরও এই দিকে

ঘোড়া ফিরাইয়াছে, অনঙ্গকে সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া তাহার মুখ উদ্বিগ্ন—

বক্র হাসিয়া অনঙ্গ বাঁশ-ঝাড়ের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল, ঘোড়া ছুটাইয়া গুপ্তচরের পার্শ্ববর্তী হইল। গুপ্তচর তাহাকে পাশে দেখিয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, তারপর তাহার মুখে বোকাটে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দুইটি ঘোড়া পাশাপাশি চলিয়াছে। অনঙ্গ এতক্ষণে গুপ্তচরের মূর্তি ভাল করিয়া দেখিল। মাঝারি মাংসল দেহ, তামাটে বর্ণ, বয়স অনুমান চল্লিশ ; মুখখানি গোলাকার, চক্ষু দুটি গোলাকার, ভ্রূ অর্ধ-গোলাকার ; নাকটি বোধহয় ভালুকে খাইয়া গিয়াছে। মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নাই। অনঙ্গের মনে একটু ধোঁকা লাগিল। সত্যই গুপ্তচর বটে তো ?

ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে আলাপ হইল। অনঙ্গ বলিল—'বাপু, তুমি কি এই নগরীর নাগরিক ?'

দন্তবিকাশ করিয়া গুপ্তচর বলিল—'আজ্ঞা— ?'

অনঙ্গ বলিল—'তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি। তুমি কি শোণের ঘাটে ছিলে ?

গুপ্তচর বলিল—'আজ্ঞা। কাজে গিয়েছিলাম। —আপনি ?'

অনঙ্গ বলিল—'আমি বণিক, পাটলিপুত্রে বাড়ি। ত্রিপুরীতে প্রথম এসেছি।'

গুপ্তচর বলিল—'বণিক—অহহ। স্বয়ংবরে অনেক রাজ-রাজড়া আসবে তাই অসংখ্য বণিকও এসেছে। তা—আপনার পণ্যবস্তু কৈ ?'

'পণ্যবস্তু নৌকায় রেখে এসেছি। আগে একটা বাসস্থান ঠিক করে পণ্যবস্তু নিয়ে আসব। তুমি ত্রিপুরীর নাগরিক ?'

'আজ্ঞা। আমি রাজকর্মচারী।'

'বটে ! কি কাজ কর ?'

'করণ।'

'নাম কি ?'

'লম্বোদর।'

'ভাল, লম্বোদর, তুমি আমাকে একটা বাসস্থানের সন্ধান দিতে পার ? একটা ঘর হলেই চলবে।'

লম্বোদর মাথা চুলকাইয়া চিন্তা করিল।

'একটা ঘর ?'

'হাঁ।'

'আমার ঘরে আসতে পারেন। আমার গৃহটি বেশ বড়। আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী।'

অনঙ্গের মনে একটু দ্বিধা জাগিলেও সে মুখে বলিল—'বেশ বেশ। কত ভাটক লাগবে ?'

'কতদিন থাকবেন ?'

'মনে কর এক মাস।'

'আহারাদি ?'

'মনে কর তোমার গৃহেই।'

লম্বোদর বিবেচনা করিয়া বলিল—'তাহলে এক মাসের জন্য এক রূপক লাগবে।'

'এক রূপক ? বেশ, আমি সম্মত আছি।'

লম্বোদর আকর্ণ হাসিয়া বলিল—'আসুন, আমার গৃহ বেশি দূর নয়। রেবার তীরে।'

লম্বোদর ডান দিকে মোড় ঘুরিল, অনঙ্গ মোড় ঘুরিল। দুইজন নীরবে চলিল। লম্বোদর একসময় ঘাড় বাঁকাইয়া অনঙ্গের অশ্বটিকে দেখিল, নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিল—'সুন্দর ঘোড়া ! কোথায় পেলেন ?'

অনঙ্গ চট্ করিয়া গল্প তৈয়ার করিয়া বলিল—'আমার নৌকায় একটি লোক এসেছে, সে ত্রিপুরীতে অশ্বের ব্যবসা করে। ঘাটে তার জন্যে দুটি ঘোড়া উপস্থিত ছিল, সে একটি ঘোড়া আমাকে ধার দিয়েছে।'

আর কোনও প্রশ্নোত্তর হইল না। অনঙ্গ মনে মনে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল ; লোকটার চেহারা এবং কথাবার্তা হইতে ঘোর নির্বোধ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু নির্বোধ না হইতেও পারে। সাবধান থাকা ভাল। যে গুপ্তচরকে গুপ্তচর বলিয়া চেনা যায় না সেই গুপ্তচর ভয়ানক। আজ রাত্রিটা ওর ঘরেই কাটানো যাক, তারপর কাল দেখা যাইবে। বিগ্রহ নিরাপদে যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে ইহাই যথেষ্ট।

লম্বোদর মনে মনে ভাবিল—লোকটাকে বণিক বলিয়াই মনে হইতেছে। যা হোক, এ মন্দ হইল না। আমার গৃহে থাকিবে, আমি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে পারিব।

অল্পক্ষণ পরে তাহারা লম্বোদরের গৃহে পৌঁছিল। নগরের উপান্তে নর্মদার তীরে লম্বোদরের গৃহ, আশেপাশে জনবসতি নাই। নদীর তীর ধরিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিলে অর্ধ-ক্রোশ দূরে রাজপ্রাসাদ দেখা যায়।

তিন

রাজপুরীতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল।

জামাতাকে লইয়া মহারাজ আসিলেন, তারপর আসিলেন রাজকন্যারা। রাজভবনের দাসী কিঙ্করীরা পুরদ্বারে দাঁড়াইয়া উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা শঙ্খ বাজাইল, হুলুধ্বনি করিল, পূর্ণ ঘট হইতে পথের উপর জল ঢালিয়া দিল। বীরশ্রীর মধুর-সরস চরিত্রের জন্য সবাই তাঁহাকে ভালবাসে ; সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তিন বৎসর পরে দেখা, কিন্তু বীরশ্রী কাহারও নাম ভোলেন নাই। জনে জনে প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, রঙ্গ পরিহাস করিলেন। বান্ধুলির আঁচল ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ লা বান্ধুলি, তুইও তো বেশ ডাগর হয়ে উঠেছিস, তা তোর স্বয়ংবরটাও এই সঙ্গে হয়ে যাক না।'

দ্বিতলে উঠিয়া বীরশ্রী যৌবনশ্রীকে বলিলেন—'চল ভাই, আগে ঠাকুরানীকে প্রণাম করি গিয়ে। কেমন আছেন তিনি ?'

'আছেন।' বলিয়া যৌবনশ্রী দিদিকে ঠাকুরানীর কোষ্ঠের দিকে লইয়া চলিলেন।

ঠাকুরানী—মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের জননী অম্বিকা দেবী। অতিশয় প্রবল-পরাক্রান্তা মহিলা ; লক্ষ্মীকর্ণের পিতা মহারাজ গাঙ্গেয়দেবও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। লক্ষ্মীকর্ণ রাজা হইবার পর কিছুকাল অম্বিকা দেবী তাঁহার জীবনে কণ্টকস্বরূপ হইয়া ছিলেন, স্বাধীনভাবে একটি কাজও করিবার অধিকার লক্ষ্মীকর্ণের ছিল না। প্রজারা অম্বিকা দেবীকে ভক্তি করিত, চণ্ডী হইলেও তিনি প্রজাবৎসলা ছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন লক্ষ্মীকর্ণের কপাল খুলিল, অম্বিকা দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। লক্ষ্মীকর্ণ নিষ্কণ্টক হইলেন বটে, কিন্তু অম্বিকা দেবীর স্বভাব পরিবর্তিত হইল না ; তিনি সময়ে অসময়ে পুত্রকে রোগ-শয্যার পাশে ডাকিয়া পাঠাইয়া তর্জন ও ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীকর্ণ মাতার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। অম্বিকা শুইয়া শুইয়া যথাসম্ভব পুত্রের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অম্বিকা ক্রোধন-স্বভাব হইলেও অতিশয় কূটবুদ্ধি ছিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ দূরে থাকিয়া তাঁহাকে ভয় করিতেন।

দ্বিতলের এক পাশে নিভৃত অংশে অম্বিকা দেবীর বাসস্থান। তাঁহার পরিচর্যার জন্য দুইজন উপস্থায়িকা অহর্নিশি উপস্থিত থাকে। যৌবনশ্রী প্রাতে ও রাতে একবার করিয়া ঠাকুরানীকে দেখিয়া যান। বীরশ্রী যে আজ শ্বশুরালয় হইতে ফিরিবেন এ সংবাদ ঠাকুরানী পাইয়াছিলেন ; তাই শয্যায় শয়ান থাকিয়াও তাঁহার চক্ষু দ্বারের উপর নিবদ্ধ ছিল। দুই নাতিনীর মধ্যে প্রথমাকেই তিনি অধিক ভালবাসিতেন।

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী কক্ষে প্রবেশ করিলে অম্বিকা উপবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বামাঙ্গ পঙ্গু, নিজের চেষ্টায় উপবিষ্ট হওয়া সহজ নয়। তিনি উপস্থায়িকাদের আদেশ করিলেন—'আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দে।'—রোগের প্রকোপে তাঁহার জিহ্বা স্খলিতবাক্ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আদেশ দিবার ভঙ্গিতে তিলমাত্র জড়তা নাই।

উপস্থায়িকারা তাঁহার পৃষ্ঠে উপাধান দিয়া বসাইয়া দিল। তিনি দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া বীরশ্রীকে ডাকিলেন—'আয়।'

বীরশ্রী প্রথমে পিতামহীর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, তারপর বাষ্পাকুল চক্ষে শয্যার পাশে বসিতেই অম্বিকা তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া লইলেন। তাঁহার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

অম্বিকার বয়স এখন প্রায় সত্তর। দেহ স্থূল, শিথিলচর্ম, মুখে রোগজীর্ণ লোলতা, চক্ষু দুটি বড় বড় এবং ধীরসঞ্চারী ; মাথার পলিত কেশ বিরল হইয়া গিয়াছে। তবু সব মিলাইয়া এমন একটি অনমিত দুর্দমতা আছে যে শয্যাগত অবস্থাতেও দর্শকের মনে সম্ভ্রম উৎপাদন করে।

কিছুক্ষণ নাতিনীকে বক্ষলগ্ন করিয়া রাখিয়া অম্বিকা তাঁহাকে তুলিয়া গভীর প্রশ্নসমাকুল চক্ষে তাঁহার মুখ দেখিলেন। তারপর কড়া সুরে বলিলেন—'তোর বাঙালী তোকে এখনও ভালবাসে ?'

বীরশ্রীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

অম্বিকা বলিলেন—'অন্য বিয়ে করেনি ?'

বীরশ্রী দশন রেখা ঈষৎ ব্যক্ত করিয়া মাথা নাড়িলেন—'না দিদি।'

অম্বিকা তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—'ভাল। কিন্তু পুরুষকে বিশ্বাস নেই। সব সময় কড়া নজর রাখবি।'

বীরশ্রী বলিলেন—'রাখব দিদি। তুমি কেমন আছ ?'

অম্বিকা বলিলেন—'আমার আবার থাকা—বেঁচে আছি। তোদের বাপ—' অম্বিকার চক্ষু ধীরে ধীরে যৌবনশ্রীর দিকে ফিরিল—'তোর স্বয়ংবর করছে। কেন স্বয়ংবর করতে চায় জানি না, নিশ্চয় কোনও দুরভিপ্রায় আছে। স্বয়ংবর হলেই রাজায় রাজায় মন কষাকষি, ঝগড়া, যুদ্ধ। তোদের বাপ বোধহয় তাই চায়।—যৌবনা, কাছে আয়।'

যৌবনশ্রী এতক্ষণ পালঙ্কের পদমূলে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এখন পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অম্বিকা আরও কিছুক্ষণ তাঁহাকে স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'তোর কি ইচ্ছা ? স্বয়ংবরা হতে চাস ?'

যৌবনশ্রী উত্তর দিলেন না, আনত আতপ্ত মুখে নীরব রহিলেন। বীরশ্রী মৃদুস্বরে বলিলেন—'তাতে দোষ কি দিদি ? স্বয়ংবর প্রথা আমাদের বংশে আছে। যৌবনার স্বয়ংবর হলে ও নিজের মনের মত বর পছন্দ করে নিতে পারবে। জোর করে বুড়ো রাজার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে সে কি ভাল নয় ?'

অম্বিকা বীরশ্রীর পানে তির্যক চক্ষে চাহিলেন—'তোর কি বুড়ো রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ?'

বীরশ্রী হাসিয়া ফেলিলেন—'আমার কথা ছেড়ে দাও—'

অম্বিকা বলিলেন—'আমি যতদিন আছি সে ভয় নেই। তোর বাপের মনে যত কুবুদ্ধিই

থাকুক, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব পণ্ড করে দিতে পারি।'

বীরশ্রী বলিলেন—'কিন্তু দিদি, যৌবনার স্বয়ংবরে কি তোমার মত নেই ?'

অম্বিকা বলিলেন—'তোরা ছেলেমানুষ। কিছু বুঝিস না। আজকাল স্বয়ংবর আর সে স্বয়ংবর নেই। মেয়ের বাপ আগে থাকতে ঠিক করে রাখে কার গলায় মেয়ে মালা দেবে। সব রাজনৈতিক কূট-কচাল। —যৌবনা, তোর বাপ তোকে কিছু বলেছে ?'

যৌবনশ্রী সঙ্কুচিতভাবে মাথা নাড়িলেন—'না।'

'বলবে। তোর পিসীর যখন স্বয়ংবর হয় তখন ওরা বাপ-বেটায় ওই মতলব করেছিল, বুড়ো রাজেন্দ্র চোলকে স্বয়ংবরে ডেকেছিল। আমি জানতে পেরে সব ভণ্ডুল করে দিলাম।' পুরাতন কথার স্মরণে বৃদ্ধার মুখের দক্ষিণভাগে একটি বাঁকা হাসির খাঁজ পড়িল। বীরশ্রী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। যৌবনশ্রীর মুখেও চাপা কৌতুকের ঝিলিক খেলিয়া গেল।

অম্বিকা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'হাসির কথা নয়। যৌবনা, স্পষ্ট করে বল, স্বয়ংবরা হতে চাস ? যদি কারুর ওপর তোর মন পড়ে থাকে, আর সে যদি রাজা বা রাজপুত্র না হয়—আমার কাছে লুকোসনি।'

যৌবনশ্রীর মুখ সিন্দূরবর্ণ হইয়া উঠিল। বীরশ্রী সচকিতে কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন। উপস্থায়িকা দুইজন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে এবং নিশ্চয় কান খাড়া করিয়া সব কথা শুনিতেছে। বীরশ্রী ঠাকুরানীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিলেন—'দিদি, এখন এ সব কথা থাক, পরে তোমাকে বলব। অনেক কথা বলবার আছে।'

বৃদ্ধা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দুই নাতিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া অল্প ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন—'তোরা এখন যা, খাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে।'

অতঃপর নাতিনীরা প্রস্থান করিলে পক্ষাঘাতপঙ্গু বৃদ্ধা পুত্রের যজ্ঞপণ্ড করিবার চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ তখন জামাতাকে পাশে লইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছিলেন। সোনার পাত্রে ছত্রিশ ব্যঞ্জন সেবন করিতে করিতে দুইজন মাঝে মাঝে কথা হইতেছিল।

জাতবর্মা বলিলেন—'স্বয়ংবরের আয়োজন সব প্রস্তুত ?'

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'এখনও এক মাস সময় আছে। আজ পূর্ণিমা, আগামী পূর্ণিমায় স্বয়ংবর। ততদিনে সব আয়োজন সম্পূর্ণ হবে।'

'কোন্ কোন্ রাজা আসছেন ?'

'দ্বাদশ জন রাজা ও রাজপুত্র আসছেন এ পর্যন্ত সংবাদ পেয়েছি। তন্মধ্যে ভোজরাজ, কলিঙ্গের দুই রাজপুত্র, উৎকলরাজ, মৎস্যরাজ, অন্ধ্ররাজ, কর্ণাটরাজ বিক্রম আছেন।'

জাতবর্মা নিরীহভাবে প্রশ্ন করিলেন—'মগধের বিগ্রহপাল আসছে তো ?'

'মগধের বিগ্রহপাল—' এক গ্রাস অন্ন মুখে পুরিয়া লক্ষ্মীকর্ণ দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

জাতবর্মা ঈষৎ বিস্ময়ে শ্বশুরের পানে চাহিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ তখন অন্ন-পিণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—'হা—হা—রহস্য আছে। পরে জানতে পারবে।'

জাতবর্মা আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না। বুড়া ভারি ধূর্ত, বেশি কৌতূহল প্রকাশ করিলে হয়তো সন্দেহ করিবে।

চার

নগরের মধ্যস্থলে চতঃশৃঙ্গের উপর জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেবের চতুঃশাল গৃহ। গৃহ ঘিরিয়া ফলফুলের উদ্যান। রন্তিদেব সমৃদ্ধ ব্যক্তি ; প্রধানত ধনী শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় তাঁহার যজমান। শ্রেষ্ঠীরা দূর দেশে বাণিজ্য যাত্রার পূর্বে তাঁহার কাছে ভাগ্য-গণনা করাইতে আসে, প্রয়োজন হইলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করায়, স্বর্ণমুষ্টি প্রণামী দিয়া যায়। বহিরাগত শ্রেষ্ঠীরাও রন্তিদেবের নাম জানে, তাহারা ত্রিপুরীতে আসিয়া দৈব বিষয়ে রন্তিদেবের শরণ লয়, কেহ কেহ তাঁহার গৃহেই অবস্থান করে। রন্তিদেবের ভবনে অতিথি সৎকারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে।

রন্তিদেবের গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে বিগ্রহপালের কোনই কষ্ট হইল না। নগরের কেন্দ্রভূমিতে বহু অট্টালিকা, পথে বহু নাগরিকের যাতায়াত। বিগ্রহ একজন নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিতেই সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল—

'ওই যে তোরণের উপর সাত ঘোড়ার রথ আঁকা রয়েছে, ওই বাড়ি।'

সপ্তাশ্ব রথ, অর্থাৎ সূর্য রথ, সুতরাং গ্রহাচার্যের গৃহই বটে। বিগ্রহপাল তোরণ পথে অশ্ব চালাইলেন।

গৃহদ্বারের সম্মুখে গৃহের প্রধান ভৃত্য, একজন মালী এবং অশ্বশালার ঘোড়াডোমের সঙ্গে দাঁড়াইয়া গালগল্প করিতেছিল। অশ্বারোহীকে দেখিয়া ভৃত্য অগ্রসর হইয়া আসিল। বিগ্রহপাল তাহার হাতে রুদ্রাক্ষ দিলেন।

ভৃত্যটি চালাক চতুর, ঘোড়া দেখিয়াই চিনিয়াছিল। সে মহা সমাদর করিয়া বিগ্রহপালকে লইয়া গিয়া ভবনের দ্বিতলে একটি সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত করিল। ঘোড়াটিকে ঘোড়াডোম গৃহের পশ্চাদ্দেশে অশ্বকুঠীতে লইয়া গেল।

বিগ্রহপাল হস্তমুখ প্রক্ষালন ও বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া কিঞ্চিৎ ফলমূল ও মিষ্টান্ন জলযোগ করিলেন, তারপর খট্বাঙ্গে দুগ্ধফেন শয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া অব্যবহিত অতীতকালের কথা মনে মনে পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। নানা চিন্তার মধ্যে যৌবনশ্রীর বিদ্যুল্লতার মত রূপ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনে চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

রন্তিদেব ফিরিলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে। ভস্মজটাদি ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত আকৃতি ; ক্ষৌরিত মস্তকে গ্রন্থিবদ্ধ শিখা, শীর্ণ-শাণিত মুখ, চক্ষু দুটিতে বুদ্ধির সহিত কৌতুকের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে। রন্তিদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে ও অন্যান্য নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত, বয়সও চটুলতার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে ; কিন্তু অন্তরে তিনি এখনও গম্ভীর হইতে পারেন নাই। একটু রঙ্গ-পরিহাস বা নাট্যাভিনয়ের গন্ধ পাইলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। সাধারণত জ্যোতির্বিদেরা জীবন-মৃত্যুর সমস্যা লইয়া সর্বদা নাড়াচাড়া করিতে করিতে অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া পড়েন ; রন্তিদেবের চরিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। জীবন-মৃত্যু তাঁহার কাছে মহাকালের নর্তন ছন্দ মাত্র।

রন্তিদেব বিগ্রহপালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'কুমার, আপনি আজ আমার গৃহে অতিথি, এ কেবল আমার পূর্বার্জিত সৎকৃতির ফল।'

বিগ্রহপাল হাসিয়া বলিলেন—'আর্য রন্তিদেব, আপনি আমাকে বেশি সম্মান দেখালে লোকে সন্দেহ করবে।'

রন্তিদেব বলিলেন—'বটে বটে, সত্য কথা। অভিনয় করতে হবে। তুমি আমার বন্ধু-পুত্র, নিবাস কাশী। তোমার নাম— ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'রণমল্ল কেমন হয় ?'

রন্তিদেব সহর্ষে দুই হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—'রণমল্ল—চমৎকার। ভাল কথা, তোমার বন্ধুটি কোথায় ?'

বিগ্রহপাল তখন অনঙ্গ ও গুপ্তচরের কথা বলিলেন। শুনিয়া রন্তিদেব কিছুক্ষণ ললাট কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন—'লক্ষ্মীকর্ণের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়, লোকটি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত। বৃষ লগ্নে জন্ম, তার উপর লগ্নে বৃহস্পতি। শাস্ত্রে বলে—বৃষ লগ্নে গুরুঃ খলঃ।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আপনি মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণকে চেনেন ?'

রন্তিদেব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। —'বিলক্ষণ চিনি। মহারাজ আমার প্রতি তুষ্ট নয়।'

'তুষ্ট নয় কেন ?'

'রাজমাতা অম্বিকা দেবী যখন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন তখন মহারাজ আমাকে ডেকে মাতার মৃত্যুকাল গণনা করতে বলেছিলেন। আমি গণনা করে বলেছিলাম মাতৃদেবী এখনও দীর্ঘকাল জীবিতা থাকবেন ; এবং মাতার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে মহারাজের মৃত্যু হবে। সেই থেকে মহারাজ আমার প্রতি বিরূপ। একটি নিরেট ভণ্ড-পণ্ডিতকে সভা-জ্যোতিষী নিযুক্ত করেছেন।' বলিয়া রন্তিদেব উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বিগ্রহপাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন—'সত্যি কি গণনায় এই ফল পেয়েছিলেন ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'দীর্ঘায়ু পেয়েছিলাম। বাকিটা কল্পনা।'

'তবে— ?'

'বৎস রণমল্ল, আয়ু থাকলেও কখনও কখনও অপঘাত মৃত্যু হতে পারে, তাই একটু সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম।'

'আপনার বিশ্বাস এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ নিজের মাতাকে— ?'

রন্তিদেব একবার ঊর্ধ্বদিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অলসকণ্ঠে বলিলেন—'মাতৃহত্যা মহাপাপ, এ কাজ মহারাজ কখনই করতে পারেন না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত অবহেলায় রুগ্ন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। —যাক এসব কথা, এখন তোমার কথা বল। যৌবনশ্রীকে ভাল লেগেছে ?'

বিগ্রহ একটু সলজ্জ হাসিলেন, বলিলেন—'আর্য, আপনি ওকে আগে দেখেছেন ?'

'দেখিনি ! শিশুকাল থেকে ওদের দুই বোনকে দেখছি। বীরশ্রী একটু চঞ্চলা, কিন্তু যৌবনশ্রী বড় ধীরা। সে শুধু রূপবতী নয়, তার মত গুণবতী কন্যা রাজবংশেও বিরল। যদি তাকে লাভ করতে পার বুঝব তুমি ভাগ্যবান।'

বিগ্রহপাল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু বিস্ময়ভাবে বলিলেন—'আর্য রন্তিদেব, পিতা ও পুত্রীর চরিত্রে এতখানি ভিন্নতা কি করে সম্ভব হয় ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'সৃষ্টির এ এক বিচিত্র রহস্য। হিরণ্যকশিপুর ঔরসে প্রহ্লাদ জন্মেছিলেন। বীরের পুত্র কাপুরুষ হয়, লম্পটের সন্তান সাধু হয়, আমি অনেক দেখেছি।'

তারপর দুইজন নানা কথার আলোচনা করিলেন, নানাবিধ মন্ত্রণা করিলেন। রাত্রি হইল, ভৃত্য কক্ষে দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল।

নৈশ ভোজনের আহ্বান আসিলে বিগ্রহপাল ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন—'অনঙ্গ এখনও এল না।'

রন্তিদেব বলিলেন—'উদ্বেগের কারণ নেই। তাকে একবার দেখেই বুঝেছি সে ভারি চতুর। আজ না হোক কাল সে আসবেই।'

বস্তুত রন্তিদেব ঠিকই বলিয়াছিলেন। অনঙ্গের জন্য উদ্বেগের কোনও কারণ ছিল না। সে লম্বোদরের গৃহের বহির্ভাগে একটি কক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। লম্বোদর খট্বাঙ্গ পাতিয়া শয্যা

বিছাইয়া দিয়াছিল, গৃহের অভ্যন্তর হইতে জলপান আনিয়া খাইতে দিয়াছিল। সবিনয়ে বলিয়াছিল—'মহাশয়, আপনার নামটি এখনও জানা হয়নি।'

অনঙ্গ বিবেচনা করিল সত্য নাম না বলাই ভাল ; সে বলিল—'আমার নাম মধুকর। মধুকর সাধু।'

'নিবাস ?'

'নিবাস মগধের পাটলিপুত্র নগরে।'

'ভাল। আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমি একবার বেরুব। শীঘ্র ফিরব।' বলিয়া লম্বোদর রাজাকে সমাচার দিতে গেল।

বাহিরে সন্ধ্যা নামিয়াছে। অনঙ্গ কিয়ৎকাল খট্টাঙ্গের পাশে বসিয়া কিংকর্তব্য চিন্তা করিল ; তারপর শয্যার উপর লম্বা হইল। রাত্রি আসন্ন, এখন আর বিগ্রহের সন্ধানে বাহির হইয়া কাজ নাই, কাল প্রাতে খোঁজ-খবর লইলেই চলিবে।

পাঁচ

দীপান্বিতা রাজপুরী। প্রথম বসন্তের বাতাসের মত রাজভবনে উৎসবের স্পর্শ লাগিয়াছে। পৌরজনের অঙ্গে নূতন বস্ত্র, পৌরতরুণীদের অঙ্গে নূতন অলঙ্কার। তোরণশীর্ষে মিঠা মিঠা বাঁশি ও মৃদঙ্গ বাজিতেছে। আকাশে নবোদিত পূর্ণচন্দ্র।

প্রমোদকক্ষে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ জামাতাকে লইয়া নববল খেলিতে বসিয়াছেন। পীঠিকার উপর চৌষট্টি কোঠার ছক আঁকা, তাহার উপর সাদা-কালো বল বসিয়াছে—ঠাকুর, মন্ত্রী, গজবল, নৌবল, অশ্ববল। বড়িয়ার চাল দিয়া খেলা আরম্ভ হইয়াছে। পাশে তাম্বূলের করঙ্ক ও ফলাম্লরসের ভৃঙ্গার লইয়া দুইজন কিঙ্করী নতজানু হইয়া খেলা দেখিতেছে।

খেলা জমিয়া উঠিয়াছে। দুইজনেরই চক্ষু একাগ্রভাবে ছকের উপর নিবদ্ধ। রাজার সন্নিধাতা আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার কানে কানে কথা বলিতেছে ; রাজা অধীরভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় করিতেছেন। রাজকর্মের এত তাড়া কী ? লম্বোদর আসিয়াছে, অপেক্ষা করুক। স্বয়ংবর-মণ্ডপ নির্মাতা সূত্রধর আদেশ চায়, কাল প্রাতে আদেশ পাইবে। আজ জামাতা বাবাজীকে পরাস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। নয়পালের নিকট নাকাল হইবার পর হইতে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের গূঢ় অন্তর্লোকে একটু আত্মগ্লানি আসিয়াছে, তাই তিনি নানা প্রকারে জামাতার চক্ষে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। —

ভবনের দ্বিতলে দুই ভগিনী প্রসাধন করিয়াছেন। দুইজনের পরিধানে দলিতহরিতালদ্যুতি দুকূল ; বঙ্গাল দেশ ছাড়া এমন কোমল সূক্ষ্ম দুকূল আর কোথাও পাওয়া যায় না। বীরশ্রী ভগিনীর জন্য অনেক আনিয়াছেন। দুইজনের বেণীতে কুন্দকলি অনুবিদ্ধ। সর্বাঙ্গে পুষ্পভূষা ; কর্ণে শিরীষ, কণ্ঠে মল্লীমালা, নিতম্বে অশোকপুষ্পের কাঞ্চী। চরণে গুঞ্জরী নূপুর। যেন দুইটি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

দুই ভগিনী সারা প্রাসাদময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কুমারী-বয়সের পিতৃগৃহ দেখিয়া দেখিয়া বীরশ্রীর যেন সাধ মিটিতেছে না। বান্ধুলি পর্ণসম্পুট লইয়া সর্বদা তাঁহাদের সঙ্গে আছে। হাস্য কৌতুক ও স্মৃতিরোমন্থন চলিতেছে।

'চল ভাই, ছাদে যাই।'

রাজভবনের অতিবিস্তীর্ণ ছাদ ; চারিদিক উন্মুক্ত। নগর এখানে ভিড় করিয়া আসে নাই।

দক্ষিণে নর্মদা প্রবাহিতা। চাঁদের আলো নর্মদার জলে চূর্ণ হইয়া গলিত রৌপ্যের মত বহিয়া যাইতেছে।

তিনজনে কিছুক্ষণ মুক্ত আকাশতলে অকারণে ছুটাছুটি করিলেন ; তারপর ছাদের মাঝখানে বসিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'বান্ধুলি, তুই নাচতে শিখেছিস ?'

সরলা বান্ধুলি বলিল—'শিখেছি দিদিরানী।'

'তবে নাচ।'

'নাচব দিদিরানী, কিন্তু তোমাকে গান গাইতে হবে।'

'আচ্ছা গাইব, তুই নাচ।'

বান্ধুলি তখন কোমরে উত্তরীয় জড়াইয়া ঝুম্ ঝুম্ নূপুর বাজাইয়া নাচিল, বীরশ্রী চটুলছন্দে গান গাহিলেন। যৌবনশ্রী কেবল দুই হাতে তাল দিলেন।

তারপর আনন্দের ঝর্ণার মত কলহাস্য করিতে করিতে তিনজন ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন।

যৌবনশ্রীর শয়নকক্ষে আসিয়া দুই বোন পালঙ্কের পাশে বসিলেন। অগুরু মৃগমদের ধূমগন্ধে কক্ষের বাতাস আমোদিত। বীরশ্রী একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'বান্ধুলি, তুই এবার নিজের ঘরে ফিরে যা। আজ আমরা দুই বোন একসঙ্গে শোব, সারা রাত গল্প করব।'

যৌবনশ্রী দিদির বাহু জড়াইয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—'হ্যাঁ দিদি।'

বান্ধুলি কিন্তু অবাক হইয়া গালে হাত দিল, বলিল—'ওমা, তোমরা একসঙ্গে শোবে ! আর জামাই রাজা ?'

বীরশ্রী ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিলেন—'জামাই রাজা কী ?'

'জামাই রাজা একলা শোবেন ?'

বীরশ্রী হাসি চাপিয়া ভ্রূকুটি করিলেন—'তোমার যে জামাই রাজার জন্যে নাড়ি কট্ কট্ করে উঠল ! তা—তুমিই না হয় আজ জামাই রাজার কাছে শোও গিয়ে।'

বান্ধুলি লজ্জায় জিভ কাটিল, পানের বাটা ঝনাৎ শব্দে মেঝেয় রাখিয়া ছুটিয়া পলাইল। দিদিরানী যেন কী ! মুখে কোনও কথা বাধে না। একটু কি লজ্জা আছে !

ছয়

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রীকে শয়নকক্ষে ছাড়িয়া এখন গৃহাভিমুখিনী বান্ধুলিকে অনুসরণ করা যাইতে পারে। কারণ, দুই ভগিনী সারা রাত্রি জাগিয়া কী গল্প করিবেন তাহা আমাদের অজানা নাই ; কিন্তু বান্ধুলির সহিত এখনও ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই।

রাজভবন হইতে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বান্ধুলি নিজের গৃহের পানে চলিল। নর্মদার তীর ধরিয়া পায়ে-হাঁটা পথ, সেই পথে অর্ধদণ্ড চলিলেই গৃহে পৌঁছানো যায়। রাজপথ দিয়া যাইলে অনেকখানি ঘুর হয়, তাই সে এই পথ দিয়াই যাতায়াত করে।

চাঁদিনী রাত্রে পথটি নির্মোকের মত পড়িয়া আছে। এক পাশে নদীর স্রোত, অন্য পাশে উন্মুক্ত ভূমি ; কদাচ দুই একটি ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঝিল্লি ডাকিতেছে। কোথাও জনমানব নাই। বান্ধুলি চলিতে চলিতে আপন মনে গুন গুন করিয়া গানের কলি আবৃত্তি করিতে লাগিল ; তাহার পায়ের নূপুরধ্বনির সহিত গানের গুঞ্জন মিশিয়া গেল। হঠাৎ এক সময় নর্মদার জল-ছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতেই তাহার গায়ে কাঁটা দিল, গলার গুঞ্জন একটু কাঁপিয়া গেল। বান্ধুলি

আপনা আপনি হাসিয়া উঠিল, তারপর উত্তরীয়টি ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া চলিতে লাগিল।

বান্ধুলি মেয়েটি বড় সরলা। তাহার আঠারো বছর বয়স হইয়াছে, পাঁচ-ছয় বছর ধরিয়া সে রাজপুরীতে যাতায়াত করিতেছে, নারীজীবনের অবিচ্ছেদ্য সুখদুঃখ সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞানও তাহার হইয়াছে ; তবু তাহার অন্তরের সহজ সরলতা ঘুচিয়া যায় নাই। একটুতে তাহার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, আবার একটুতে চক্ষু বাষ্পাকুল হয়। তাহার আঠারো বছরের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবন নয়, তবু সে নিজেকে দুঃখী মনে করিতে পারে নাই। বস্তুত নিজের সুখ-দুঃখের কথা সে বেশি ভাবে না, তাহার মন পরমুখাপেক্ষী ; পরের সুখ-দুঃখই তাহার মনে অধিক প্রতিফলিত হয়।

বান্ধুলির পিতা নাগসেন জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন না। চেদি রাজবংশের অধীনে দৌত্যকর্ম করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দূতকর্মে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সে সময় রাজায় রাজায় মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকিত ; পূর্বতন মহারাজ গাঙ্গেয়দেব গোলমাল দেখিলেই নাগসেনকে পররাজ্যে দূতরূপে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে নাগসেনকে প্রায়ই এ রাজ্য হইতে ও রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত ; কখনও কাশী, কখনও কাঞ্চী, কখনও কর্ণাট। গৃহে গৃহিণী ছিলেন, আর ছিল দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা—বেতসী ও বান্ধুলি। নাগসেন বৈশ্য হইলেও তাঁহার অন্তরে লোভ ছিল না ; একটি গৃহ, কিছু ভূসম্পত্তি এবং রাজার নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া তিনি তৃপ্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে যখন গৃহে আসিতেন, গৃহে আনন্দের ধুম পড়িয়া যাইত।

একবার নাগসেন দৌত্যকর্মে কলিঙ্গে গিয়াছেন, হঠাৎ সংবাদ পাইলেন, গুটিকা রোগে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। নাগসেন ত্বরিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ; শোক সংবরণ করিয়া কন্যাদের কথা চিন্তা করিতে বসিলেন। তাঁহার পক্ষে স্থায়িভাবে গৃহে বাস করা সম্ভব নয়, রাজকার্যে বাহিরে যাইতেই হইবে। আসন্নযৌবনা কন্যাদের অভিভাবকত্ব করিবে কে ?

দৌত্যকর্মের সূত্রে একটি লোকের সঙ্গে নাগসেনের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহার নাম লম্বোদর। সে অতিশয় চতুর এবং বিশ্বাসী। তাহার আকৃতি সুদর্শন নয়, কিন্তু সে রাজার প্রিয়পাত্র ; রাজা তাহার চোখ দিয়া দেখেন, তাহার কান দিয়া শোনেন। নাগসেন লম্বোদরের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলেন। তারপর কনিষ্ঠা কন্যার হাত ধরিয়া রাজপুরীতে লইয়া গেলেন, তাহাকে যৌবনশ্রীর হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন—'মা, আজ থেকে বান্ধুলি তোমার দাসী।' যৌবনশ্রী সমবয়স্কা মেয়েটিকে নিজের সখী করিয়া লইলেন ; নামমাত্র পরিচয় হইল—পর্ণসম্পুটবাহিনী।

জামাতাকে গৃহে বসাইয়া নাগসেন আবার রাজকার্যে দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন। বান্ধুলি রাজগৃহে যাতায়াত করে ; কখনও রাত্রে রাজপুরীতেই থাকিয়া যায়, কখনও গৃহে ফিরিয়া আসে। লম্বোদর গুপ্তচর হইলেও মানুষ মন্দ নয়। তাঁহার মনে দাম্পত্য-প্রীতি আছে, বান্ধুলিকে সে স্নেহ করে। সুখে শান্তিতে আবার দিন কাটিতে লাগিল।

কিন্তু গৃহীর সুখ-শান্তি স্থায়ী হয় না। দুই বৎসর পরে বিদেশে গুপ্তশত্রুর বিষপ্রয়োগে নাগসেনের মৃত্যু হইল। পিতাকে হারাইয়া মেয়েরা কান্নাকাটি করিল। লম্বোদর এবার সত্যসত্যই গৃহস্বামী হইয়া বসিল। তবু পারিবারিক পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হইল না, যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিল।

বছর দেড়েক পরে আর একটি ব্যাপার ঘটিল। বেতসী একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া রোগে পড়িল। ক্রমে রোগ প্রশমিত হইল বটে কিন্তু বেতসীর শরীর আর সারিল না। বেতসী স্বাস্থ্যবতী ফুল্লমুখী যুবতী ছিল, তাহার দেহ-মন অকালে শুকাইয়া গেল। ফুলন্ত লতার মূলে যেন

উপদিকা লাগিয়াছে।

দাম্পত্যরসে বঞ্চিত হইয়া লম্বোদর কিন্তু কোনও গণ্ডগোল করিল না। সে যদি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিত কেহ তাহাকে দোষ দিত না, সেকালে একাধিক বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু সে তাহা করিল না। লম্বোদর বুদ্ধিজীবী মানুষ, হয়তো তাহার মনে রসের স্থান খুব বেশি ছিল না ; কিম্বা কোনও গভীরতর অভিসন্ধি তাহার মনকে পরিচালিত করিতেছিল। বেতসী বেশি দিন বাঁচিবে না, তাহার মৃত্যুর পর বান্ধুলিকে বিবাহ করিলে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা থাকিবে না, উপরন্তু শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি নির্বিরোধে হস্তগত হইবে—এইরূপ কোনও দূরবিসর্পী অভিপ্রায় তাহার মনের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়।

বান্ধুলি বোধহয় লম্বোদরের মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত পাইয়াছিল। সে সরলা হইলেও বুদ্ধিহীনা নয়। তাহার কৈশোর-মুকুলিত দেহের প্রতি লম্বোদর মাঝে মাঝে চকিত-সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে ইহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কখনও কখনও লম্বোদর তাহাকে নিজ কর্মজীবনের এমন সব গূঢ় বৃত্তান্ত বলে যাহা সে বেতসীকে কোনও দিন বলে নাই। এই সব মিলাইয়া বান্ধুলি অনুভব করিয়াছিল যে লম্বোদর মনে মনে তাহাকে চায়। কিন্তু সেজন্য বান্ধুলি কোনও দিন শঙ্কা বা উদ্বেগ বোধ করে নাই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করা তাহার স্বভাব নয়। যদি দিদির মৃত্যু হয়, যদি লম্বোদর তাহাকে বিবাহ করিতে চায় তখন কী হইবে সেকথা এখন ভাবিয়া লাভ নাই।

এইভাবে দুই তিন বছর কাটিয়াছে। বেতসী শীর্ণ হইয়া ক্রমে একটি সঞ্চরমাণ ছায়ায় পরিণত হইয়াছে। বান্ধুলির মুকুলিত কৈশোর বিকশিত শতদল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। লম্বোদরের মনের ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা প্রবাহিত হইতেছে। বাহ্যত তাহাদের সম্পর্কে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। —

সেরাত্রে কৌমুদী-স্নাত হইয়া বান্ধুলি রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

বাড়িটি ঘিরিয়া বেণু-বংশের বেড়া, ভিতরে ক্ষুদ্র মালঞ্চ। দুইটি কিশোর নীপ তরু আছে, একটি কুরুবক, একটি অশোক। আর আছে সুগন্ধি ফুলের লতাগুল্ম, জাতী, মালতী, লবঙ্গলতা, কুন্দ। মালঞ্চটি বান্ধুলির, সে নিত্য তাহার পরিচর্যা করে। প্রত্যহ প্রভাতে রাজপুরীতে যাইবার আগে গাছে জল দেয়। যদি কোনও দিন সন্ধ্যার আগে রাজপুরী হইতে ফিরিয়া আসে, তখন আবার জল দেয়।

বান্ধুলি গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল অশোকতরুর নীচে ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। ঘোড়াটা যে লম্বোদরের ঘোড়া নয় তাহা সে ছায়ান্ধকারে লক্ষ্য করিল না ; ভাবিল, লম্বোদর গৃহে আসিয়াছে, এখনি আবার বাহির হইবে তাই ঘোড়া মন্দুরায় না বাঁধিয়া বাহিরে রাখিয়াছে। লম্বোদর কখন যায় কখন আসে তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

বাড়িতে একটিমাত্র ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। ঘরটি বেতসী ও লম্বোদরের শয়নকক্ষ। দুইটি খট্বা, মাঝখানে পিত্তলের দীপদণ্ডের মাথায় দীপ। একটি খট্বায় শয়ন করিয়া বেতসী দীপশিখার পানে চাহিয়া আছে।

বান্ধুলি প্রবেশ করিল—'দিদি !'

বেতসী যেমন শুইয়া ছিল তেমনি শুইয়া রহিল, কেবল নিষ্প্রভ চক্ষু বান্ধুলির দিকে ফিরাইয়া বলিল—'এলি ? আমি ভেবেছিলাম আজ তুই আসবি না। বীরশ্রী এসেছেন ?'

বান্ধুলি স্মিতমুখে বলিল—'এসেছেন, দিদি। তিনিই আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।'

'কেমন দেখলি বীরশ্রীকে ?'

'কি বলব দিদি, ঠিক যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।'

বেতসী একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—'তাঁর স্বামী আর বিয়ে করেননি ?'

গ্র

বান্ধুলি পাশের খট্টার কিনারায় বসিয়া হাসিয়া উঠিল—'ওমা, সে কি কথা, বিয়ে করতে যাবেন কোন দুঃখে। দিদিরানীর মুখ দেখলেই বোঝা যায় তিনি স্বামীর মন জুড়ে আছেন।'

বেতসীর অক্ষিকোটরে ধীরে ধীরে জল ভরিয়া উঠিল, সে অস্ফুট স্বরে বলিল—'হাঁ, আঁচলে যার সোনা বাঁধা আছে তার মুখ দেখলে বোঝা যায়।'

বেতসীর মুখ দেখিয়া বান্ধুলি চকিত উদ্বেগভরে বলিল—'দিদি! তোর শরীর কি আজ বেশি খারাপ হয়েছে?'

বেতসী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, জল-ভরা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—'বেশি খারাপ আর কী হবে? আমি কি সহজে মরব? সকলকে দগ্ধে দগ্ধে তবে মরব।'

বান্ধুলি ছুটিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল, তাহাকে জড়াইয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—'ছি দিদি, ওকথা বলতে নেই। তুই তো ভাল হয়ে গেছিস। দেখ না, বসন্তঋতু এসে পড়ল, এবার তুই ঠিক আগের মত হয়ে যাবি।'

বেতসীর মুখে একটু হাসি ফুটিল বটে কিন্তু চোখ দুটি নিরাশায় ডুবিয়া রহিল। সে জানে, সে বুঝিয়াছে। যাহারা মৃত্যু-পথের যাত্রী তাহারা বুঝিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে বান্ধুলি এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—'কুটুম্ব কোথায় গেলেন? তাঁকে দেখছি না।'

বেতসী বলিল—'সে বিকেলবেলা এসেছিল, আবার তখনি বেরিয়ে গেছে। একজন অতিথ্ রেখে গেছে।'

তাহাদের গৃহে অতিথি সজ্জনের যাতায়াত নাই। বান্ধুলি অবাক হইয়া বলিল—'অতিথ্! কোথায় অতিথ্?'

বেতসী বলিল—'বাইরের ঘরে আছে। তোর কুটুম্ব তাকে জলপান দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল, বলে গেল দু'দণ্ডের মধ্যে ফিরে আসবে। তা এখনও দেখা নেই।'

বান্ধুলি জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন অতিথ্ তুই দেখেছিস?'

বেতসী বলিল—'দেখিনি। শুনলাম মগধের এক বণিক।'

বান্ধুলি বলিল—'ওর ঘোড়াই তাহলে অশোকতলায় বাঁধা আছে। তা, একটা মানুষ বাড়িতে রয়েছে কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না।'

বেতসী বলিল—'হয়তো বুড়ো মানুষ, একলাটি অন্ধকারে টাকার পুঁটুলি কোলে করে বসে আছে।'

বান্ধুলি গালে হাত দিল—'ওমা! ঘরে পিদিম জ্বালা হয়নি?'

বেতসী বলিল—'কৈ আর হয়েছে। বাড়ির কর্তা উধাও, আমার নড়বার ক্ষমতা নেই। কে করবে বল। বাড়িতে অতিথ্, তাকে রাত্রে কি খেতে দেব জানি না।'

'সে তুই ভাবিস কেন দিদি, চারখানা চর্পটিকা আমি গড়ে দিতে পারব। আগে যাই, ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে আসি। বুড়ো বণিক হয়তো ভাবছেন, এরা কেমন গৃহস্থ।'

বণিকেরা সাধারণত বুড়াই দেখা যায়, তাই দুই বোনের ধারণা জন্মিয়াছিল, অতিথি বয়োবৃদ্ধ। বান্ধুলি তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া বাহিরের ঘরে গেল।—

অনঙ্গপাল খট্টাঙ্গে লম্বা হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বপ্ন দেখিতেছিল, ছিপ দিয়া মস্ত মাছ ধরিয়াছে। মাছের মুখটা লম্বোদরের মত; গোল চোখ, ভাল্লুকে খাওয়া নাক, বোকাটে হাসি। অনঙ্গপাল ভাবিতেছিল, মাছের ঝোল রাঁধিবে, না রাই-সরিষা দিয়া ঝাল রাঁধিবে, এমন সময় মাছটা জলে লাফাইয়া পড়িল এবং অদৃশ্য হইল।...অনঙ্গপাল জলের পানে চাহিয়া আছে, দেখিল একটি আলোর বুদ্বুদ জল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। বুদ্বুদ শূন্যে উঠিয়া তাহার দিকে

ভাসিয়া আসিল। বুদ্বুদের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে—ঝুম ঝুম ঝুম—

ঘুম ভাঙিয়া গেল, অনঙ্গ চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল। বুদ্বুদ নয়, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে দীপহস্তা এক যুবতী। যুবতীর অঙ্গ নধর, কান্তি কমনীয়, অধর রসসিক্ত, চক্ষু দুটি কাজল না পরিয়াও কৃষ্ণায়ত—

অনঙ্গ চোখ মুছিয়া আবার দেখিল। যুবতীর কণ্ঠে সোনার চিল্‌মীলিকা, কানে সোনার কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গের প্রগল্‌ভ উচ্ছলতা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে অচ্ছাভ নীহারিকার ন্যায় একটি নিচোল—

দুইজন অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর যুবতী সহসা প্রদীপ মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া দ্বারের দিকে চলিল। তাহার পায়ে মঞ্জরী বাজিয়া উঠিল—ঝিম ঝিম ঝিম।

অনঙ্গপাল সূচীবিদ্ধের মত চমকিয়া মুখে শব্দ করিল—'এহুম্ এহুম্—'

যুবতী দ্বারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ ঈষৎ তুলিল। অনঙ্গপাল রাজহংসের মত গলা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল—'তুমি কে ?'

যুবতীর অধরপ্রান্ত একটু নড়িল, সে বলিল—'আমি—গৃহস্বামী আমার কুটুম্ব।' সে দ্বারের বাহিরে গিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল। অনঙ্গপাল রাজহংসের মত গলা বাড়াইয়া ব্যগ্র-বিহ্বল চক্ষে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল।

বেতসী নিজ শয্যায় বসিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিল, বান্ধুলি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া অন্য শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং মুখে উত্তরীয় চাপা দিয়া মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল। বেতসী উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল—'কি হয়েছে রে ?'

বান্ধুলি ক্ষণেক মুখ হইতে উত্তরীয় সরাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—'এহুম্ এহুম্।' তারপর আবার মুখে কাপড় দিয়া দুলিতে লাগিল।

বেতসীর উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল। সে নিজের শয্যা হইতে নামিয়া বান্ধুলির পাশে বসিল। তাহার গায়ে হাত রাখিয়া চাপা গলায় বলিল—'বুড়ো বণিক কিছু বলেছে নাকি ?'

'বুড়ো নয়—তরুণ।' বান্ধুলি উঠিয়া বসিল এবং বেতসীর কাঁধে মাথা রাখিয়া অসহায়ভাবে হাসিতে লাগিল।

বেতসী বিরক্তিভরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—'আ গেল ! অত হাসছিস কেন ?'

বান্ধুলি কেন এত হাসিতেছে সে নিজেই জানে না। তাহার মনে হাসির কোন্ গোপন উৎস-মুখ খুলিয়া গিয়াছে।—অন্ধকার ঘরে বুড়া বণিক শুইয়া আছে দেখিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া কাছে গিয়াছিল, কৌতূহলবশে প্রদীপ তাহার মুখের কাছে ধরিয়াছিল, তারপর—

বান্ধুলির হাসি আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

হাসি রোগটা ছোঁয়াচে। কিছুক্ষণ পরে বেতসীও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তারপর ছদ্ম তিরস্কারের সুরে বলিল—'দেখন-হাসি !—শুধু হাসলেই চলবে ? বণিককে খেতে দিতে হবে না ?'

বান্ধুলি উঠিয়া পড়িল—'তুইও আয় না দিদি। রাঁধতে রাঁধতে গল্প করব।'

দুই বোন রসবতীতে গেল।—

লম্বোদর ফিরিল দুই দণ্ড পরে। তাহার মন ভাল নয়, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াও রাজার দর্শন পায় নাই। আবার কাল সকালে যাইতে হইবে।

আহার্য প্রস্তুত হইয়াছিল, লম্বোদর তাহা লইয়া বাইরের ঘরে গেল। অনঙ্গপাল ঊর্ধ্বে চাহিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, লম্বোদর বলিল—'সাধু মহাশয়, আমার ফিরতে বড় দেরি হয়ে গেল। আপনার

খুবই কষ্ট হয়েছে—'

অনঙ্গপাল বলিল—'কিছু না। আমি বেশ আনন্দে আছি।'

লম্বোদর বলিল—'আসুন, আহারে বসুন।'

অনঙ্গ আহারে বসিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা কথা হইল। লম্বোদর বলিল—'আমার কুটুম্বিনী রুগ্না, বেশি কাজকর্ম করতে পারে না। একটি শ্যালিকা আছে, সে রাজকন্যার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী ; বেশির ভাগ রাজপুরীতে থাকে, মাঝে মাঝে গৃহে আসে। আমিও সকল সময় গৃহে থাকি না। একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এসে বাড়ির কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। আপনি কোনও সঙ্কোচ করবেন না, আমার গৃহ নিজের গৃহ মনে করবেন। যদি কোনও প্রয়োজন হয় আমার স্ত্রীকে বলবেন কিম্বা দাসীকে আদেশ করবেন।'

অনঙ্গ বলিল—'ভাল। কিন্তু আমি শিল্পী মানুষ, আমার প্রয়োজন অতি সামান্য।'

লম্বোদরের গোল চক্ষু আরও গোল হইল, বলিল—'শিল্পী ? তবে যে বলেছিলেন আপনি বণিক ?'

অনঙ্গ বলিল—'বণিকও বটে শিল্পীও বটে। আমি চিত্র আঁকি, মূর্তি গড়ি, আর দেশে দেশে তাই বিক্রয় করে বেড়াই।'

লম্বোদর কিছুক্ষণ ঈষৎ হাঁ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—'অহহ—বুঝলাম।—আপনার শিল্পসামগ্রী বুঝি নৌকায় আছে ?'

অনঙ্গ বলিল—'কিছু নৌকায় আছে, বাকি এইখানেই রচনা করব। তোমার গৃহটি বেশ নির্জন, এখানে অবাধে কাজ করতে পারব। ভাল কথা, ত্রিপুরীতে উত্তম গণৎকার আছেন ?'

'আছেন। রন্তিদেব নামে একজন মহাপণ্ডিত গণৎকার আছেন। বণিকেরা সকলে তাঁর কাছে যান। তিনি নগরের মাঝখানে থাকেন ; জিজ্ঞাসা করলে যে কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

'ভাল। কাল প্রাতেই রন্তিদেব মহাশয়ের কাছে যাব। ভাগ্যটা পরীক্ষা করাতে হবে।'

অতঃপর অনঙ্গ আহার সম্পন্ন করিলে লম্বোদর বিদায় লইল।

শয্যায় শুইয়া শুইয়া অনঙ্গ ভাবিতে লাগিল—লম্বোদরের শ্যালিকাটি রাজকন্যার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী ! যোগাযোগ ভাল হইয়াছে। শ্যালিকাটি দেখিতে যেন সাগর-সেঁচা উর্বশী ! কী তার তনুর তনিমা, বক্ষ ও নিতম্বের গরিমা, অধরের লালিমা, কেশকলাপের কালিমা—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

পূর্ণিমার রাত্রি শেষ হইয়া নূতন দিন আরম্ভ হইতেছে। ত্রিপুরী নগরীর নরনারীরা জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আমাদের পরিচিত কয়েকজনেরও একে একে নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে।

লম্বোদরের গৃহে প্রথম ঘুম ভাঙ্গিল লম্বোদরের। সে উঠিয়া নদীতীরে গেল। তখনও একটু ঘোর-ঘোর আছে। নদীতীর হইতে ফিরিয়া লম্বোদর বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিল। রাত্রে এক মুঠি চণক ভিজানো ছিল তাহাই গুড় সহযোগে ভক্ষণ করিল। ঘরের মধ্যে আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে দেখিল বেতসীরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ; বেতসী শয্যায় শুইয়া শুইয়া তাহাকে দেখিতেছে। চোখে চোখ পড়িতে বেতসী একটু হাসিল।

লম্বোদর বেতসীর খট্বার উপর ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'আমি বেরুচ্ছি। তুমি অতিথিটিকে দেখো।'

সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বেতসী আরও কিছুক্ষণ শুইয়া রহিল, তারপর আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল। আজ তাহার শরীর-মন যেন অনেকটা স্বচ্ছন্দ মনে হইতেছে। গৃহে অতিথি, তাহার পরিচর্যা করিতে হইবে। বান্ধুলি তো এখনি রাজবাটী চলিয়া যাইবে। লম্বোদর কখন ফিরিবে স্থির নাই। অন্যদিন দাসী না আসা পর্যন্ত সে শয্যায় পড়িয়া থাকে, আজ ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। সংসারের সব কাজ তো দাসীকে দিয়া হয় না। —

গৃহের আর একটি ঘরে বান্ধুলির ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। চোখ মেলিয়া সে কিছুক্ষণ শূন্যে চাহিয়া রহিল। কাল রাত্রে অনেকখানি হাসি বুকে লইয়া সে ঘুমাইয়াছিল ; হাসিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়াছিল, আবার তাহার জাগার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কিসের জন্য হাসি ? দিদিরানী আসিয়াছেন তাই কি ? হঠাৎ মনে পড়িল। অতিথি ! মজার অতিথি !...কিন্তু এখনই রাজপুরীতে যাইতে হইবে। অতিথি কি জাগিয়াছে ? বান্ধুলি শয্যায় উঠিয়া বসিল।

বাহিরের ঘরে অতিথি তখনও ঘুমাইতেছিল। কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত সাগর-সেঁচা উর্বশী সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে অনঙ্গ নিদ্রা গিয়াছিল, এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। কিছুক্ষণ পরে বান্ধুলি যখন রাজবাটী যাইবার জন্য বাহির হইল তখন সে বহিঃকক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় বন্ধ দ্বারের কাছে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল ; কান পাতিয়া শুনিল, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইল না। তখন সে গৃহ হইতে নির্গত হইল। এতক্ষণে বাহিরে বেশ আলো ফুটিয়াছে। —

রাজভবনের বাতায়ন পথেও রবিরশ্মির সোনার কাঠি প্রবেশ করিয়াছিল, ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মুখের উপর পড়িয়াছিল।

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী একটি শয্যায় মুখামুখি শুইয়া ঘুমাইতেছেন। যৌবনশ্রীর ঘুম একটু তরল হইল। তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন দিদির চক্ষু দুটি তখনও মুদিত। তিনি আবার চক্ষু মুদিলেন। কিছুক্ষণ পরে বীরশ্রী চক্ষু মেলিলেন, যৌবনশ্রীর চক্ষু মুদিত দেখিয়া তিনি আবার চক্ষু মুদিলেন। তারপর দুই বোন একসঙ্গে চক্ষু মেলিলেন। দু'জনের চোখে আলস্য-ভরা হাসি ফুটিল। —

আর একটি কক্ষে বিশাল শয্যার উপর জাতবর্মা নিদ্রিত। ঘুমের ঘোরে তিনি পাশের দিকে হাতড়াইলেন কিন্তু কিছুই না পাইয়া চক্ষু খুলিলেন। অপরিচিত শয্যা, বীরা শয্যায় নাই ; তিনি বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর সব মনে পড়িয়া গেল। —

রাজভবনের অন্য প্রান্তে আর একটি কক্ষে পালঙ্কের উপর মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের দেহ রণক্ষেত্রে নিহত ঘটোৎকচের মত পড়িয়া ছিল ; তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ঘোর সিংহনাদ নিঃসৃত হইতেছিল। একজন কিঙ্করী পদপ্রান্তে বসিয়া পদসেবা করিতেছিল। লক্ষ্মীকর্ণ সহসা পা ঝাড়া দিলেন, পদসেবিকা ছিট্‌কাইয়া নীচে পড়িল। মহারাজ তখন পাশ ফিরিয়া শুইয়া আবার নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন। দাসী উঠিয়া আবার মহারাজের পা কোলে তুলিয়া লইল। মহারাজ যখন পা ঝাড়া দিয়াছেন তখন শীঘ্রই গা ঝাড়া দিবেন এরূপ আশা করা অন্যায় হইবে না। —

রাজপুরীর মধ্যে কেবল অম্বিকা দেবী নিজ কক্ষের দ্বারের দিকে চক্ষু পাতিয়া বিনিদ্র চাহিয়া ছিলেন। রোগীর ঘুম কখন আসে কখন যায় ; তিনি মধ্যরাত্রির পর আর ঘুমান নাই। কখন ভোর হইবে, কখন নাতিনীরা তাঁহার কাছে আসিবে এই আশায় পথ চাহিয়া ছিলেন। —

রাজপুরী হইতে দূরে নগরের কেন্দ্রস্থলে গ্রহাচার্য রন্তিদেবের গৃহে যুবরাজ বিগ্রহপালের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রথমেই তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল যৌবনশ্রীর মুখখানি। তিনি সহর্ষে আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর মনে পড়িয়া গেল, কাল রাত্রে অনঙ্গ আসে নাই। কোথায় গেল অনঙ্গ !

অনঙ্গ কোথাও যায় নাই, সে তখনও ঘুমাইতেছে। কিন্তু তাহাকে আর বেশিক্ষণ ঘুমাইতে

হইল না, দ্বারে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চকিতে উঠিয়া আলুথালু বেশবাস সম্বরণ করিতে করিতে সে গিয়া দ্বার খুলিল।

দ্বার খুলিয়া কিন্তু নিরাশ হইল। যাহাকে দেখিবে আশা করিয়াছিল সে নয়, এ অন্য মেয়ে। কৃশাঙ্গী রোগমলিন মুখশ্রী তবু কাল রাত্রির সেই নধরকান্তি যুবতীর সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। নিশ্চয় লম্বোদরের রুগ্না কুটুম্বিনী।

অনঙ্গ চট্ করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। মুখে গদ্‌গদ আপ্যায়নের ভাব আনিয়া বলিল—'ক্ষমা করুন, আমার ঘুম ভাঙ্গতে বড় দেরি হয়ে গেছে।—আপনি গৃহস্বামীর স্বামিনী—কেমন ?'

বেতসী মাথার উপর একটু আঁচল তুলিয়া দিয়া চক্ষু নত করিল, মৃদু স্বরে বলিল—'গৃহস্বামী কাজে বেরিয়েছেন, আমাকে অতিথির পরিচর্যা করতে বলে গেছেন।'

অনঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বলিল—'সে কি কথা ! আপনার শরীর অসুস্থ, আপনি পরিচর্যা করতে পারবেন কেন ? বরং আপনার ভগিনী—'

বেতসী চোখ তুলিল—'সে রাজবাটীতে গেছে।'

অনঙ্গ কণ্ঠস্বরে নৈরাশ্য দমন করিয়া বলিল—'ও। সে বুঝি দিনের বেলা রাজবাটীতে থাকে ?'

বেতসী বলিল—'রাত্রেও থাকে। কদাচ কখনও গৃহে আসে। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন, আমি আপনার জলপান তৈরি করে রেখেছি।'

'আমি এখনই প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি।'

অল্পকাল পরে অনঙ্গ আহারে বসিল। কিছু ফলমূল, যবের শক্তুর সহিত দুগ্ধ-শর্করা মিশ্রিত কিছু মণ্ড, তিল ও গুড়ের পাক মিষ্টান্ন। অনঙ্গ পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগল, বেতসী দ্বারের কাছে চৌকাঠ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনঙ্গ বলিল—'আপনি রোগা মানুষ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।'

বেতসী দ্বার-পীঠিকার একপাশে বসিল। অতিথি বড় মিষ্টভাষী সজ্জন। কাল রাত্রে বেতসী অতিথিকে বুড়া মনে করিয়াছিল। মোটেই বুড়া নয়, কমকান্তি যুবা। তাহাকে দেখিলে তাহার কথা শুনিলে মন প্রীত হয়।

আহার করিতে করিতে অনঙ্গ বলিল—'আপনাদের নগর অতি সুন্দর। এখানে কেউ মাছ খায় না ?'

বেতসী উৎসুক মুখ তুলিল—'মাছ ?'

'হাঁ। নর্মদায় মাছ আছে, আপনারা মাছ খান না ?'

'খাই। কিন্তু সব সময় পাই না।'

'পান না কেন ? জেলেরা মাছ ধরে না ?'

'ধরে। ডিঙায় চড়ে নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরে, তারপর নদীর ঘাটে এনে বিক্রি করে। এখানে মাছের বাজার নেই। আমরা কালেভদ্রে মাছ খাই।'

অনঙ্গ গাঢ়স্বরে বলিল—'ভগিনি, তোমার শরীর দুর্বল, মাছ না খেলে শরীর সারবে কি করে ? শুধু শাক-পাতা খেলে কি স্বাস্থ্য ভাল থাকে ?'

বেতসীর অধরে হাসি ফুটিল। যে অতিথি ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করে তাহার কাছে কতক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকা যায় ! সে স্মিতমুখে বলিল—'আপনি বুঝি মাছ খেতে ভালবাসেন ?'

অনঙ্গ বলিল—'খেতে ভালবাসি এবং খাওয়াতে ভালবাসি। তোমাকে মাছ রেঁধে খাওয়াব। তিন দিন খেলে তোমার দুর্বলতা দেশ ছেড়ে পালাবে।'

বেতসী বলিল—'আমি আজই দাসীকে মাছের সন্ধানে পাঠাব—'

অনঙ্গ হাত নাড়িয়া বলিল—'কোনও প্রয়োজন নেই। আমি মাছ সংগ্রহ করব। আজ আর হবে না। আজ আমাকে তৈজসপত্র আনতে যেতে হবে।'

'দ্বিপ্রহরে ফিরবেন তো ?'

'ফিরব। আমার জন্য বেশি কিছু রেঁধো না, আজ দুটি তণ্ডুল আর ঘৃত হলেই চলে যাবে।'

জলপান সমাধা করিয়া অনঙ্গ উঠিল। তারপর ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইল। বেতসী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। আজ তাহার রুগ্ন দেহে ক্লান্তি আসিল না।

অনঙ্গ যখন রন্তিদেবের গৃহে পৌঁছিল তখন বেলা বাড়িয়াছে। দ্বিতলের অলিন্দে নাপিত বিগ্রহপালের ক্ষৌরকর্ম করিয়া দিতেছে। অনঙ্গও বসিয়া গেল।

নাপিতের সম্মুখে কোনও কথা হইল না। সে বিদায় লইলে অনঙ্গ বলিল—'আমার নাম মধুকর সাধু।'

বিগ্রহ বলিলেন—'সাধু সাধু। আমি কাশীর বণিকপুত্র, নাম রণমল্ল।—কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি ?'

'গৃহস্থ লম্বোদরের গৃহে'—বলিয়া অনঙ্গ কল্যকার ঘটনা বিবৃত করিল।

বিগ্রহ উচ্চহাস্য করিলেন—'বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি !—যা হোক, আর ওদিকে যাস্‌নি।'

অনঙ্গ মাথা নাড়িল—'না, যেতে হবে। একটা সূত্র পাওয়া গেছে, ছাড়া চলবে না।'

রন্তিদেব আসিয়া আলাপে যোগ দিলেন, বলিলেন—'কি সূত্র ?'

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'বড় সূক্ষ্ম সূত্র, টানাটানি করলে ছিঁড়ে যাবে।—আর্য রন্তিদেব, আপনার ঘোড়াটা ফিরিয়ে এনেছি। ওটা আমি আর চড়ব না। আমি আপনার ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছি যদি গুপ্তচর চিনতে পারে গণ্ডগোল বাধবে।'

রন্তিদেব বলিলেন—'সে কথা ঠিক। কিন্তু ঘোড়া তো তোমাদের দরকার।'

বিগ্রহ জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখানে ঘোড়া কিনতে পাওয়া যায় না ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'পাওয়া যায়। বানায়ু দেশ থেকে সম্প্রতি একদল বণিক অনেক ঘোড়া এনেছে। উৎকৃষ্ট ঘোড়া।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তাহলে আর কথা কি ! আজ বৈকালে গিয়ে দুটো ঘোড়া কিনলেই হবে।'

রন্তিদেব বলিলেন—'ভাল। আমি আমার ঘোড়াডোমকে তোমাদের সঙ্গে দেব, তোমরা পছন্দ করে ঘোড়া কিনো।'

তখন বিগ্রহপাল বলিলেন—'আর্য রন্তিদেব, আমরা নিরাপদে ত্রিপুরীতে এসে পৌঁচেছি, আপনার গৃহে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি। যতদূর মনে হয় কেউ সন্দেহ করে না। এখন বলুন কর্তব্য কি ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'বৎস, কাল রাত্রেও তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে। তোমার প্রশ্ন শুনে আমি খড়ি পেতে প্রশ্ন-গণনা করেছিলাম।'

শ্রোতৃদ্বয়ের চোখের দৃষ্টি উৎসুক হইল—

'কি পেলেন ?'

রন্তিদেব একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'তোমার কার্যসিদ্ধি হবে, কিন্তু বর্তমানে কিছু বাধাবিঘ্ন আছে। পূর্ণ সিদ্ধিলাভ এখন হবে না।'

বিগ্রহপাল ব্যর্থতা-ভরা চক্ষে চাহিলেন—'কার্যসিদ্ধি হবে না।'

রন্তিদেব বলিলেন—'ভগ্নোদ্যম হয়ো না। এখন পূর্ণ সিদ্ধি না হলেও অন্তে সিদ্ধি অনিবার্য।'

কিছুক্ষণ তিনজনে নীরব রহিলেন। তারপর অনঙ্গ শান্তস্বরে বলিল—'দৈবের কথা বলা যায় না, যা ভবিতব্য তা হবেই। কিন্তু তাই বলে চুপ করে বসে থাকা যায় না।'

রন্তিদেব বলিলেন—'আমিও তাই বলি। ফল যাই হোক পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করতে হবে। আমার গণনা ভুলও হতে পারে। জন্ম মৃত্যু বিবাহ বলতে পারে না বরাহ।'

বিগ্রহপাল ক্ষণিক অবসাদ কাটাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—'যা হবার হবে। এখন কর্তব্য কি বলুন ?'

রন্তিদেব কহিলেন—'প্রথম কর্তব্য রাজপুরীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা।'

অনঙ্গ বলিল—'অবশ্য। কিন্তু আমি কিম্বা বিগ্রহ রাজপুরীতে গেলে ধরা পড়বার ভয়। অন্য কী উপায়ে রাজপুরীতে জাতবর্মা কিম্বা দেবী বীরশ্রীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে আপনি ভেবেছেন ?'

রন্তিদেব ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'আর কাউকে পাঠানো চলবে না, ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।' তারপর সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন—'আমি যেতে পারি ! মুখে ছাই মেখে জটাজূট ধারণ করে যদি যাই, কেউ আমাকে চিনতে পারবে না—'

অনঙ্গ হাসিয়া মাথা নাড়িল—'না আর্য, আপনাকে আর ষড়যন্ত্রের পাকে জড়ানো উচিত হবে না। এখন থেকে যা করবার আমরাই করব, আপনি নেপথ্যে থাকবেন।'

রন্তিদেব ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন—'কিন্তু আর তো কোনও উপায় দেখছি না—'

অনঙ্গ বলিল—'একটা উপায় হতে পারে। আমি যার বাড়িতে আছি সে সম্ভবত রাজার গুপ্তচর। কিন্তু তার এক শ্যালী আছে, সে যৌবনশ্রীর তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী। তাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার হতে পারে।'

বিগ্রহ অনঙ্গের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—'শ্যালিকাটি অনূঢ়া ?'

অনঙ্গ মুচকি হাসিল—'তাই মনে হল।'

'দেখতে কেমন ?'

উত্তরে অনঙ্গ ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ নাচাইল। তারপর রন্তিদেবকে বলিল—'আর্য, আপনি কি বলেন ? চেষ্টা করতে পারি ? অবশ্য খুব সতর্কভাবে চেষ্টা করতে হবে—'

অতঃপর তিনজনে দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনা করিলেন। ক্রমে দ্বিপ্রহর সমাসন্ন দেখিয়া অনঙ্গ উঠিয়া পড়িল। নিজের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র একটি ভৃত্যের স্কন্ধে তুলিয়া পদব্রজে লম্বোদরের গৃহে ফিরিয়া চলিল।

দুই

রাজপুরীতে ঠাকুরানী কক্ষে পর্যঙ্কের উপর ঠাকুরানী শয়ান ছিলেন, তাঁহার দুই পাশে দুই নাতিনী। লক্ষ্মীকর্ণ জামাতাকে মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রস্থান করিয়াছেন। যে দুইজন উপস্থায়িকা অম্বিকা দেবীর কাছে থাকে তাহাদের বিদায় করা হইয়াছে। বান্ধুলি রাজকুমারীদের পিছন পিছন ঘুরিতেছিল, বীরশ্রী তাহাকে বলিয়াছেন—'বান্ধুলি, তোর বাড়িতে অতিথ্ এসেছে বলছিলি, তা তুই ঘরে ফিরে যা। বেতসী একলা হয়তো পেরে উঠবে না।' বান্ধুলির মন দোটানায় পড়িয়াছিল, ছুটি পাইয়া সে উৎসুকচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল।

কক্ষ শূন্য হইলে ঠাকুরানী দুই নাতিনীর দিকে পর্যায়ক্রমে মন্থর চক্ষু ফিরাইলেন, বলিলেন—'এবার তোদের কথা শুনব। তার আগে একটা কাজের কথা বলে রাখি। আজ

মাসের প্রথম দিন, আজ থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত যৌবনশ্রী মন্দিরে পূজা দিতে যাবে। নগরে যত মন্দির আছে সব মন্দিরে নিজে গিয়ে পূজা দেবে। রাজবংশের এই প্রথা।'

বীরশ্রী বলিলেন—'ঠিক তো, আমার মনে ছিল না। আমিও তো গিয়েছিলাম পূজা দিতে।'

অম্বিকা বলিলেন—'নগরের বাইরে নর্মদার উৎসমুখের কাছে ত্রিপুরেশ্বরীর দেউলেও পূজা দিতে যেতে হবে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'হাঁ দিদি। আমি যৌবনাকে নিয়ে রথে চড়ে সব মন্দিরে পূজা দিয়ে আসব।'

অম্বিকা বলিলেন—'এবার তোদের কথা বল।'

তখন বীরশ্রী নৌকায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল এবং বিগ্রহপালের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া অম্বিকা কিয়ৎকাল অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নীরব রহিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'এই ব্যাপার! যুদ্ধে হেরে কর্ণ শপথ করেছিল, বিগ্রহপালকে স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রণ করবে, সে শপথ ভঙ্গ করেছে! এখন সব বুঝতে পারছি। কর্ণের মনে পাপ আছে, অন্য কোনও রাজাকে জামাই করবে স্থির করেছে।'—যৌবনশ্রীর দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—'তুই বিগ্রহপালকে দেখেছিস। তাকে বিয়ে করতে চাস?'

যৌবনশ্রী অরুণাভ মুখখানি নত করিয়া রহিলেন, তাঁহার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। বীরশ্রী তাঁহার পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—'বিগ্রহ যদি স্বয়ংবর সভায় থাকেন তাহলে যৌবনা তাঁর গলাতেই মালা দেবে।'

ঠাকুরানীর স্তিমিত চক্ষু কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'সত্যি ওকে মনে ধরেছে? যৌবনা, আমার পানে চোখ তুলে তাকা। তোর চোখ দেখলেই বুঝতে পারব।'

যৌবনশ্রী চোখ তুলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু চোখ অর্ধেক উঠিয়া আবার নামিয়া পড়িল। ঠাকুরানীর মুখে একটু হাসি ফুটিল, তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আচ্ছা বুঝেছি। তোরা এখন যা। আমি কর্ণকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

বীরশ্রী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—'বাবাকে এসব কথা যেন বোলো না দিদি।'

ঠাকুরানী বলিলেন—'আমি কিছুই বলব না। শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করব কোন্ কোন্ রাজাকে স্বয়ংবরে ডেকেছে, মগধের যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করেছে কিনা।'

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী আশ্বস্ত হইয়া ঠাকুরানীর কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন।

জাতবর্মা নিজকক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় একাকী পাদচারণ করিতেছিলেন, পত্নী ও শ্যালিকা প্রবেশ করিলে তিনি বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'বলতে পার আমি শ্বশুরালয়ে এসেছি, না কারাগারে এসেছি?'

বীরশ্রীও গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'তুমি কারাগারে এসেছ। আমরা দু'জন তোমার রক্ষী।'

জাতবর্মা বলিলেন—'চমৎকার রক্ষী! সারারাত্রি দেখা নেই।'

বীরশ্রী বলিলেন—'বন্দী কি রক্ষীদের দেখতে পায়! রক্ষীরা আড়াল থেকে বন্দীর ওপর নজর রাখে।'

জাতবর্মা যৌবনশ্রীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—'ভাল কথা। কিন্তু একটি বন্দীর পিছনে দুটি রক্ষী কেন? দ্বিতীয় বন্দীটাকে ধরতে পারছ না?'

জাতবর্মার সহিত যৌবনশ্রীর পরিহাসের সম্পর্ক, দু'জনের মধ্যে প্রীতিও যথেষ্ট আছে। কিন্তু যৌবনশ্রী রঙ্গ-রস সম্পূর্ণ উপভোগ করিলেও নিজে প্রগল্‌ভতা করিতে পারেন না, রসের কথা ঠোঁট পর্যন্ত আসিয়া আটকাইয়া যায়। তিনি দিদির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া হাসিলেন। হাসির অর্থ তুমি উত্তর দাও।

বীরশ্রী বলিলেন—'দ্বিতীয় বন্দী কোথায় যে ধরব ? কাল নদীর ঘাটে সেই শেষ দেখেছি।'

জাতবর্মা এবার হাসিলেন, বলিলেন—'ভেব না। সে যখন যৌবনশ্রীকে দেখেছে তখন তাকে কারাগারের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই শক্ত হবে। নিতান্তই শ্বশুর মহাশয়ের ভয়ে ঢুকে পড়তে পারছে না। —যৌবনশ্রী, তুমি অধীরা হয়ো না। দু'একদিনের মধ্যেই সে পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে জুটবে।'

যৌবনশ্রী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, ভগিনী ও ভগিনীপতিকে একত্র রাখিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন। সেখান হইতে একবার মুষ্টি তুলিয়া জাতবর্মাকে দেখাইলেন, তারপর দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ওদিকে মন্ত্রগৃহে মহারাজ তখন নিভৃতে নানা রাজকর্ম চালাইতেছেন। লম্বোদর তাহার বার্তা নিবেদন করিয়াছে। নৌকায় আগত লোকটা সম্ভবত নিরীহ ; বিশেষত যে যখন লম্বোদরের গৃহেই উঠিয়াছে তখন তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্মীকর্ণ লম্বোদরকে অন্য গুহ্য কর্মে নিয়োগ করিলেন। স্বয়ংবর ব্যপদেশে রাজধানীতে নানা লোক আসিতেছে, শীঘ্রই রাজারা আসিতে আরম্ভ করিবেন। সুতরাং গুপ্তচর সম্প্রদায়ের ব্যস্ততার অন্ত নাই।

লম্বোদর প্রস্থান করিলে লক্ষ্মীকর্ণ কিছুক্ষণ একাকী বসিয়া তাম্বূল চর্বণ করিলেন। শিল্পাগারে রাজশিল্পী যে শিল্পকর্মটি আরম্ভ করিয়াছে রাজার মন সেইদিকে প্রক্ষিপ্ত হইল। শিল্পী কী করিতেছে তাহা রাজা ভিন্ন আর কেহ জানে না, শিল্পাগারে অন্য সকলের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু শিল্পীর কর্ম রাজার মনোমত হইতেছে না। তিনি ঠিক যাহা চান তাহা হইতেছে না।

শিল্পাগার রাজভবনেরই একটি অংশ। রাজা উঠিয়া শিল্পাগারের দিকে চলিলেন।

এই সময় অন্তঃপুরের এক দাসী আসিয়া নিবেদন করিল, অম্বিকা দেবী পুত্রকে স্মরণ করিয়াছেন। মহারাজ ভ্রূকুটি করিলেন, চক্ষু ঘূর্ণিত করিলেন ; তারপর বলিলেন—'দু'দণ্ড আগে মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করেছি, আবার কী প্রয়োজন ? বল গিয়ে আমি রাজকার্যে ব্যস্ত আছি, পুনরায় মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করবার অবকাশ নেই।'

গলার মধ্যে ঘুৎকার শব্দ করিয়া তিনি শিল্পাগার অভিমুখে চলিলেন।

তিন

অনঙ্গপাল লম্বোদরের গৃহে ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য তাহার কক্ষে পেটরা পোট্টলি প্রভৃতি নামাইয়া রাখিলে তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া বলিল—'আর্যকে বোলো আজ অপরাহ্ণে আমি আবার আসব।'

ভৃত্য প্রস্থান করিলে অনঙ্গ নিজ কক্ষের বাহিরে আসিয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। গৃহে সাড়াশব্দ নাই। দাসী গৃহকর্ম সারিয়া প্রস্থান করিয়াছে, গৃহস্বামী এখনও ফিরিয়া আসে নাই ; গৃহিণী সম্ভবত পাকশালায় রন্ধনে ব্যস্ত। গৃহের এই নিরাবিলতার মধ্যে যেন একটি শান্তিপূর্ণ প্রসন্নতা আছে।

অনঙ্গ তখন আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল, পেটরা খুলিয়া নিজ দ্রব্যসামগ্রী দিয়া ঘর সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল। নিজ ব্যবহার্য বস্ত্রাদির সঙ্গে ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র মৃৎপুত্তলি, রঙের পাত্র তুলিকা ইত্যাদি। দক্ষিণ দিকের গবাক্ষ খুলিয়া দিয়া অনঙ্গ শিল্পসামগ্রীগুলি তাহার নীচে মেঝেয় সাজাইয়া রাখিল। কিছু মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে হইবে। এই গবাক্ষের নীচে বসিয়া সে নূতন মূর্তি গড়িবে।

অতঃপর আর কোনও কাজ নাই। জঠরে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে দেখিয়া অনঙ্গ গামোছা কাঁধে ফেলিয়া নদীতে স্নান করিতে চলিল।

এখানে রেবার তীরে বাঁধা ঘাট নাই, কিন্তু উচ্চ পাড় ক্রমশ নিম্নগামী হইয়া নদীর জলে মিশিয়াছে। অনঙ্গ জলের কিনারায় নামিয়া আসিয়া এক তাল ভিজা মাটি হাতে তুলিয়া পরীক্ষা করিল। ভাল মাটি। কাঁকর নাই, ঈষৎ বালু মিশ্রিত লাল মাটি। এ মাটিতে ভাল মূর্তি গড়া যাইবে। অনঙ্গ নিশ্চিন্ত হইয়া নদীতে অবগাহন করিল।

ওদিকে বান্ধুলি ঘরে ফিরিয়াছিল। অতিথির ঘরের দ্বার বন্ধ রহিয়াছে। এখনও ঘুমাইতেছে নাকি? বান্ধুলি একটু ইতস্তত করিল, তারপর সন্তর্পণে কপাটের উপর করতল রাখিয়া অল্প ঠেলিল। দ্বার ঈষৎ খুলিল।

ভিতরে কেহ নাই, শয্যা শূন্য। কিন্তু জানলার নীচে ও কি! বান্ধুলি চমৎকৃত হইয়া গেল, নিজের অজ্ঞাতসারেই সে কক্ষে প্রবেশ করিল।

কী অপূর্ব মূর্তিগুলি! কোনটি লক্ষ্মীর মূর্তি, কোনটি সরস্বতীর; কার্তিক আছেন, গজানন আছেন; তাছাড়া বুদ্ধমূর্তি, যক্ষিণীমূর্তি। বিতস্তিপ্রমাণ মূর্তিগুলিতে বর্ণের সমাবেশই বা কি অপরূপ। সবগুলি যেন জীবন্ত।

বান্ধুলি কিছুক্ষণ উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া রহিল, তারপর ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গৃহের পশ্চাদ্ভাগে পাকশালা বা রসবতী। বেতসী উনানে আঢ়কী দাল চড়াইয়া দর্বীদ্বারা মন্থন করিতেছিল, বান্ধুলি ছুটিয়া গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বলিল—'ও দিদি, দেখবি আয়, দেখবি আয়। কি সুন্দর পুতুল!'

বেতসী কৌতূহলী হইয়া বলিল—'পুতুল! কোথায় পুতুল?'

'অতিথির ঘরে। শিগ্‌গির দেখবি আয়।' বলিয়া বান্ধুলি ফিরিয়া চলিল।

বেতসী দর্বী হাতে লইয়াই তাহার পিছন পিছন চলিল। চলিতে চলিতে বলিল—'অতিথি কি ফিরে এসেছে নাকি?'

'তা জানি না। ঘরে কেউ নেই।'

দুই ভগিনী অতিথির ঘরে প্রবেশ করিল। মূর্তিগুলি দেখিয়া বেতসীও মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কুম্ভকার রচিত স্থূল হাতি-ঘোড়া নয়, অপরূপ শিল্পকৃতি। বেতসী সংহতকণ্ঠে বলিল—'সত্যি সুন্দর। বণিক বোধহয় পুতুলের ব্যবসা করে।'

বান্ধুলি বলিল—'পাশে রঙ তুলি রয়েছে। হয়তো নিজেই মূর্তি গড়ে। কারুকর।'

বেতসী বলিল—'তাই হবে। তল্পিতল্পা নিয়ে ফিরেছে দেখছি। কিন্তু গেল কোথায়?'

পিছন হইতে শব্দ হইল—'এই যে আমি। নর্মদাতে স্নান করতে গিয়েছিলাম।'

দুইজনে ফিরিয়া দেখিল—অতিথি। তাহার গায়ে ভিজা গামোছা জড়ানো, এক হাতে সিক্ত বস্ত্রের পিণ্ড, অন্য হাতে এক দলা কাদা। দুই বোন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বেতসী হাতের দর্বী পিছনে লুকাইল। অনঙ্গ কিন্তু লেশমাত্র অপ্রতিভ হইল না, মাটির দলা ভূমিতে রাখিয়া বলিল—'আমার পুতুল দেখছিলে? কেমন, ভাল নয়? এই কাদা এনেছি, আরও পুতুল গড়ব।'

দুই ভগিনী তির্যকভাবে দ্বারের দিকে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া বেতসী বলিল—'আমার রান্না তৈরি, এখনি দিচ্ছি।'

সে অদৃশ্য হইল। বান্ধুলিও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু তৎপূর্বেই অনঙ্গ তাহাকে সম্বোধন করিল—'এই যে, তুমি রাজবাটী থেকে ফিরে এসেছ।'

বান্ধুলি জড়িতস্বরে বলিল—'হাঁ, দিদিরানী বললেন—'

অনঙ্গ বলিল—'আমি ভেবেছিলাম আজ রাত্রির আগে তোমার দেখা পাব না। দিদিরানী

কে ?'

বান্ধুলি বলিল—'বড় রাজকুমারী দেবী বীরশ্রী।'

'ও—বড় রাজকুমারীর নাম বীরশ্রী।—আর তোমার নাম কি ?'

বান্ধুলি থতমত খাইয়া বলিল—'বান্ধুলি।'

'বান্ধুলি !' অনঙ্গ ফিক করিয়া হাসিল—'সুন্দর নাম। আমার নাম কি জান ? মধুকর।'

বান্ধুলি প্রথমে শ্লেষটা ধরিতে পারে নাই। তারপর তাহার মুখে যেন আবীর ছড়াইয়া পড়িল। বান্ধুলি আর মধুকর—ফুল আর ভোমরা। সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া পলায়ন করিল। অতিথি হয়তো সরলভাবেই নিজের নাম বলিয়াছে, কিন্তু—

বান্ধুলি যখন রসবতীতে ফিরিয়া গেল তখন তাহার মুখে ভয়ভঙ্গুর হাসি লাগিয়া থাকিলেও বুক ঢিব ঢিব করিতেছে। বেতসী কিছু লক্ষ্য করিল না, থালিতে অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইতে সাজাইতে বলিল—'অতিথি লোকটি বেশ ভাল, না রে ?'

বান্ধুলি বলিল—'হুঁ। তুই রোগা শরীর নিয়ে নিজেই সব রেঁধেছিস !'

বেতসী বলিল—'আজ আমার শরীর অনেক ভাল। তুই ফিরে আসবি তা কি জানতাম ? তা এখনও তো অনেক কাজ বাকি, তুই কর না।'

'কি করব বল।'

'অতিথির ঘরে জল-ছড়া দিয়ে পিঁড়ি পেতে দে, ঘটিতে কর্পূর-দেওয়া খাবার জল দে, ঝারিতে আচমনের জল দে, মুখশুদ্ধির পান-সুপারি সাজিয়ে রাখ। কাজ কি একটা !'

বান্ধুলিও কাজে লাগিয়া গেল। ছোট পিতলের শরাবে পান-সুপারি সাজাইয়া রাখিয়া জলের ঘটি লইয়া অতিথির ঘরে গেল। পরম সংযতভাবে দেহের বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া মেঝেয় জল-ছড়া দিল ; ঘরেই পিঁড়ি ছিল ; তাহা পাতিয়া দিয়া জলের ঘটি পাশে রাখিল। অনঙ্গ খট্টার পাশে বসিয়া সপ্রশংস নেত্রে দেখিতে লাগিল।

'তোমরা দুই বোন ভারি অতিথিবৎসলা।—গৃহস্বামী লম্বোদর ভদ্র এখনও আসেননি ?'

বান্ধুলি উত্তর দিবার পূর্বেই বেতসী থালা লইয়া প্রবেশ করিল, পীঠিকার সম্মুখে থালা রাখিয়া বলিল—'গৃহস্বামীর কি সময়ের জ্ঞান আছে। রাজভৃত্য যে। কখন আসেন কখন যান তা দৈবজ্ঞও বলতে পারে না।—আসুন।'

অনঙ্গ পীঠিকায় বসিল। আহার্য শুধু ঘৃত-তণ্ডুল নয় ; অড়রের দাল, শাক-শিম্বির ব্যঞ্জন, নিম্বের তিক্ত, তিন্তিড়ির অম্ল, দধি ও পর্পট। আহার্যগুলি পরিদর্শন করিয়া অনঙ্গ বলিল—'এ কি করেছ ভগিনী ! এত অন্ন-ব্যঞ্জনের প্রয়োজন ছিল না। সামান্য শাক-তণ্ডুলই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

বেতসী প্রীতা হইয়া বলিল—'সে কি কথা, আপনি অতিথি।—বান্ধুলি, পাখা নিয়ে আয়।'

বান্ধুলি তালবৃন্তের পাখা আনিয়া দিল, বেতসী সম্মুখে বসিয়া থালার উপর পাখা নাড়িতে লাগিল। অনঙ্গ আহারে মন দিল। বান্ধুলি তাম্বূলের শরাব হস্তে দ্বারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর বেতসী বলিল—'আপনি আমাকে ভগিনী বলে ডেকেছেন তাই জিজ্ঞাসা করতে সাহস করছি। আপনার দেশ কোথায় ভদ্র ?'

অনঙ্গ বলিল—'আমার দেশ বঙ্গ-মগধ। আমি পাটলিপুত্রে বাস করি।' বলিয়া লম্বোদরকে যেরূপ পরিচয় দিয়াছিল বেতসীকেও সেইরূপ দিল।

বেতসী জিজ্ঞাসা করিল—'পিতা-মাতা ? দার-কুটুম্ব ? সন্তান-সন্ততি ?'

'কেউ নেই। পৃথিবীতে আমি একা। তাই তো ভবঘুরের মত হেথা হোথা ঘুরে বেড়াই।'

বলিয়া অনঙ্গ সুগভীর নিশ্বাস মোচন করিল।

বেতসী সমবেদনাপূর্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; বান্ধুলির চোখ ছলছল করিতে লাগিল। অনঙ্গ মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—'কিন্তু সংসারে কেঁদে কোনও লাভ নেই। আমি আমার শিল্পকলা নিয়ে আনন্দে আছি। তোমাদের মত সুখের সংসার যখন দেখি তখন ইচ্ছা হয় আবার সংসার পেতে বসি। পাটলিপুত্রে আমার ঘর-বাড়ি জমিজমা সব আছে, কেবল ভোগ করবার কেউ নেই।' বলিয়া বান্ধুলির দিকে বৈরাগ্যপূর্ণ কটাক্ষপাত করিল।

ক্রমে আহার করিতে করিতে অনঙ্গের মুখ আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—'কি মিষ্টি তোমার হাতের রান্না ভগিনী। তোমার বোনও কি তোমার মত রাঁধতে পারে ?'

বেতসী বান্ধুলির দিকে তৃপ্তিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল—'পারে বইকি। তবে ও তো বেশি রাঁধে না, কুমারী যৌবনশ্রীর কাছে থাকে। ক্রমে শিখবে।'

আহারান্তে বান্ধুলির হাত হইতে পান লইয়া অনঙ্গ বলিল—'আমি এখন দু'দণ্ড বিশ্রাম করব, তারপর উঠে মূর্তি গড়তে আরম্ভ করব। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও গিয়ে।'

বেতসী ও বান্ধুলি রসবতীতে গিয়া আহারে বসিল, আহার করিতে করিতে পরস্পরের পানে স্মিত চকিত কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। অজ্ঞাত অখ্যাত শিল্পী কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের জীবনে রঙ ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছে ; যে বীজ মাটির তলে অনাদৃত পড়িয়া ছিল তাহা অলক্ষিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে। আশা—অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট আশা ; তবু বেতসীর কাছে তাহা যেন নব-জীবনের সঞ্জীবনমন্ত্র। আশা মানুষের মনে যে বর্ণাঢ্য চিত্র আঁকিতে পারে মর্ত্য শিল্পীর তাহা সাধ্যাতীত।

বেতসী ও বান্ধুলি আহার শেষ করিয়া উঠিলে লম্বোদর ফিরিল। ঝড়ের মত আসিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিল, বলিল—'শিগ্‌গির খেতে দাও, এখনি আবার বেরুতে হবে।'

বান্ধুলি তাড়াতাড়ি অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়া দিল। বেতসী পাশে বসিয়া তাহার গায়ে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। সঙ্কুচিতস্বরে বলিল—'একটু বিশ্রাম করবে না ?'

'সময় নেই' বলিয়া লম্বোদর গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল। তাহার মন বাহিরে কাজের দিকে পড়িয়া ছিল ; তবু সে অনুভব করিল গৃহে যেন কিছু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। আহার্যের বৈচিত্র্য কিছু বেশি। সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া বেতসীর পানে চাহিল ; প্রত্যুত্তরে বেতসী একটু হাসিল। লম্বোদর আবছায়াভাবে মনের মধ্যে একটু বিস্ময় অনুভব করিল।

খাওয়া শেষ করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে লম্বোদর বলিল—'অতিথি খেয়েছে ?'

বেতসী তাহার হাতে পান দিয়া বলিল—'হাঁ। অতিথি নিজের তল্পিতল্পা নিয়ে এসেছে, এখন আহারের পর বিশ্রাম করছে।'

'ভাল।' আর কোনও কথা হইল না। লম্বোদর একবার বান্ধুলির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, যেন প্রথম তাহাকে লক্ষ্য করিল। তারপর মুখে পান পুরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিল।

দুই বোন পরস্পর চাহিয়া হাসিল। লম্বোদরের এমনই স্বভাব। যখন ঘরে আসে মনটা বাহিরে রাখিয়া আসে।

বেতসী আজ অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াছিল, সে এবার নিজ শয্যায় আশ্রয় লইল। বান্ধুলিকে বলিল—'আমি শুলাম, সন্ধ্যার আগে আর উঠছি না। তুই অতিথির দেখাশুনা করিস।'

'আচ্ছা' বলিয়া বান্ধুলি কিছুক্ষণ সেখানে ঘোরাঘুরি করিল, তারপর নিজের ঘরে গেল। দরজা একটু ফাঁক করিয়া রাখিয়া শয্যার পাশে বসিল। বালিশের তলে অশ্বত্থপত্রের আকারের একটি ক্ষুদ্র রূপার আদর্শ ছিল, সেটি মুখের সামনে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল ; শুধু নিজের চোখ দিয়া নয়, যেন আর একজনের চক্ষু দিয়া নিজেকে দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু

গ্র

সেই সঙ্গে তাহার কান বাহিরের দিকে সতর্ক হইয়া রহিল।

অনঙ্গ আহারের পর শয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মস্তিষ্কের মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তার সূত্র লূতা-জাল বুনিতেছিল—মেয়েটা দেখিতে বড় সুন্দর, দেখিলেই লোভ হয়...কিন্তু তাহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না...বোধহয় ভারি সরলা...কিন্তু যে মেয়েরা অহরহ রাজকন্যার পার্শ্বে বিচরণ করে তাহারা কি সরল হইতে পারে?...রাজপুরীতে নিরন্তর প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা কৈতব চক্রান্ত, চক্রের মধ্যে চক্র...বান্ধুলি...নামটি যেন মধুক্ষরা...

দুই দণ্ড ঝিমাইয়া অনঙ্গ উঠিয়া বসিল। এবার মূর্তি গড়া আরম্ভ করিতে হইবে; পাটলিপুত্র ত্যাগ করার পর আর সে মূর্তি গড়ে নাই; মন বুভুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঘরে জল নাই। সে উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিল, মুণ্ড বাড়াইয়া দেখিল অলিন্দে কেহ নাই। তখন সে গলা ঝাড়া দিয়া বলিল—'এহুম্— !'

বান্ধুলি নিজ কক্ষের দ্বার হইতে মুণ্ড বাহির করিয়া চাহিল। দু'জনের চোখাচোখি হইল, অধরে অনাহূত হাসি খেলিয়া গেল। অনঙ্গ বলিল—'একটু জল চাই।'

বান্ধুলি ঘাড় নাড়িল, তারপর ত্বরিতে রসবতী হইতে শীতল জল লইয়া অতিথির কক্ষে উপস্থিত হইল।

অনঙ্গ বান্ধুলির হাত হইতে ঘটি লইয়া কিছু জল আলগোছে গলায় ঢালিল, তারপর জানালার সম্মুখে গিয়া বসিল। ঘটির জলে দুই হাত ভিজাইয়া মাটির পিণ্ডটা তুলিয়া লইল, দুই হাতে তাহা চট্‌কাইতে লাগিল। বান্ধুলি ঘর হইতে চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল, কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারিল না, দ্বার পর্যন্ত গিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল। অনঙ্গ আড়চোখে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—'তোমার যদি অন্য কাজ না থাকে তুমি বসে আমার কাজ দেখ না।'

এই আমন্ত্রণটুকু বান্ধুলি লোলুপমনে কামনা করিতেছিল। শিল্পী কেমন করিয়া মূর্তি গড়ে তাহা জানিবার জন্য তাহার ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং অনঙ্গ হইতে কিছু দূরে একপাশে হাঁটু মুড়িয়া বসিল।

অনঙ্গ কাদা থাসিতে থাসিতে হাস্যমুখে বলিল—'কী মূর্তি গড়ব বলো?'

বান্ধুলি সলজ্জে চক্ষু নত করিল—'আমি জানি না।'

অনঙ্গ আর কিছু বলিল না, নিপুণ অঙ্গুলি দিয়া মৃৎপিণ্ড গড়িতে আরম্ভ করিল। বান্ধুলির মুখের দিকে তাকায় আর গড়ে। তারপর তালপত্রের ক্ষুরিকা দিয়া সন্তর্পণে মাটি চাঁছিয়া ফেলে। বান্ধুলিও কৌতূহলী চক্ষে চাহিয়া থাকে, কিন্তু অনঙ্গের অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে কী বস্তু প্রস্তুত হইতেছে তাহা ধরিতে পারে না। শিল্পীর কর্মতৎপর অঙ্গুলিগুলির দিক হইতে তাহার উৎসুক দৃষ্টি শিল্পীর মুখের দিকে সঞ্চারিত হয়, আবার অঙ্গুলির দিকে ফিরিয়া আসে। তাহার মনে হয় যেন সে চতুর মায়াবীর ইন্দ্রজাল দেখিতেছে।

অবশেষে অনঙ্গ মৃৎপিণ্ডটি বান্ধুলির মুখের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কার মুখ চিনতে পারো?'

বান্ধুলি রুদ্ধশ্বাসে দেখিল, তাহারই মুখ। নাক চোখ কপাল গণ্ড, কোনও প্রভেদ নাই। ভিজা মাটিতে তাহার মুখের ডৌল অবিকল ফুটিয়াছে। সে ব্যগ্রবিহ্বল কণ্ঠে বলিল—'আমি!'

অনঙ্গ হাসিতে হাসিতে মুখখানাকে আবার নিরবয়ব মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিল, বলিল—'ভাল হয়নি। পরে তোমার মুখ আবার ভাল করে গড়ব।'

বান্ধুলি সম্মোহিতের ন্যায় বসিয়া দেখিতে লাগিল। অনঙ্গ তাল-সদৃশ মৃৎপিণ্ডকে তিন ভাগ করিয়া ছোট ছোট মূর্তি গড়িতে আরম্ভ করিল। এবার শুধু মুখ নয়, পূর্ণাবয়ব মূর্তি। গড়িতে

গড়িতে অনঙ্গ লঘুকণ্ঠে আলাপ করিতে লাগিল।

'আমার গড়া পুতুল তোমার ভাল লেগেছে ?'

'এত সুন্দর পুতুল—' বান্ধুলির কথা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

'আমার পুতুল রাজকুমারীদের ভাল লাগবে ?'

'খুব ভাল লাগবে। এমন চমৎকার পুতুল রাজকুমারীরাও দেখেননি।'

অনঙ্গ কিছুক্ষণ নীরবে কাজ করিল, তারপর বলিল—'আমি একটি ভাল পুতুল তৈরি করে তোমাকে দেব, তুমি সেটি রাজপুরীতে নিয়ে গিয়ে কুমার-ভট্টারিকাদের দেখাতে পারবে ?'

বান্ধুলি সাগ্রহে বলিল—'পারব। ওঁরা দেখলে খুব প্রীতা হবেন। কবে আপনি পুতুল তৈরি করে দেবেন ?'

তাহার আগ্রহ দেখিয়া অনঙ্গ হাসিল। সত্যই মেয়েটা সরলা। সে বলিল—'পুতুল তৈরি করে তাকে আগুনে পোড়াতে হবে, তারপর রঙ রসান চড়াতে হবে। দুই তিন দিন লাগবে।'—

এইভাবে তিন চারি দণ্ড কাটিয়া গেল। বান্ধুলির জড়তা ক্রমে কাটিয়া যাইতে লাগিল। অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইলে অনঙ্গ কাজ বন্ধ করিয়া উঠিল। বলিল—'আমাকে একবার বেরুতে হবে। সন্ধ্যার আগেই ফিরব।'

চার

বিগ্রহপাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অনঙ্গ উপস্থিত হইলে দুইজনে অশ্বক্রয়ের জন্য বাহির হইলেন। পদব্রজে চলিলেন ; একজন ঘোড়াডোম কম্বল বল্‌গা প্রভৃতি পর্যয়ণ লইয়া তাঁহাদের পথ দেখাইয়া চলিল।

নগরের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে লোকালয় শেষ হইয়া মাঠ আরম্ভ হইয়াছে সেইখানে বিস্তীর্ণ স্থান ঘিরিয়া ঘোড়ার আগড়। প্রায় ছয়-সাত শত অশ্ব এই বংশ-বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ আছে ; অধিকাংশ অশ্বই মুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কয়েকটি বাঁধা আছে। লাল কালো সাদা নানা বর্ণের উৎকৃষ্ট তেজস্বী অশ্ব।

আগড়ের প্রবেশদ্বারের পাশে একটি শ্বেতবর্ণ বড় পট্টাবাস। তাহার চারিধারের যবনিকা খোলা রহিয়াছে ; মাটিতে পুরু আস্তরণ পাতা। তিন চারিজন মানুষ বসিয়া আছে।

মানুষগুলিকে দেখিলেই চমক লাগে। যেমন তাহাদের বেশবাস, তেমনই আকৃতি। বিগ্রহ এবং অনঙ্গ নিকটবর্তী হইলে তাহারা পট্টাবাসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই দীর্ঘাঙ্গ, প্রাণসার মেদবর্জিত দেহ। পরিধানে আগুল্‌ফলম্বিত অঙ্গাবরণ মধ্যদেশে নীল কটিবন্ধ দ্বারা সম্বৃত ; মস্তকে অবগুণ্ঠনের ন্যায় আচ্ছাদন পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কেবল মুখমণ্ডল অনাবৃত রহিয়াছে। মুখের বর্ণ যেমন তুষার-গৌর, মুখাস্থির গঠন তেমনি মর্মরদৃঢ়। নাসা তীক্ষ্ণোচ্চ, গণ্ড ও চিবুকের চর্ম অল্প কেশাবৃত। ইহারা যে ভারতবর্ষের লোক নয় তাহা ইহাদের দর্শনমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহাদের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্থ ব্যক্তি ছিল, বিগ্রহ ও অনঙ্গ সম্মুখীন হইলে সে নিজে বুকের কাছে মুক্ত করতল তুলিয়া অভিবাদন করিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা অবহট্ট ভাষায় বলিল—'শান্তি হোক। আপনারা ঘোড়া কিনতে এসেছেন ? আদেশ করুন।'

বিগ্রহ কিছুক্ষণ উৎসুক নেত্রে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'হাঁ, আমরা ঘোড়া কিনতে এসেছি। আপনারা কোন্ দেশের লোক ?'

বয়স্ক ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি সতর্ক হইল। সে গম্ভীরমুখে বলিল—'আমরা আরব দেশের সওদাগর—বণিক।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আরব দেশ—সে কোথায় ?'.

বণিক পশ্চিমদিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল—'এই দিকে। অনেক দূরে। বহু নদী পাহাড় মরুভূমি পার হয়ে যেতে হয়।'

'ভাল। আমরা দুটি উৎকৃষ্ট ঘোড়া কিনতে চাই।'

'আমার সব ঘোড়াই উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ঘোড়া নেই। আরব দেশ থেকে নিকৃষ্ট ঘোড়া আনলে আমাদের পোষায় না।'

'ভাল। ঘোড়া দেখান।'

বণিক তখন বলিল—'আর একটা কথা। আমরা ঘোড়ার দাম সোনা ছাড়া অন্য কোনও মুদ্রায় নিই না।'

বিগ্রহ বলিলেন—'সোনাই পাবেন।'

অনঙ্গ এতক্ষণ নীরব ছিল, নীরবে এই বিদেশী বণিকদের পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, ইহাদের ভাবভঙ্গি বাহ্যত বণিকজনোচিত হইলেও সম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক নয়। ইহারা সম্বৃতমন্ত্র ও সতর্ক, যেন সর্বদাই নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘোড়া বিক্রয় করাই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

অনঙ্গ বলিল—'সোনা ছাড়া অন্য মুদ্রা নেবেন না এর কারণ কি ? অন্য ব্যবসায়ীরা তো নিয়ে থাকেন।'

বণিক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ অনঙ্গকে দেখিল—'হিন্দুস্তান স্বর্ণপ্রসূ, আরব দেশে সোনা নেই। উপরন্তু সোনা নিয়ে যাবার সুবিধা।'

অনঙ্গ বলিল—'তা বটে। আপনারা কি ভারতবর্ষের সর্বত্র যাতায়াত করেন ?'

এই সময় বণিকের পাশের এক ব্যক্তি অবোধ্য ভাষায় কিছু বলিল ; বণিক তাহার উত্তর না দিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল—'আমরা অশ্ব-বণিক, অশ্ব বিক্রয় করবার জন্যই দেশ ছেড়ে এখানে আসি এবং যেখানে অশ্ব বিক্রয়ের সম্ভাবনা দেখি সেখানে যাই। সব অশ্ব বিক্রয় হলে দেশে ফিরে যাই।'

'প্রতি বৎসর আসেন ?'

'দুই তিন বৎসরে আসি।'

'উত্তম। এবার অশ্ব দেখান।'

'আসুন।'

অর্গল খুলিয়া সকলে বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্বগুলি এতক্ষণ যথেচ্ছা বিচরণ করিতেছিল, এখন তাহাদের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। যাহারা দূরে ছিল তাহারা মনোরম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া ফিরিয়া তাকাইল। নিকটস্থ অশ্বগুলি কিছুক্ষণ ব্যায়তনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের কাছে আসিতে লাগিল ; কেহ কেহ নাসামধ্যে মৃদু হর্ষধ্বনি করিল। যে ঘোড়াগুলি বাঁধা ছিল—বোধহয় বণিকদের নিজস্ব ব্যবহারের ঘোড়া—তাহারা পদদাপ করিয়া আগ্রহ জ্ঞাপন করিল।

কয়েকটি ঘোড়া কাছে আসিলে বণিক মুখে একপ্রকার শব্দ করিল, ঘোড়াগুলি সঙ্গে সঙ্গে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া পড়িল। বণিক মুখে আর একপ্রকার শব্দ করিল, ঘোড়াগুলি তিন কদম পিছু সরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বণিক বলিল—'শিক্ষিত ঘোড়া। মানুষের মত বুদ্ধিমান, যা শেখাবেন তাই শিখবে।'

বিগ্রহ ও অনঙ্গ মুগ্ধভাবে ঘোড়াগুলির পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহাদের যেমন সুঠাম আকৃতি, চোখের দৃষ্টিতে তেমনই বুদ্ধি জ্বলজ্বল করিতেছে। সহসা অনঙ্গ একটি দুগ্ধশুভ্র অশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—'দেখ্ দেখ্, ওর নাক দিয়ে যেন দিব্যজ্যোতি বেরুচ্ছে!'

বিগ্রহ হাসিয়া বলিলেন—'বেশ, তুই ওটা নে, নাম রাখিস দিব্যজ্যোতি।'

অনঙ্গ বলিল—'না, তুই ওটা নে।'

'বেশ।' বলিয়া বিগ্রহ শ্বেত অশ্বটির কাছে গেলেন। তাহার কপালে হাত রাখিতেই সে স্নেহভরে হ্রেষাধ্বনি করিল।

বণিক বলিল—'আপনাকে ও প্রভু বলে স্বীকার করেছে। স্বীকার না করলে মুখ ফিরিয়ে নিত।'

বিগ্রহ বলিলেন—'ওর দিব্যজ্যোতি নামই রইল।—অনঙ্গ, তুই এবার নিজের ঘোড়া পছন্দ কর।'

'আমি এই লাল ঘোড়াটা নিলাম' বলিয়া অনঙ্গ একটি পাটলবর্ণ অশ্বের গ্রীবায় হাত রাখিল। অশ্ব মুখ ফিরাইয়া লইল না, বরং অনঙ্গের দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া নাসামধ্যে আনন্দধ্বনি করিল।

বিগ্রহ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি নাম রাখবি?'

অনঙ্গ বলিল—'রোহিতাশ্ব।'

অতঃপর বণিককে অশ্বের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'সাদা ঘোড়ার দাম দশ স্বর্ণ-দীনার, লাল ঘোড়ার দাম আট স্বর্ণ-দীনার।'

বিগ্রহ প্রশ্ন করিল—'দামে তফাৎ কেন?'

বণিক বলিল—'সাদা ঘোড়া রাজাদের বাহন, তাই দাম বেশি।'

তখন ঘোড়া দুটির মুখে বল্গা লাগাইয়া বেষ্টনীর বাহিরে আনা হইল। ঘোড়াডোম তাহাদের পিঠে পর্যয়ণ বাঁধিয়া দিল। বণিককে অশ্বের মূল্য দিয়া দুই বন্ধু ঘোড়ার পিঠে উঠিলেন।

এই সময় সূর্য দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। বণিক তাহা দেখিয়া একজন সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিল; সঙ্গী পট্টাবাসের ভিতর হইতে একটি পট্টিকা আনিয়া মুক্ত আকাশের তলে বিছাইয়া দিল; তারপর সকলে তাহার উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইল। বিগ্রহ ও অনঙ্গ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন তাহারা এক বিচিত্র প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে। সকলে একসঙ্গে নতজানু হইতেছে, মাটিতে মাথা ঠেকাইতেছে, উরুতে হাত রাখিয়া ন্যুব্জ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটস্বরে অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পড়িতেছে।

অনঙ্গ ও বিগ্রহ বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। ঘোড়াডোমটা বোধহয় এই বিদেশীদের আচার-ব্যবহার অবগত ছিল, সে চুপিচুপি বলিল—'ওরা পূজা করছে।'

পূজা! এ কি রকম পূজা? ফুল নাই, নৈবেদ্য নাই—পূজা! কিছুক্ষণ ইহাদের ক্রিয়া-কলাপ নিরীক্ষণ করিয়া বিগ্রহ ও অনঙ্গ ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া তাহাদের নগরের দিকে চালিত করিলেন। ঘোড়া দুটি কপোত-সঞ্চারী গতিতে যেন উড়িয়া চলিল।

চলিতে চলিতে অনঙ্গ একসময় বলিল—'বণিকদের ভাবগতিক খুব স্বাভাবিক নয়।'

বিগ্রহ বলিলেন—'বিদেশীদের আচার-আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয়।'

'আমি তা বলছি না। ঘোড়ার ব্যাপার করাই ওদের প্রধান উদ্দেশ্য মনে হয় না।'

'প্রধান উদ্দেশ্য তবে কী?'

'হয়তো গুপ্তচর বৃত্তি। পশ্চিমে বিধর্মী বর্বরজাতি ঢুকছে। এরা তাদের চর হতে পারে।'

বিগ্রহ হাসিয়া উঠিলেন—'তোর মন বড় সন্দিগ্ধ। সে যাক, এদিকের সংবাদ কি বল। তোর গৃহস্বামীর শ্যালিকাটি কি বেশ নাদুস নুদুস?'

অনঙ্গ বলিল—'নাদুস নুদুস নয়— ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা।'*

দুই বন্ধু তখন হাস্য পরিহাসের ফাঁকে ফাঁকে কাজের কথা আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন।

পাঁচ

তারপর একটি একটি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। নব-বসন্ত যেন একটি একটি করিয়া তাহার শতদল উন্মোচন করিতেছে।

কিন্তু বসন্তের এই নবোন্মীলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি নাই। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ অতিশয় ব্যস্ত। একদিকে স্বয়ংবর সভা নির্মাণ, অন্যদিকে প্রত্যাসন্ন রাজবৃন্দ ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের জন্য স্কন্ধাবার মণ্ডপ রচনা, রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক নৃত্যগীত বিলাসব্যসনের ব্যবস্থা। নর্মদার তীর ধরিয়া বস্ত্রনগরী গড়িয়া উঠিতেছে। লক্ষ্মীকর্ণ সমস্ত কার্য পরিদর্শন করিতেছেন, আবার চুপি চুপি শিল্পশালায় গিয়া গুপ্ত শিল্পকার্য দেখিয়া আসিতেছেন। শিল্পীকে ধমক দিতেছেন, মন্ত্রীদের তাড়না করিতেছেন, কর্মীদের গালাগালি দিতেছেন। কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই।

লম্বোদর ও তাহার অধীনস্থ চরগণও ব্যস্ত। তাহারা যেন সহস্রাক্ষ হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। কোন্ বণিক বিদিশা হইতে বিক্রয়ার্থ বহুসংখ্যক অসি আনিয়াছে, তাহার উপর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিদিশার অসি অতি বিখ্যাত, এ অসি হাতে পাইলে কাপুরুষও সিংহ হয়। ওদিকে উজ্জয়িনী হইতে এক দল নট-নটী আসিয়া নগরের এক রম্যোদানে আসর বাঁধিয়াছে; দলে দলে নাগরিকেরা কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র ভবভূতির উত্তররাম মালতীমাধব বিশাখাদত্তের মুদ্রারাক্ষস অভিনয় দেখিতে যাইতেছে। কিন্তু যাযাবর নট-সম্প্রদায় সর্বকালেই রাজপুরুষদের সন্দেহভাজন, ইহাদের কোনও গোপন অভিসন্ধি আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। লম্বোদর দ্বিপ্রহরে কখনও ঘরে আসে কখনও ঘরে আসে না; রাত্রিটুকু কোনও মতে ঘরে কাটাইয়া প্রভাত হইতে না হইতে চলিয়া যায়।

রাজপুরীর অবরোধ অংশে কিন্তু তেমন ব্যস্ততা নাই। ভরা নদীর মাঝখান দিয়া যখন খরস্রোত প্রবাহিত হয় নদীর দুই তীরে তখন সামান্য আবর্ত মাত্র দেখা যায়। বীরশ্রী ভগিনীকে লইয়া প্রত্যহ মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিতে যান, এ ছাড়া অন্য কোনও তৎপরতা নাই। যৌবনশ্রীর আচরণ পূর্বের মতই ধীর ও শান্ত; কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় চোখ দুটিতে যেন একটু চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। চোখ দুটি যেন সর্বদাই চকিত হইয়া আছে। যৌবনশ্রী মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু বীরশ্রী তাঁহার চোখের প্রশ্ন শুনিতে পান—আবার কবে দেখা হবে? বীরশ্রী স্বামীকে গিয়া খোঁচা দেন—কোথায় গেল বিগ্রহ? তার সন্ধান নিতে হবে না?—জাতবর্মা কী উপায়ে বিগ্রহপালের সন্ধান করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া শ্বশুরকে গিয়া বলিলেন—আমি নগরভ্রমণে যাব। শ্বশুর বলিলেন—ভাল, দশজন পার্শ্বচর রক্ষী সঙ্গে দিচ্ছি। জাতবর্মা হতাশ হইয়া পুনরায় অবরোধে ফিরিয়া আসেন। দশজন সঙ্গী লইয়া বিগ্রহপালকে খুঁজিতে বাহির হইলে নগরে কাহারও জানিতে বাকি থাকিবে না, সর্বাগ্রে শ্বশুর মহাশয় জানিতে

---

* স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যা নিতম্বে চ বিশালতা।
মধ্যে ক্ষীণা ভবেদ যা সা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা॥

পারিবেন। অণ্ড দ্রব হইয়া যাইবে।

রন্তিদেবের গৃহে বিগ্রহপালও ছটফট করিতেছেন। তীরে আসিয়াও তরী ঘাটে ভিড়িতেছে না। একবার দেখিয়া যাহার মূর্তি চিত্তপটে আঁকা হইয়া গিয়াছে সে যেন ছলনা করিয়াই আবার দেখা দিতেছে না। বিগ্রহপালের উষ্ণ নিশ্বাসে রন্তিদেবের গৃহমারুত আতপ্ত হইয়া উঠিল।

লম্বোদরের গৃহে কিন্তু শীতল মলয়ানিল বহিতেছিল, গৃহে যেন প্রচ্ছন্ন উৎসবের ছোঁয়া লাগিয়াছিল। অনঙ্গ নদীর ঘাট হইতে পাকা রুই মাছ আনিয়া রাই-সরিষার ঝাল রাঁধিয়া বেতসী ও বান্ধুলিকে খাওয়াইয়াছে। বেতসীর দেহ-মন হিমশীর্ণা লতার ন্যায় কিশলয়-রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। এখনও বাহিরে কিছু দেখা যায় না ; কিন্তু তাহার প্রাণে আশা জাগিয়াছে, আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, জীবনের শত ক্ষুদ্র সুখ ভোগ করিবার স্পৃহা জন্মিয়াছে। অনঙ্গ কি ইন্দ্রজাল জানে ? কেবলমাত্র তাহার আবির্ভাবেই যেন বেতসীর জীবনের নিম্নগামী ধারা অবরুদ্ধ হইয়াছে।

আর বান্ধুলি ? যেন জন্মান্ধ যুবতী হঠাৎ একদিন প্রভাতে চক্ষু মেলিয়া রূপরসময়ী ধরিত্রীকে দেখিতে পাইয়াছে ! যেমন বিস্ময় তেমনি আনন্দের অবধি নাই। একদিন ছিল যখন অবস্থাবশে লম্বোদরকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না ; কিন্তু এখন তাহাকে কুচিকুচি করিয়া কাটিলেও সে অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। একজন মানুষ কোথা হইতে আসিয়া তাহার মনের কৌমার্য হরণ করিয়া লইয়াছে। যাহাকে প্রথম দর্শনে বুকের মধ্যে হাসির উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল সে ছাড়া পৃথিবীতে অন্য পুরুষ নাই, দেহ মন সমস্তই তাহার মধ্যে একাকার হইয়া গিয়াছে।

অনঙ্গ আপন মনে মূর্তি গড়ে, বান্ধুলি অদূরে বসিয়া দেখে। কখনও শিল্পকর্মের দিকে চাহিয়া থাকে, কখনও শিল্পীর পানে। অনঙ্গ সহসা চোখ তুলিলে চোখে চোখ ধরা পড়িয়া যায়। বান্ধুলি মুখ ফিরাইয়া হাসে। অনঙ্গ বলে—'তুমি আমাকে দেখে হাসো কেন বল দেখি ? আমি কি সঙ ?'

বান্ধুলি উত্তর দেয় না, নড়িয়া চড়িয়া বসে ; তাহার অধরে হাসি আরও গাঢ় হয়।

বেতসী প্রবেশ করিয়া বলে—'মধুকর-ভাই, তোমার পুতুল কেমন হল দেখি।—ওমা, কী সুন্দর !'

এই তিনজনের মধ্যে একটি রস-নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, লম্বোদর তাহার কোনও খবরই রাখে না। বেতসী অনঙ্গকে মধুকর-ভাই বলিয়া ডাকে, অনঙ্গ বেতসীকে বলে বহিন। বান্ধুলিকে সে নাম ধরিয়া ডাকে, বান্ধুলি অনঙ্গকে নাম ধরিয়া ডাকে না, সম্বোধনটা এড়াইয়া যায়।

বেতসী প্রশ্ন করে—'এ কার মূর্তি ভাই ?'

অনঙ্গ বলে—'অনঙ্গ-বিগ্রহ।'

বিতস্তিপ্রমাণ মূর্তি। হাতে ধনুর্বাণ, আকুঞ্চিত-সব্যপাদ হইয়া তীর ছুঁড়িতেছে। অতি নিপুণ সূক্ষ্ম কারুকলায় মূর্তিটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মূর্তিটি গড়িতে অনঙ্গের তিনদিন লাগিল। মূর্তি প্রস্তুত হইলে তাহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া পরে আগুনে পোড়ানো হইল। তিনজনে মিলিয়া পোড়াইল। উদ্যানে মূর্তিটি শুকনা পাতার উপর রাখিয়া সযত্নে খড় ও পাতা দিয়া ঢাকা হইল, তারপর সন্তর্পণে তাহার উপর জ্বালানি কাঠ চাপা দেওয়া হইল। বেতসী প্রদীপের পলিতা দিয়া তাহাতে আগুন দিল।

তিন ঘটিকা পুড়িবার পর আগুন নিভিলে ভস্মের ভিতর হইতে মূর্তি বাহির করা হইল। মূর্তি অটুট আছে এবং পুড়িয়া পাটল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনজনে শোভাযাত্রা করিয়া মূর্তি ঘরে লইয়া গেল।

অনঙ্গ মৃন্মূর্তির চোখ মুখ আঁকিল, পাদপীঠে লিখিল—অনঙ্গ-বিগ্রহ। রঙ রসান চড়াইয়া

গ্র

মূর্তিটি করতলের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিল—'কেমন হয়েছে ? রাজকুমারীদের পছন্দ হবে ?'

বান্ধুলির চোখ আনন্দে মুদিত হইয়া আসিল ; বেতসী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল । —

বেতসীর উচ্ছ্বাস কমিলে বান্ধুলি ধরা-ধরা গলায় বলিল—'মূর্তি রাজবাটীতে নিয়ে যাই ?'

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'বেশ তো । রাজকুমারীরা যদি জানতে চান বোলো পাটলিপুত্রের কারিগরের তৈরি ।'

অপরাহ্ণে বান্ধুলি রাজবাটীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল । মূর্তিটি অতি যত্নে তুলায় মুড়িয়া উত্তরীয়ের প্রান্তে বাঁধিয়া লইল ।

দুই রাজকুমারী সেদিন দ্বিপ্রহরে নগরের কয়েকটি মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন, বৈকালে ফিরিয়া একরাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে বসিয়াছিলেন । বীরশ্রী ফন্দি করিয়াছিলেন, একটি বরমাল্য গাঁথিবেন, তারপর বরমাল্যটি যৌবনশ্রীর হাতে দিয়া দুই ভগিনী একযোগে জাতবর্মাকে আক্রমণ করিবেন, বলিবেন—ভাল চাও তো শীঘ্র বিগ্রহপালকে খুঁজে বার কর, নইলে যৌবনশ্রী তোমার গলাতেই বরমাল্য দেবে । তখন বিপাকে পড়িয়া জাতবর্মা নিশ্চয় একটা কিছু ব্যবস্থা করিবেন । শ্বশুরবাড়ি আসিলে সব জামাতাই অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, জাতবর্মাকে খোঁচা না দিলে তিনি কিছু করিবেন না ।

যৌবনশ্রী দিদির সহিত পারিয়া ওঠেন না, নিতান্ত ছেলেমানুষী জানিয়াও তিনি সম্মত হইয়াছেন । মালা গাঁথা হইতেছে ।

মালা গাঁথিতে গাঁথিতে বীরশ্রী বলিলেন—'কিন্তু যৌবনা, ও যদি সত্যি তোর মালা নেয় তখন কি হবে ?'

যৌবনশ্রী মুখ টিপিয়া হাসিলেন । দিদির সহবাসে তাঁহার একটু মুখ ফুটিয়াছে, বলিলেন—'তখন বলব, ও মালা আমার নয়, দিদি গেঁথেছে ।'

'যদি তাতেও না শোনে ?'

'তখন তুমি সামলাবে ।'

বীরশ্রী বলিলেন—'মন্দ কথা নয় । তুই মালা হাতে নিয়ে যাবি, আর আমি যাব মুগুর হাতে নিয়ে । যদি গণ্ডগোল করে মাথায় এক ঘা ।'

কিন্তু যুবতীদ্বয়ের মন্ত্রণা কার্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন হইল না, এই সময় বান্ধুলি আসিয়া উপস্থিত হইল ।

বীরশ্রী বলিলেন—'কি রে বান্ধুলি, তোর অতিথির খবর কি ?'

বান্ধুলি সলজ্জ উত্তেজনা চাপিয়া কাছে আসিয়া বসিল, একটু হাঁপাইয়া বলিল—'দিদিরানী, একটা জিনিস এনেছি । দেখবে ?'

বীরশ্রী বললেন—'কী জিনিস ? তোর অতিথিকে আঁচলে বেঁধে এনেছিস নাকি ?'

বান্ধুলি উত্তরীয়ের বাঁধন খুলিয়া মূর্তি বাহির করিল, বীরশ্রী তাহা হাতে লইয়া বলিলেন—'ওমা, এ যে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশের কারুকলা ! এ তুই কোথায় পেলি ?'

বান্ধুলি সবিভ্রম ঘাড়া বাঁকাইয়া বলিল—'অতিথি গড়েছে ।'

'সত্যি ? তোর অতিথি তো ভারি গুণী লোক—' এই পর্যন্ত বলিয়া বীরশ্রী থামিয়া গেলেন । তাঁহার চোখ পড়িল মূর্তির পাদপীঠে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা আছে—অনঙ্গ-বিগ্রহ ।

মদনমূর্তির নীচে অনঙ্গ-বিগ্রহ লেখা থাকিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই ; কিন্তু অনঙ্গ এবং বিগ্রহ দুইটা নামই বীরশ্রীর পরিচিত । তিনি চকিতে একবার বান্ধুলির মুখের পানে চাহিলেন । বান্ধুলির মুখে কিন্তু কোনও রহস্যের সঙ্কেত নাই । সে সরলভাবে বলিল—'অতিথি পাটলিপুত্রের শিল্পী ।'

'তাই নাকি ?' বীরশ্রীর সন্দেহ দৃঢ় হইল। তিনি বলিলেন—'ভারি সুন্দর অনঙ্গ-বিগ্রহ গড়েছে পাটলিপুত্রের শিল্পী। আচ্ছা, তুই পান নিয়ে আয়।'

বান্ধুলি পর্ণসম্পুট আনিতে গেল। বীরশ্রী তখন মূর্তির নীচে লেখা নাম যৌবনশ্রীকে দেখাইলেন। যৌবনশ্রীর মুখে চকিত অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। বীরশ্রী বলিলেন—'সংকেত বলেই মনে হচ্ছে। বান্ধুলি কিছু জানে না। ওর কাছে এখন কিছু ভেঙ্গে কাজ নেই। আমি বুদ্ধি বার করছি।'

বান্ধুলি পর্ণসম্পুট লইয়া আসিলে দুই ভগিনী পান মুখে দিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'দিব্যি অতিথি পেয়েছিস। নাম কি রে অতিথির ?'

বান্ধুলি নতনেত্রে বলিল—'মধুকর।'

বীরশ্রীর একটু ধোঁকা লাগিল। কিন্তু ছদ্মনাম হইতে পারে! তিনি প্রশ্ন করিলেন—'বয়স কত ?'

'তা জানি না।'

'আ গেল ছুঁড়ি! মানুষ দেখে বলতে পারিস না বুড়ো কি ছোঁড়া ?'

অপ্রতিভ বান্ধুলি বলিল—'ও—মানে—বুড়ো নয়।'

'তাহলে কত বয়স ?'

'পঁচিশ ছাব্বিশ হবে।'

'চেহারা কেমন ?'

'যাও দিদিরানী—আমি জানি না।'

'চেহারা কেমন জানিস না! কী ব্যাপার বল দেখি! তোর রকম-সকম ভাল মনে হচ্ছে না।'

বান্ধুলি রক্তবর্ণ হইয়া বলিল—'আমি—চেহারা ভালই—মানে মন্দ না। রঙ ফরসা—কোঁকড়া চুল—বড় বড় চোখ—'

'লম্বোদরের মত নয় ?'

বান্ধুলি ঠোঁটে আঁচল চাপা দিল, বলিল—'না।'

বীরশ্রী ভাবিলেন, বোধ হইতেছে অনঙ্গপালই বটে। তিনি বলিলেন—'আচ্ছা, এই পুতুলটি আমি নিলাম।' বলিয়া কান হইতে অবতংস খুলিয়া বান্ধুলির হাতে দিলেন—'শিল্পীকে দিস, আমার পুরস্কার।'

যদি অনঙ্গ হয়, অবতংস চিনিতে পারিবে, নৌকাযাত্রা কালে অনেকবার দেখিয়াছে।

বান্ধুলি গদ্‌গদ মুখে কর্ণাভরণ অঞ্চলে বাঁধিল। বীরশ্রী বলিলেন—'তুই আর এখানে থেকে কি করবি, বাড়ি ফিরে যা। কাল সকালে আসিস্ কিন্তু, অতিথি নিয়ে মেতে থাকিস না। কাল আমরা দুপুরবেলা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে পূজা দিতে যাব। তুইও যাবি।'

'আচ্ছা দিদিরানী।'

ছয়

পরদিন মধ্যাহ্নের দুই তিন দণ্ড পূর্বে অনঙ্গ ও বিগ্রহ যথাক্রমে রোহিতাশ্ব ও দিব্যজ্যোতির পিঠে চড়িয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির অভিমুখে চলিয়াছেন। সঙ্গে একজন ভৃত্য আছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে।

নগরের উপান্ত হইতে পূর্বদিকে পথ চলিয়া গিয়াছে। নগরসীমায় পৌঁছিলে ভৃত্য

বলিল—'এই পথে সিধা চলে যান, তিন চার ক্রোশ গেলেই ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির পাবেন।' বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

বিটপচ্ছায়াচিত্রিত পথ ; দক্ষিণদিক হইতে জলকণাস্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। দুটি অশ্ব যুগ্ম তীরের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। বিগ্রহপাল প্রাণশক্তির আতিশয্যে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

'এতক্ষণে মনে হচ্ছে বেঁচে আছি। তোর মনে হচ্ছে না ?' বলিয়া অনঙ্গের পানে হর্ষোৎফুল্ল মুখ ফিরাইলেন।

অনঙ্গ বলিল—'আমার বরাবরই মনে হচ্ছে।'

বিগ্রহ আবার উচ্চহাস্য করিলেন—'হাঁ, তুই তো তোর মানসীকে পেয়েছিস। কিন্তু তোকে বিশ্বাস নেই। হয়তো কার্যোদ্ধারের জন্য প্রেমের অভিনয় করছিস।'

অনঙ্গ বলিল—'না ভাই, এ সত্যি প্রেম। প্রথমে ভেবেছিলাম একটু রঙ্গ-রসিকতা করে কাজ উদ্ধার করব। কিন্তু এমন ওর স্বভাব, না ভালবেসে উপায় নেই।'

'তা এখন কি করবি ?'

'তুই যা করবি আমিও তাই করব, ঘোড়ার পিঠে তুলে প্রস্থান।'

'ওকে কিছু বলেছিস নাকি ?'

'এখনও বলিনি, তাক্ বুঝে বলব। এখন শুধু হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'তুই একলা খাচ্ছিস ? না সেও হাবুডুবু খাচ্ছে ?'

অনঙ্গ অধর মুকুলিত করিয়া বিগ্রহের দিকে সহাস্য কটাক্ষপাত করিল, উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না।

এইভাবে লঘু বাক্যালাপে দুইজনে পথ অতিক্রম করিলেন। পথে পথিকের বাহুল্য নাই। অশ্বাচ্ছাদিত পথ ক্রমশ উপরে উঠিতে উঠিতে নর্মদা প্রপাতের সন্নিকটে শেষ হইয়াছে। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই দুইজনে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

নর্মদা যেখানে প্রস্রবণের আকারে অন্ধকার গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার অনতিনিম্নে উচ্চ পাষাণ-চত্বরের উপর শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির। মন্দিরে কয়েকজন পূজারী আছেন, তাঁহারা অশ্বারোহীদের আসিতে দেখিয়া চত্বরের উপর সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। এখানে পূজার্থী যাত্রীর যাতায়াত বেশি নয়, তবে পূজা পার্বণের সময় মেলা হয়।

অশ্বারোহিদ্বয় মন্দিরের নিকট থামিলেন না, আরও অগ্রসর হইয়া গুহার মুখের কাছে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। বিপুল গুহা-মুখ হইতে শান্ত ধারায় জল বাহির হইতেছে, স্রোতের উন্মাদনা নাই। যেন নিদ্রোত্থিত অনন্তনাগ ধীর সঞ্চারে বিবর হইতে নির্গত হইতেছে। পশ্চাতে মেখল পর্বত স্কন্ধের পর স্কন্ধ তুলিয়া গুহার পটভূমিকা রচনা করিয়াছে।

গুহার পাশে শীলাকীর্ণ অসমতল ভূমির উপর এখানে ওখানে পাহাড়ী গাছপালা জন্মিয়াছে, গুল্ম রচনা করিয়াছে। উপরন্তু একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা আছে। মন্দিরের পূজারীরা যত্ন করিয়া অনুর্বর ভূমিতে আম্র, জম্বু, বকুল, কদম্ব প্রভৃতি ফলমূলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া বোধ করি কর্মবিরল দিবসের জড়তা অপনোদন করিয়াছেন।

অনঙ্গ ও বিগ্রহ একটি গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিলেন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু নবোদ্‌গতপল্লব গাছের নীচে একটু ছায়া আছে।

বিগ্রহ বলিলেন—'ওরা এখনও আসেনি। ততক্ষণ কি করা যায় ?'

দুইজনে গুহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। অনঙ্গ বলিল—'স্নান করলে কেমন হয় ?'

বিগ্রহ স্নিগ্ধ শীতল জলের পানে সাভিলাষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—'স্নান! মন্দ হয় না। কিন্তু অন্য বস্ত্র কৈ ?'

অনঙ্গ বলিল—'নির্জন স্থানে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করলে ক্ষতি কি ? কেউ দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু ওরা যদি এসে পড়ে ?'

চিন্তার কথা বটে। বিবস্ত্র অবস্থায় মহিলাদের কাছে ধরা পড়িলে লজ্জার অবধি থাকিবে না। অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'এক কাজ করা যেতে পারে। গুহার ভিতরে অন্ধকার, পাশ দিয়ে ভিতরে যাবার সংকীর্ণ পাড় আছে। ভিতরে গিয়ে স্নান করা যায়। আমি যখন স্নান করব তুই বাইরে পাহারা দিবি, তুই যখন স্নান করবি আমি পাহারা দেব।'

এই সময় পিছনে কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'ভদ্র, আপনারা কি গুহায় প্রবেশের অভিলাষ করেছেন ?'

মন্দিরের পূজারী। কপালে রক্তচন্দনের তিলক, ক্ষৌরিত মস্তকের অধিকাংশ জুড়িয়া স্থূল শিখা, কিন্তু সৌম্য সহাস্য মুখশ্রী। অনঙ্গ বলিল—'আপনি বুঝি মন্দিরের পণ্ডপুরুষ ! আমরা যদি গুহায় প্রবেশ করে স্নান করি, আপত্তি আছে কী ?'

পণ্ডিত বলিলেন—'আপত্তি কিসের ? তবে গুহার ছাদে বহু মধুমক্ষিকার চক্র আছে, তারা বিরক্ত হতে পারে।'

'মধুমক্ষিকা বিরক্ত হবে ?'

'হতে পারে। তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। তারা রুষ্ট হলে হস্তীরও প্রাণ সংশয় হয়।'

অনঙ্গ বলিল—'তবে থাক। —গুহার বাইরে এখানে যদি স্নান করি ?'

পণ্ডিত আবার হাসিলেন—'করতে পারেন। আপনারা মনে হচ্ছে বিদেশী। শোনেননি কি নর্মদার জল কর্কটপূর্ণ ? কর্কটেরা এই গুহার মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করে, তাই গুহার সন্নিকটে কর্কটের প্রাদুর্ভাব বেশি।'

'তবে কাজ নেই, স্নান না করলেও চলবে।'

পূজারী অমায়িকভাবে বলিলেন—'আপনারা মন্দিরে পূজা দেবার আগে স্নান করে শুচি হতে চান, এই তো ? কিন্তু স্নানের প্রয়োজন নেই ; নর্মদার জল অতি পবিত্র, মাথায় ছিটা দিলেও শুদ্ধ হবেন। —আসুন।'

মন্দিরে পূজা দিবার কথা বিগ্রহপালের মনে আসে নাই, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'অবশ্য অবশ্য। মন্দিরে পূজা দিতে হবে। কিন্তু পূজার উপচার তো কিছু সঙ্গে আনা হয়নি। আপনি এই সামান্য মূল্য নিয়ে আমাদের পূজার আয়োজন করে দিন।'

বিগ্রহ পণ্ডিতকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। পণ্ডিত অতিশয় হৃষ্ট হইয়া দুইজনের মাথায় নর্মদার পবিত্র জল ছিটাইয়া দিলেন, তারপর মন্দিরে লইয়া গিয়া যথোপচার পূজার্চনা সম্পন্ন করাইলেন।

পূজান্তে মন্দিরের চত্বর হইতে অবতরণ করিতে করিতে বিগ্রহ দেখিলেন পথ দিয়া দুইটি রথ অগ্রপশ্চাৎ আসিতেছে। প্রথম রথটি চালাইতেছেন যৌবনশ্রী, পার্শ্বে বীরশ্রী উপবিষ্ট। পিছনের রথে পূজোপচারসহ বান্ধুলি।

দুই বন্ধু উৎফুল্ল কটাক্ষ বিনিময় করিলেন। তারপর ক্ষিপ্রপদে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন।

সোপানের পদমূলে দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। বীরশ্রী সর্বাগ্রে ছিলেন, তাঁহার মুখে গূঢ় হাসি স্ফুরিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পিছনে যৌবনশ্রী দিদির আঁচল চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ পর্যায়ক্রমে রক্তিম ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল। সর্বশেষে বান্ধুলি সোনার থালায় পূজোপচার লইয়া বিভক্ত ওষ্ঠাধরে অনঙ্গের পানে চাহিয়া ছিল।

বীরশ্রী বিগ্রহপালকে লক্ষ্য করিয়া ছলনাভরে বলিলেন—'ভদ্র, আপনাকে যেন কোথায়

দেখেছি মনে হচ্ছে !'

বিগ্রহ যৌবনশ্রীর উপর চক্ষু রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—'ভদ্রে, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ! আমি যে পলকের তরেও আপনাদের ভুলতে পারিনি।'

বীরশ্রী বলিলেন—'মনে পড়েছে। আপনার নাম কী যেন—'

'অধীনের নাম রণমল্ল।'

এই সময় যৌবনশ্রী একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নত করিয়া ফেলিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'নামটা নূতন নূতন ঠেকছে, কিন্তু মানুষটা সেই।' অনঙ্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'আপনি বুঝি বান্ধুলির বন্ধু মধুকর ?'

অনঙ্গ দশনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাত জোড় করিল।

বীরশ্রী সোপানের ঊর্ধ্বদিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'আর না, পুরোহিত মহাশয় নেমে আসছেন। আপনারা কি এখনই নগরে ফিরে যাবেন ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'আপাতত কিছুক্ষণ বৃক্ষ-বাটিকায় বিশ্রাম করবার ইচ্ছা আছে।'

'ভাল। আমরাও পূজা দিয়ে কিছুক্ষণ বৃক্ষ-বাটিকায় বিশ্রাম করব।—আয় বান্ধুলি, হাঁ করে পরপুরুষের পানে তাকিয়ে থাকতে নেই।'

বান্ধুলি লজ্জায় ঘাড় ফিরাইয়া ভগিনীদ্বয়ের অনুসরণ করিল। ততক্ষণে পুরোহিত মহাশয় নামিয়া আসিয়া মহা সমাদর সহকারে পূজার্থিনীদের উপরে লইয়া গেলেন।—

দুই দণ্ড পরে পূজার্থিনীরা মন্দির হইতে নামিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ রাজ-সারথি সম্পৎ দ্বিতীয় রথটি চালাইয়া আসিয়াছিল ; দেখা গেল সে রথ দুটিকে এক বৃক্ষের ছায়ায় লইয়া গিয়াছে এবং অশ্বগুলিকে কিছু ঘাস দিয়া নিজে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছে। যুবতীরা তখন নিঃশঙ্কে বৃক্ষ-বাটিকার দিকে চলিলেন।

বৃক্ষ-বাটিকার পুরোভাগে এক চম্পক বৃক্ষতলে অনঙ্গ দাঁড়াইয়া ছিল, সসম্ভ্রমে বীরশ্রীকে সম্বোধন করিল—'দেবি, যে ছদ্মবেশী চোরকে আপনারা খুঁজছেন, সে ওই আমলকী বৃক্ষতলে লুকিয়ে আছে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'ভাল। তুমি বুঝি এই কুঞ্জবনের দ্বারপাল ? আপাতত এই মেয়েটাকে তুমি আটক রাখ, ওকে আমাদের এখন প্রয়োজন নেই। ফেরবার পথে ওকে আবার অক্ষতদেহে আমার কাছে সমর্পণ করবে।'

অনঙ্গ যুক্তকরে বলিল—'যথা আজ্ঞা দেবি।'

বীরশ্রী তখন যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া কুঞ্জবনে প্রবেশ করিলেন।

অনঙ্গ দেখিল, প্রণয় সম্ভাষণের পক্ষে স্থান কাল সমস্তই অনুকূল। সে আর দ্বিধা করিল না। বান্ধুলির সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—'তুমি আমার বন্দিনী।'

বান্ধুলি হাসিয়া গলিয়া পড়িল। তারপর যথাসম্ভব আত্মসম্বৃত হইয়া বলিল—'আপনি কি করে এখানে এলেন ? আপনার সঙ্গে উনি কে ?'

অনঙ্গ বলিল—'কাল বলেছিলে তোমরা এখানে আসবে, মনে নেই ? কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক। তুমি আমার বন্দিনী। কিন্তু তোমাকে বেঁধে রাখবার পাশ রজ্জু উপস্থিত আমার কাছে নেই। সুতরাং—' অনঙ্গ বান্ধুলির হাত ধরিল—'চল, ওই গাছতলায় চুপটি করে আমার পাশে বসে থাকবে।'

প্রণয়ীর প্রথম করস্পর্শে নাকি প্রণয়িনীর দেহে হর্ষোল্লাস জাগিয়া ওঠে, মন রাগপ্রদীপ্ত হয়। কিন্তু বান্ধুলির মনে হইল তাহার সারা দেহ যেন জুড়াইয়া গেল, স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সে শুদ্ধশান্ত চিত্তে অনঙ্গের পাশে বৃক্ষতলে গিয়া বসিল। তাহার ডান হাতখানি অনঙ্গের হাতে ধরা রহিল।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব ; তারপর অনঙ্গ বলিল—'বান্ধুলি, আমি যদি তোমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে অনেক দূর দেশে নিয়ে যাই, তুমি যাবে ?'

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। কিন্তু বান্ধুলি চিন্তা করিল না, ক্ষণেকের জন্যও দ্বিধা করিল না, সরল অপ্রগল্‌ভ চক্ষু দুটি অনঙ্গের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—'যাব।'

'সব ছেড়ে আমার সঙ্গে যেতে ভয় করবে না ?'

'না।'

অনঙ্গ বান্ধুলিকে আরও কাছে টানিয়া লইল, চুপিচুপি বলিল—'বান্ধুলি, তুমি এখন কোনও কথা জানতে চেও না। আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপুরীতে এসেছি ; হঠাৎ একদিন আমাদের চলে যেতে হবে। তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, পাটলিপুত্রে ফিরে গিয়ে বিয়ে হবে।'

বান্ধুলি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। সে বুদ্ধিহীনা নয়, আজিকার উপপত্তি দেখিয়া বুঝিয়াছিল বীরশ্রীর সহিত ইহাদের পূর্ব হইতে পরিচয় আছে, ভিতরে ভিতরে নিগূঢ় কোনও ব্যাপার চলিতেছে। কিন্তু তাহার মনে কোনও কৌতূহল জাগিল না। যে-মানুষটিকে সে চায় সেই মানুষটিও তাহাকে একান্তভাবে চায় এই পরম চরিতার্থতার আনন্দেই সে বিভোর হইয়া রহিল।

কুঞ্জবনের অভ্যন্তরে একটি সহকার বৃক্ষতলে আর একপ্রকার প্রণয় সম্ভাষণ চলিতেছিল। চূতাঙ্কুরের গন্ধে বিহ্বল ভ্রমরের মত বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীর কর্ণে গুঞ্জন করিতেছিলেন। নব অনুরাগের অর্থহীন গদভাষণ। যৌবনশ্রী বৃক্ষতলে প্রস্তর বেদিকার উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে শুনিতেছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার নিশ্বাস আপনি নিরুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, গণ্ডে ও বক্ষে রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিতেছিল। বীরশ্রী তাঁহাকে বিগ্রহপালের কাছে রাখিয়া অশোক পুষ্পের অন্বেষণ ব্যপদেশে অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিলেন।

প্রণয়ীর মনে সময়ের জ্ঞান নাই ; পলকে রাত্রি পোহাইয়া যায়, পলকের বিরহ যুগান্তকাল বলিয়া মনে হয়। বেলা তৃতীয় প্রহরে বীরশ্রী যখন সহকার বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখিলেন যৌবনশ্রী তেমনই নতমুখে বসিয়া আছেন এবং বিগ্রহপাল তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি দুই করপুটে ধরিয়া গাঢ়স্বরে প্রলাপ বকিতেছেন।

বীরশ্রী প্রণয়ীযুগলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেও তাঁহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন না। তখন তিনি বলিলেন—'বেলা যে তিন পহর হল, এখনও তোমাদের মনের কথা বিনিময় হল না ?'

দুইজনে চমকিয়া উঠিলেন। বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীর হাত ছাড়িয়া বীরশ্রীর দিকে ফিরিলেন ; করুণ হাসিয়া বলিলেন—'দিদি, বিনিময় হল কৈ ? আমিই কেবল মনের কথা বলে গেলাম, উনি কিছুই বললেন না।'

বীরশ্রী বলিলেন—'আচ্ছা, সে আর একদিন হবে। আজ দেরি হয়ে গেছে, এখনি হয়তো সম্পৎ সারথি খুঁজতে আসবে। তার কাছে ধরা পড়া বাঞ্ছনীয় নয়।'

বিগ্রহ এবার বীরশ্রীর হাত ধরিলেন—'দিদি, আবার কবে দেখা হবে ?'

বীরশ্রী হাসিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন—'যথাসময় জানতে পারবে। আয় যৌবনা।'

যৌবনশ্রী ও বান্ধুলিকে লইয়া বীরশ্রী চলিয়া গেলেন। দুই বন্ধু কুঞ্জবনে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে রথের ঘর্ঘরধ্বনি দূরে মিলাইয়া গেল। বিগ্রহপাল নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'চল অনঙ্গ, আমরাও ফিরি।'

অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—'ভাব হল ?'

বিগ্রহ হাসিলেন, প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন—'তোর বান্ধুলিকে দেখলাম। যা চাস তাই পেয়েছিস। কতদূর অগ্রসর হলি ?'

অনঙ্গ বলিল—'অনেক দূর। আমরা প্রস্তুত। এখন তোরা প্রস্তুত হলেই যাত্রা করা যেতে পারে।'

বিগ্রহ বিমর্ষভাবে বলিলেন—'আমাদের প্রস্তুত হতে সময় লাগবে।'

সাত

বেশি সময় কিন্তু লাগিল না। অমাবস্যা তিথি পূর্ণ হইবার পূর্বেই যৌবনশ্রীর মুখ ফুটিল। হৃদয় যেখানে সহস্র কথার ভারে পূর্ণ সেখানে মুখ কতদিন নীরব থাকে?

ত্রিপুরেশ্বরী সংঘটনের পরদিন প্রাতঃকালে অনঙ্গ রোহিতাশ্বের পিঠে চড়িয়া শোণের ঘাটের দিকে চলিল। নৌকাটা কী অবস্থায় আছে দেখা আবশ্যক, কারণ প্রত্যাবর্তনের দিন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে।

নৌকা সচল সক্রিয় অবস্থায় আছে, গরুড় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নৌকাতেই বিরাজ করিতেছে। জাতবর্মার নৌকাটাও আছে, কিন্তু তাহাতে মাঝিমাল্লা নাই। অনঙ্গ গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিল—'যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত আছ?'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, এই দণ্ডে যাত্রা করতে পারি।'

অনঙ্গ সন্তুষ্ট হইল এবং গরুড়কে কিছু অর্থ দিয়া ফিরিয়া চলিল। গরুড় নদীতে সূতা ফেলিয়া একটা মাঝারি আয়তনের মাছ ধরিয়াছিল, অনঙ্গ সেটা সঙ্গে লইল।

দ্বিপ্রহরে খাইতে বসিয়া অনঙ্গ বেতসীকে জিজ্ঞাসা করিল—'বহিন, এখন তোমার শরীর কেমন?'

বেতসী কৃতজ্ঞস্বরে বলিল—'তোমার রান্না মাছ খেয়ে অনেক ভাল আছি ভাই।'

অনঙ্গ বলিল—'আজকের মাছটা তুমিই রাঁধো। দেখি কেমন রাঁধতে শিখেছ।'

বেতসী আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া বলিল—'আচ্ছা।'

আহারের পর দ্বার ভেজাইয়া দিয়া অনঙ্গ শয়ন করিল। একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, পায়ে লঘু করস্পর্শে সে চমক ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল। নিঃশব্দে বান্ধুলি ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

অনঙ্গ বলিল—'রাজবাটী থেকে কখন এলে?'

বান্ধুলি ষড়যন্ত্রকারিণীর মত চুপি চুপি বলিল—'এইমাত্র। দিদিরানী বললেন আজ সূর্যাস্তের পর তিনি প্রিয়সখীকে নিয়ে রেবার তীরে বেড়াতে আসবেন।'

অনঙ্গ চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—'রেবার তীরে—কোথায়?'

'রাজবাটীর পিছন দিকে।'

'আচ্ছা।' অনঙ্গ হাসিয়া বান্ধুলির হাত ধরিল—'তুমি কাউকে কিছু বলনি?'

বান্ধুলি দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল—'না।'

'বহিন কোথায়?'

'শুয়েছে।'

'আর—কুটুম্ব?'

'কুটুম্ব খেতে এসেছিল, খেয়ে আবার বেরিয়েছে।'

অনঙ্গ বান্ধুলিকে টানিয়া পাশে বসাইল। দুইজনে পরস্পরের মুখের পানে স্মিত-বিগলিত মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

'বান্ধুলি, আমি তোমাকে চুরি করে নিয়ে পালালে বহিন রাগ করবে না?'

বান্ধুলি ক্ষণেক নতনেত্রে থাকিয়া বলিল—'না, সুখী হবে।'

'সুখী হবে!'

'হাঁ। দিদি আমাকে ভালবাসে ; আমি সুখী হলে দিদিও সুখী হবে।'

'আর—লম্বোদর ?'

বান্ধুলির মুখে একটু অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল ; সে ঘাড় হেঁট করিয়া হাতের নখ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

'লম্বোদর সুখী হবে না—কেমন ?'

বান্ধুলি চোখ তুলিল না, কেবল মাথা নাড়িল।

অনঙ্গ নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'বুঝেছি। একটি ভগিনীকে বিবাহ করে লম্বোদরের উদর পূর্ণ হয়নি। তুমি ভেবো না, লম্বোদরকে কদলী প্রদর্শন করব। কিন্তু কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। দিদিও না।'

'কেউ জানতে পারবে না।'

অনঙ্গ নিশ্চিন্ত হইল, বান্ধুলি প্রাণ গেলেও কাহাকেও কিছু বলিবে না।

'তুমি কি এখন রাজবাটীতে ফিরে যাবে ?'

'হাঁ। দিদিরানী যেতে বলেছেন।'

'আচ্ছা এস। রেবার তীরে আবার দেখা হবে।'

সেদিন সূর্যাস্তের পর রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্দেশে নির্জন রেবার তীরে যৌবনশ্রীর সহিত বিগ্রহপালের আবার দেখা হইল। সন্ধ্যার ঝিলিমিলি আলো নদীর উপর দিয়া লঘু পদক্ষেপে পশ্চিম দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে, রাত্রি আসিয়াছে রত্ন-খচিত নিবিড় নীল উত্তরীয়ের মত ; প্রণয়ীযুগলকে স্নেহভরে আবৃত করিয়াছে।

বিগ্রহপাল আবার গাঢ়স্বরে প্রলাপ বকিলেন। যৌবনশ্রী দুটি একটি কথা বলিলেন ; কখনও 'হুঁ,' কখনও 'না'। বীরশ্রী অলক্ষিতে থাকিয়া পাহারা দিলেন, রাজপুরী হইতে দাসদাসী কেহ না আসিয়া পড়ে। অনঙ্গ ও বান্ধুলিও দূরে থাকিয়া পাহারা দিল।

তারপর দুই দণ্ড অতীত হইলে বীরশ্রী আসিয়া যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। বলিলেন—'আজ এই পর্যন্ত। আবার কাল হবে।'

পরদিন আবার ওই স্থানে প্রণয়ীযুগল মিলিত হইলেন। তার পরদিন আবার। এইভাবে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষ কাটিয়া আকাশে নবীন চাঁদের ফলক দেখা দিল। যৌবনশ্রীর হৃদয়ের মুদিত কোরকটি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে ; একটু একটু করিয়া মুখ ফুটিতেছে। দুইজনে নদীর তীরে পাশাপাশি বসিয়া থাকেন, বিগ্রহপালের মুঠির মধ্যে যৌবনশ্রীর আঙ্গুলগুলি আবদ্ধ থাকে। পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ বঙ্কিম হাসিয়া অস্ত যায়। নদীতীরের অন্ধকারে দুইটি মন যৌবন-মদগন্ধে ভরিয়া ওঠে। যৌবনশ্রী অস্ফুটস্বরে, প্রায় মনে মনে, বলেন—'আর্যপুত্র!'

আট

জাতবর্মা যৌবনশ্রীকে বলিলেন—'পূর্বরাগ অনুরাগ মিলন রসোদ্গার সবই তো হল। এখন আমাদের বিরহ সাগরে ভাসাচ্ছ কবে ?'

প্রশ্নটি যৌবনশ্রী বুঝিতে পারিলেন না। জাতবর্মা আরও কিছুক্ষণ রঙ্গ-রহস্য করিয়া প্রস্থান করিবার পর যৌবনশ্রী দিদির প্রতি জিজ্ঞাসু নেত্রপাত করিলেন।

গ্র

কক্ষে অন্য কেহ ছিল না। বীরশ্রী হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন—'যৌবনা, বিগ্রহ কি তোকে কিছু বলেছে ? কোনও প্রস্তাব করেছে ?'

বিগ্রহপাল কথা বলিয়াছেন অনেক, কিন্তু তাহা বহুলাংশে হৃদয়োচ্ছ্বাস ; যাহাকে প্রস্তাব বলা যায় এমন কথা তিনি বলেন নাই। যৌবনশ্রী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'না। কী প্রস্তাব ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

বীরশ্রী একটু অধীরভাবে বলিলেন—'শুধু অভিসার করলেই চলবে ? এর শেষ কোথায় ?'

শেষ কোথায় ! যৌবনশ্রী সবই জানিতেন। কিন্তু কিছু মনে ছিল না। পিতা বিগ্রহপালকে স্বয়ংবরে আহ্বান করেন নাই, এদিকে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখাশুনা চলিতেছে। যৌবনশ্রী বিগ্রহপালকে প্রথম দর্শনেই হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াছেন ; তারপর যতবার দেখা হইয়াছে প্রণয়ের আকর্ষণ ততই দৃঢ় হইয়াছে। তিনি মনে মনে কালিদাসের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন—ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ। কিন্তু ইহার পরিণাম কোথায় তাহা তিনি ভাবেন নাই ; বর্তমানের ভাব-প্লাবনে তাঁহার হৃদয় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁহার মনে আসে নাই।

তিনি হঠাৎ ভয় পাইয়া বীরশ্রীকে জড়াইয়া ধরিলেন—'দিদি, কি হবে ?'

বীরশ্রী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া হাসিলেন—'কি আর হবে ? বিগ্রহ স্থির করেছে স্বয়ংবরের আগেই তোকে চুরি করে নিয়ে পালাবে, নৌকায় তুলে একেবারে পাটলিপুত্র। এখন তুই মন স্থির করে ফেললেই হল। স্বয়ংবরের কিন্তু আর বেশি দেরি নেই।'

যৌবনশ্রী ধীরে ধীরে বীরশ্রীর স্কন্ধ হইতে মুখ তুলিলেন। তাঁহার মুখখানি প্রভাতের শিশিরক্ষিপ্ত কুমুদিনীর মত শীর্ণ দেখাইল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'চুরি করে— ?'

কেবল এই কথাটি বীরশ্রী ভগিনীকে বলেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, হঠাৎ বলিলে যৌবনশ্রী চমকিয়া যাইবে, আগে ভাব-সাব হোক, তারপর বলিলেই চলিবে। বীরশ্রী এখন বিগ্রহপালের সমস্ত অভিসন্ধি ব্যক্ত করিলেন ; বীরশ্রী ও জাতবর্মার যে এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে তাহাও জানাইলেন। যৌবনশ্রী ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার মন ক্রমে আত্মস্থ হইল।

মানুষের চরিত্র, বিশেষত স্ত্রী-চরিত্র, অতি গহন দুর্জ্ঞেয়। কখন যে তাহা কুসুমের ন্যায় কোমল, আবার কখন যে বজ্রাদপি কঠোর, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

সেদিন রেবার তীরে খণ্ড চাঁদের আলোয় দু'জনের দেখা হইল। যৌবনশ্রী বিগ্রহপালের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ; তারপর আরও কাছে গিয়া তাঁহার বুকের উপর মাথা রাখিলেন। এই স্বতঃ পরিশীলনের জন্য বিগ্রহপাল প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি হর্ষরোমাঞ্চিত দেহে দুই বাহু দিয়া যৌবনশ্রীকে বেষ্টন করিয়া লইলেন।

'যৌবনশ্রী—ভুবনশ্রী— !'

যৌবনশ্রীর একটি হাত সরীসৃপের ন্যায় ধীরে ধীরে উঠিয়া বিগ্রহপালের স্কন্ধের উপর লগ্ন হইল, মুখখানি একটু উন্নমিত হইল। বিগ্রহপাল দেখিলেন তাঁহার চোখে জল টলমল করিতেছে।

'যৌবনা ! কী হয়েছে ?'

যৌবনশ্রীর ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল—'তুমি নাকি আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে ?'

বিগ্রহের মুখ উদ্বিগ্ন হইল। এ প্রশ্নের পিছনে আনন্দ, ঔৎসুক্য নাই। তিনি ব্যগ্রস্বরে বলিলেন—'অন্য উপায় যে নেই যৌবনা। তোমার পিতা আমাকে স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রণ করেননি।'

যৌবনশ্রী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'জানি। কিন্তু তুমি আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে, এ যে

বড় লজ্জার কথা কুমার।'

বিগ্রহপালের মুখ ঈষৎ উত্তপ্ত হইল। তিনি বলিলেন—'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কন্যা হরণ করে বিবাহ করা লজ্জার কথা নয়।'

যৌবনশ্রীর যে বাহুটি বিগ্রহপালের স্কন্ধ পর্যন্ত উঠিয়াছিল তাহা এবার তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লইল, তিনি বলিলেন—'কুমার, আজ আমার নির্লজ্জতা তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমার, কায়মনোবাক্যে তোমার ; তাই আমি তোমাকে কদাচ এ কাজ করতে দেব না। বাহুবলে কন্যা হরণ করা আর চোরের মত কন্যা চুরি করা এক কথা নয়। রাবণ তস্করের মত সীতাকে চুরি করেছিল ; অর্জুন শত শত রাজাকে পরাস্ত করে কৃষ্ণাকে লাভ করেছিলেন।'

বিগ্রহপালের বাহুবেষ্টন শিথিল হইল, তিনি বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। যে প্রথমপ্রণয়ভীতা লজ্জাহতা যুবতীকে তিনি প্রেম নিবেদন করিতেছিলেন এ যেন সে নয়। কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল এত তেজ, এত দৃঢ়তা !

অবশেষে বিগ্রহপাল বলিলেন—'কিন্তু যৌবনা, তুমি কি বুঝতে পারছ না ? এ ছাড়া তোমাকে পাবার আর তো কোনও উপায় নেই।'

যৌবনশ্রী কম্পিতস্বরে বলিলেন—'আমাকে তো পেয়েছ। তুমি আমার স্বামী, ইহজন্মে জন্মজন্মান্তরে তুমি আমার স্বামী। কিন্তু যতক্ষণ সর্বসমক্ষে, ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গের সমক্ষে তোমার গলায় মালা না দিচ্ছি ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাব না। তাতে তোমার পিতৃকুলের, আমার—আমার শ্বশুরকুলের অপমান হবে। ভুলে যেও না কুমার, কোন্ মহিমময় রাজকুলে তোমার জন্ম ; অমরকীর্তি ধর্মপাল দেবপাল মহীপাল তোমার পিতৃপুরুষ। অনুরূপ অবস্থায় তাঁরা কি করতেন ?'

এ প্রশ্নের সদুত্তর নাই ; বিগ্রহপাল নির্বাক রহিলেন। বালসুলভ চপলতার বশে তিনি যে কর্মে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে বিবেকের দিক হইতে যে কোনও বাধা আসিতে পারে তাহা তিনি চিন্তা করেন নাই। তিনি যেন নদীতীরে এক-হাঁটু জলে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ গভীর জলে পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে দীর্ঘ নীরবতার পর তিনি বলিলেন—'যৌবনা, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। সমস্ত ভারতবর্ষ আমাকে ধিক্কার দেবে ; পাল রাজবংশে কলঙ্ক লাগবে। তা হতে পারে না। কিন্তু এখন উপায় কি ?'

'উপায় তুমি জান।'

'তুমি কি করবে ?'

'তুমি যা বলবে তাই করব।'

'স্বয়ংবর তো বন্ধ করা যাবে না। তোমাকে স্বয়ংবর সভায় যেতে হবে।'

'তুমি যদি স্বয়ংবর সভায় না থাক, আমি যাব না।'

'কিন্তু তোমার পিতা—'

যৌবনশ্রী নীরব রহিলেন। আকাশের শশিকলা অস্ত গেল, অন্ধকার ঘিরিয়া আসিল। বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীকে বাহুমুক্ত করিয়া বলিলেন—'আজ আমি যাই। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ভাবতে হবে, অনঙ্গের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, রন্তিদেবের উপদেশ নিতে হবে।—কাল আবার এইখানে এস, দেখা হবে।'

তাঁহাদের প্রেম লঘু পূর্বরাগের স্তর উত্তীর্ণ হইয়া একমুহূর্তে গভীরতর স্তরে উপনীত হইয়াছে।

রাজপুরীতে ফিরিয়া গিয়া যৌবনশ্রী শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্কল্প যতই দৃঢ়

হোক, আশঙ্কাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। বীরশ্রী যথাসাধ্য তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চুরি করিয়া পলায়নের মধ্যে যে ঘোর দুর্নীতি ও স্বৈরাচার রহিয়াছে তাহা তিনিও বুঝিয়াছিলেন, যৌবনশ্রী যদি তাহাতে সম্মত না হয় তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বীরশ্রী পলায়নের প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিলেন না।

কিন্তু যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালের ঘনিষ্ঠতা যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এখন আর হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা যায় না। গভীর রাত্রে দুই ভগিনী ঠাকুরানীর কক্ষে গেলেন। উপস্থায়িকাদের বিদায় করিবার পর বীরশ্রী বর্তমান সংস্থা ঠাকুরানীর গোচর করিলেন। যৌবনশ্রী পিতামহীর বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অম্বিকা দেবী যৌবনশ্রীর সংকল্প শুনিয়া একদিকে যেমন উদ্বিগ্ন হইলেন অন্যদিকে তেমনি প্রসন্ন হইলেন। যৌবনশ্রী রাজকন্যার মতই সঙ্কল্প করিয়াছে, বর্তমানের তরলমতি যুবক-যুবতীদের মধ্যে এমন দৃঢ়তা দেখা যায় না। কিন্তু—এই জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিবে কে? প্রেম ও কর্তব্যের এই দুরত্যয় ব্যবধানের মাঝখানে সেতুবন্ধ হইবে কিরূপে?

বীরশ্রী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—'দিদি, সব দোষ আমার। আমি যদি যোগাযোগ না ঘটাতাম—'

যৌবনশ্রী পিতামহীর বুকের মধ্যে মাথা নাড়িলেন, অস্ফুট রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'না—না—'

ঠাকুরানী বলিলেন—'যা হবার হয়েছে, পশ্চাত্তাপে লাভ নেই। যে জট পাকিয়েছ তা ছাড়াতে হবে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'দিদি, তুমি উপায় কর।'

অম্বিকা বলিলেন—'আমি কী উপায় করতে পারি! তোদের বাপকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, সে আসেনি। তাকে আবার ডেকে পাঠাতে পারি, যদি আসে তাকে সব কথা বলতে পারি। কিন্তু তাতে বিপরীত ফল হবে। কর্ণ যদি জানতে পারে বিগ্রহপাল ত্রিপুরীতে এসেছে তাহলে তার জীবন সংশয় হবে—'

যৌবনশ্রী পূর্ববৎ মাথা নাড়িলেন—'না—না—'

কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীন আলোচনার পর বীরশ্রী বলিলেন—'দিদি, এক কাজ করলে কেমন হয়? রাজারা আসতে আরম্ভ করেছে; তাদের কাছে যদি চুপিচুপি খবর পাঠানো যায় যে যিনি স্বয়ংবরা হবেন তিনি অন্যের বাগ্‌দত্তা—তাহলে—'

অম্বিকা বলিলেন—'তাহলে কলঙ্কের সীমা থাকবে না। রাজারা কি চুপ করে দেশে ফিরে যাবে। তারা ঢাক পেটাবে। তোদের বাপকে জিজ্ঞাসা করবে—বাগ্‌দত্তা মেয়ের স্বয়ংবর দিতে যাও কেন। তখন?'

কোনও মীমাংসা হইল না, কর্তব্য নির্ধারিত হইল না। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরানী বলিলেন—'এখনও সময় আছে, ভেবে দেখি।—ওদিকে বিগ্রহও ভাবছে। হয়তো কোনও উপায় হবে।'

শেষ রাত্রে ক্লান্ত বিধুর হৃদয় লইয়া যৌবনশ্রী শুইতে গেলেন।

বীরশ্রী নিজ শয়নকক্ষে গিয়া স্বামীকে জানাইলেন এবং সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া জাতবর্মা বড়ই বিরক্ত হইলেন। স্ত্রীলোকের আর কোনও কাজ নেই, কেবল পিণ্ড পাকাইতে জানে। এতটা যদি নীতিজ্ঞান, প্রেম করিবার কী প্রয়োজন ছিল, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক

রাজারা আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রেবার তীরে মেঘপুঞ্জবৎ পট্টাবাসগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কোনও রাজার সঙ্গে সহস্র পরিজন, কোনও রাজার সঙ্গে দুই সহস্র : অরক্ষিত অবস্থায় কেহ আসেন নাই। পরিজন যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মনোভাব বরযাত্রীর মত ; দেহে নবীন বস্ত্র, নূতন মণ্ডন। তাহারা গুম্ফ শাণিত করিয়া নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মোণ্ডা মিঠাই খাইতেছে, তালকী মাধুক ইক্ষুরস পান করিতেছে, মদবিহ্বলা নগরকামিনীদের সঙ্গে শ্লেষযুক্ত রসিকতা করিতেছে। গীত বাদ্য হট্টগোল ; নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে স্বাধীন নরপতি সামন্ত মাণ্ডলিক প্রভৃতি মিলিয়া অনেক রাজা ; মিত্র রাজারা সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ছোট রাজারা একটু আগে ভাগেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়াছেন মৎস্যরাজ, দক্ষিণ হইতে ভোজরাজ। কলিঙ্গ হইতে সভারূঢ় হইতে আসিয়াছেন দুই রাজপুত্র। দুই চারিজন সামন্ত অন্তপাল উপস্থিত হইয়াছেন। বরমালা লাভ যদি নাও ঘটে সেই সূত্রে আমোদপ্রমোদ দেশভ্রমণ বহ্বাড়ম্বর তো হইবে। রাজাদের জীবনে মৃগয়া দ্যূত এবং গ্রামধর্ম পালন ব্যতীত বৈচিত্র্যের অবকাশ কোথায় ?

যা হোক, লক্ষ্মীকর্ণের পক্ষ হইতে সকলকেই আদর আপ্যায়ন করা হইতেছে। রাজপুরুষেরা অতিথিদের খাদ্য পানীয় এবং মন যোগাইতে গলদ্‌ঘর্ম হইতেছেন। সেই সঙ্গে গুপ্তচরেরা আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কোন্ রাজার মনে কিরূপ দুর্বুদ্ধি আছে তাহা লক্ষ্য করিতেছে। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ নিপুণ সারথির মত রশ্মি ধরিয়া সকলকে পরিচালিত করিতেছেন।

কেবল একটি বিষয়ে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মনে সুখ নাই। স্বয়ংবর সভায় যে বিরাট প্রহসন রচনা করিয়া সারা ভারতবর্ষে অট্টহাস্যের ঢক্কানিনাদ তুলিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন তাহা মনের মত হইতেছে না। শিল্পীটা অভিপ্রেত মূর্তি গড়িতে পারিতেছে না।

গুপ্ত মন্ত্রগৃহে লক্ষ্মীকর্ণ শিল্পীকে ডাকিয়া ধমক দিতেছেন। প্রাতঃকালে গুপ্তকক্ষে অন্য কেহ নাই, কেবল এক কোণে লম্বোদর অদৃশ্য হইয়া বসিয়া আছে। সে মহারাজের কর্ণে দৈনিক সংবাদ নিবেদন করিতে আসিয়াছে।

মহারাজ শিল্পীকে বলিলেন—'তুমি অপদার্থ।'

শিল্পী জোড়হস্তে বলিল—'মহারাজ, যাকে কখনও চোখে দেখিনি তার মূর্তি আমি কী করে গড়ব ? সাধ্যমত চেষ্টা করছি, পঞ্চাশটা মুখ গড়েছি—'

মহারাজ বলিলেন—'কিছুই হয়নি, কেবল পণ্ডশ্রম। যাও, আবার চেষ্টা কর।'

অসহায় শিল্পী প্রস্থান করিলে অন্ধকার কোণ হইতে লম্বোদর মৃদু গলা ঝাড়া দিয়া বলিল—'আয়ুষ্মন্—'

লক্ষ্মীকর্ণের ইঙ্গিত পাইয়া সে গুটি গুটি কাছে আসিয়া যুক্তকরে বসিল, কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিল—'আমার গৃহে যে অতিথিটা রয়েছে সে মূর্তি গড়তে জানে।'

লক্ষ্মীকর্ণ বিরক্তস্বরে বলিলেন—'মূর্তি গড়তে জানে এমন লোক অনেক আছে।'

লম্বোদর কহিল—'এ পাটলিপুত্রের লোক, হয়তো মগধের যুবরাজকে দেখেছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ কিছুক্ষণ লম্বোদরের মুখের পানে প্রখরচক্ষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার কথার মর্মার্থ বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি কতকটা নিজ মনেই বলিলেন—'বটে। তাহলে হয়তো—। লম্বোদর, তুমি চেষ্টা কর। যদি সে পারে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। এখনও

দশদিন সময় আছে।'

লম্বোদর ঘরে ফিরিয়া চলিল। মধুকর যে ভাল মূর্তি গড়িতে পারে তাহা সে নিজে দেখে নাই, বেতসীর মুখে শুনিয়াছিল। শিল্পকলার প্রতি তাহার তিলমাত্র অনুরাগ ছিল না, তাই সে উদাসীন ছিল। শিল্পকলার রসাস্বাদন করিবার সময়ই বা কোথায়? কিন্তু মধুকর পাটলিপুত্রের মানুষ, বিগ্রহপালকে অবশ্য দেখিয়াছে। সে যদি ভাল শিল্পী হয় নিশ্চয় বিগ্রহপালের মূর্তি গড়িতে পারিবে।

দুই

গতরাত্রে বিগ্রহপালের মুখে যৌবনশ্রীর সংকল্পের কথা শুনিয়া অনঙ্গের মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আজ প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াও মনের তিলমাত্র উন্নতি হয় নাই। এই স্ত্রীজাতিকে লইয়া কি করা যায়!

ভগবান তাহাদের বুদ্ধি দেন নাই, ভালই করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির বুদ্ধির প্রয়োজন কি? সেজন্য পুরুষ আছে। মেয়েরা গৃহস্থালি করিবে, পতিগতপ্রাণা হইবে, সর্ববিষয়ে ভর্তার অনুবর্তিনী হইবে; পূজার্হা গৃহদীপ্তি হইয়া থাকিবে। মনু যথার্থই লিখিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীজাতি বাল্যে পিতার বশ, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের। কিন্তু বর্তমান যুগের যুবতীরা মনুকে গ্রাহ্যই করে না; তাহারা ভাবে তাহাদের ভারি বুদ্ধি হইয়াছে। অবশ্য বান্ধুলি সে রকম নয়। কিন্তু রাজকন্যার এ কিরূপ মতিগতি? এমন একটা অসম্ভব সংকল্প করিয়া বসিলেন! তিনি বিগ্রহকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার এই ব্যবহার।...এত চেষ্টা এত কৌশল, বুড়া লক্ষ্মীকর্ণকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার এমন সুযোগ—সব ভ্রষ্ট হইয়া গেল। নাঃ, স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস নাই—পুরুষের কাজ ভণ্ডুল করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম।

এইরূপ ক্ষুব্ধ-বিরক্ত চিন্তায় বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অনঙ্গ মূর্তি গড়িতে বসিয়াছিল। কিন্তু মূর্তি গঠনে তাহার মন বসিল না; একতাল মাটি লইয়া সে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। আজ সকালে উঠিয়া সে বান্ধুলির দেখা পায় নাই, ভোর হইতে না হইতে বান্ধুলি রাজবাটীতে চলিয়া গিয়াছে। সে জন্যও মন ভাল নয়।

পিছনে দরজা ভেজানো ছিল। একটু শব্দ শুনিয়া অনঙ্গ পিছু ফিরিয়া চাহিল; দেখিল দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া লম্বোদর উঁকি মারিতেছে। লম্বোদরের সুবর্তুল চোখ দুটিতে কৌতূহল, ভালুকে খাওয়া নাকটি শশকের নাকের মত একটু একটু নড়িতেছে, অধরে বোকাটে হাসি।

অনঙ্গ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—'এই যে লম্বোদর ভদ্র। অনেকদিন আপনার দেখা নেই। আসুন।'

বকধার্মিকের মত শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপ করিয়া লম্বোদর প্রবেশ করিল, অপ্রতিভস্বরে বলিল—'সময় পাই না। রাজকন্যার স্বয়ংবর ব্যাপারে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু কুটুম্বিনীর কাছে আপনার সংবাদ পাই। আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?'

অনঙ্গ বলিল—'আমি পরম আনন্দে আছি।—বসুন। আজ বুঝি রাজকার্যের তেমন চাপ নেই?'

অনঙ্গ বুঝিয়াছিল লম্বোদর বিনা প্রয়োজনে আসে নাই; তাহার মন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। লম্বোদর উপবেশন করিয়া বলিল—'হেঁ হেঁ, আপনি দেখছি মূর্তি গড়ছেন। কুটুম্বিনীর কাছে শুনেছি আপনি উত্তম শিল্পী; কিন্তু আপনার শিল্পবস্তু দেখার সুযোগ হয়নি।'

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'সামনেই রয়েছে—দেখুন।'

লম্বোদর মূর্তিগুলি দেখিল ; তাহাদের শিল্প-সৌন্দর্য বুঝিল কিনা বলা যায় না, বলিল—'অহহ, কী সুন্দর !—আপনি নিশ্চয় মানুষ দেখে তার প্রতিমা গড়তে পারেন ?'

'পারি। দেখবেন ? তাহলে স্থির হয়ে বসুন।' মৃৎপিণ্ড তুলিয়া লইয়া অনঙ্গ গড়িতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে একটি মুণ্ড তৈয়ার করিয়া বলিল—'দেখুন। কেমন হয়েছে ?'

লম্বোদর কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আপনি অদ্ভুত শিল্পী। মগধের ভদ্ররা দেখছি কলাকুশলী হয়। এঁ—আপনি মগধের যুবরাজ বিগ্রহপালকে দেখেছেন ?'

অনঙ্গ একটু চমকিত হইল। কলাকুশলতার সঙ্গে বিগ্রহপালের সম্পর্ক কি ? সে সতর্কভাবে বলিল—'দেখেছি—দূর থেকে।'

'আচ্ছা, আমার মুখ যেমন গড়লেন, তাঁর মুখ তেমন গড়তে পারেন ?'

'পারি। যার মুখ একবার দেখেছি তার মুখ গড়তে পারি। কেন বলুন দেখি ?'

লম্বোদর একবার কান চুলকাইল, একবার ঘাড় চুলকাইল,—তারপর বলিল—'মধুকর ভদ্র, আপনি শিল্পী। আপনার মত শিল্পী চেদিরাজ্যে নেই।'

অনঙ্গ বিনয় করিয়া বলিল—'না না, সে কি কথা !'

লম্বোদর বলিল—'চলুন আপনি রাজার কাছে। মহারাজ কর্ণদেব শিল্পকলার অনুরাগী, তিনি আপনার গুণের পরিচয় পেলে প্রীত হবেন।'

অনঙ্গের খট্‌কা লাগিল। লম্বোদরের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? তবে কি লক্ষ্মীকর্ণ জানিতে পারিয়াছে ? ছল করিয়া তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া গিয়া বন্দী করিতে চায় ? কিন্তু না, লক্ষ্মীকর্ণ যদি জানিতে পারিত তাহা হইলে ছল-চাতুরী করিত না, গলায় রজ্জু দিয়া সিধা টানিয়া লইয়া যাইত। হয়তো অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

সে বলিল—'মহারাজের দর্শনলাভ তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু—আমি সামান্য বিদেশী, বিনা প্রয়োজনে মহারাজের সম্মুখীন হওয়া—'

লম্বোদর বলিল—'স্বয়ংবর সভা অলঙ্কৃত হচ্ছে, মহারাজ আপনার গুণের পরিচয় পেলে আপনাকে দিয়েও অলঙ্করণের কাজ করিয়ে নিতে পারেন।'

অনঙ্গ ভাবিল, মন্দ কথা নয়। দেখাই যাক না ইহাদের মনে কি আছে। সে বলিল—'বেশ, আমি যাব। কখন যেতে হবে ?'

লম্বোদর বলিল—'এখনই চলুন না। আমাকে কর্মসূত্রে মহারাজের কাছে যেতে হবে। আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'এখনি ?'

'দোষ কি ? আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন, আমি ততক্ষণ কুটুম্বিনীকে দেখা দিয়ে আসি।'

লম্বোদর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে অনঙ্গ বেশবাস পরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সামান্য বেশে রাজসমীপে যাওয়া চলিবে না ; অনঙ্গ মূল্যবান বেশভূষা পরিধান করিল। উপরন্তু অরিক্তপাণি হইয়া রাজার কাছে যাইতে হয়, হাতে উপঢৌকন থাকা প্রয়োজন। অনঙ্গ একটি স্বকৃত বিষ্ণুমূর্তি সঙ্গে লইল। লক্ষ্মীকর্ণকে সামনা-সামনি দেখিবার আকস্মিক সুযোগ পাইয়া তাহার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এইবার মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানা যাইবে।

ওদিকে লম্বোদর রসবতীতে গিয়া দেখিল বেতসী রন্ধনকার্যে ব্যস্ত। পিছন হইতে বেতসীকে দেখিয়া সে দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া পড়িল। বেতসীর কুণ্ডলিত চুলগুলি শিথিল হইয়া গ্রীবামূলে এলাইয়া পড়িয়াছে, কাঁচলি ও কটির মাঝখানে পিঠের নিম্নভাগ দেখা যাইতেছে। লম্বোদর উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিল। শীর্ণ লতায় কখন অলক্ষিতে নব পল্লবোদ্‌গম হইতে আরম্ভ

করিয়াছে তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া বেতসী লম্বোদরকে দেখিতে পাইল। হাতা-বেড়ি ফেলিয়া আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে সে লম্বোদরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আনন্দ বিগলিত স্বরে বলিল—'কখন এলে ?'

লম্বোদর চকিতে একবার বেতসীর সারা দেহে চক্ষু বুলাইয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিল—'এই এলাম—এখনি আবার যেতে হবে।'

বেতসী তাহার হাতে হাত রাখিয়া আবদারের সুরে বলিল—'একটু থাক না। আজকাল দিনান্তে তোমার দেখা পাই না।'

লম্বোদর কুণ্ঠাভরে বলিল—'রাজকার্য—'

বেতসী বলিল—'হোক রাজকার্য, একটু থাক আমার কাছে।—আচ্ছা, এক কাজ কর না! আমার রান্না তৈরি, গরম গরম খেয়ে নাও না। নইলে তো সেই তিন পহর।'

লম্বোদর তাড়াতাড়ি বলিল—'না বেতসি, এখন নয়। রাজবাটী যেতে হবে। ফিরে এসে খাব।'

বেতসী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—'রাজবাটী আর রাজবাটী। নিজের বাড়ি বুঝি কিছু নয়।—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও।'

বেতসী নারিকেল গুড় ও ক্ষীর দিয়া মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়াছিল, দ্রুত গিয়া এক মুঠি আনিয়া বলিল—'হাঁ কর।'

লম্বোদর মুখ ব্যাদান করিল। বেতসী মুখের মধ্যে মিষ্টান্ন পুরিয়া দিয়া বলিল—'তবু পেটে ভর পড়বে।—জল নাও।'

জল পান করিয়া লম্বোদর বলিল—'আমি অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। চেষ্টা করব মধ্যাহ্নে ফিরতে।'

বেতসী বলিল—'আচ্ছা, আমি থালা সাজিয়ে বসে থাকব।'

ইতিমধ্যে অনঙ্গ সাজসজ্জা করিয়া মাথায় পাগ বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল ; লম্বোদর তাহাকে লইয়া বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে লম্বোদর অধিক কথা বলিল না, কিন্তু নানা কূটচিন্তার ফাঁকে ফাঁকে কর্মরতা বেতসীর চিত্রটি বার বার তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল।

তিন

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ গুপ্ত মন্ত্রগৃহেই ছিলেন। অনঙ্গ তাঁহার সম্মুখে বিষ্ণুমূর্তিটি রাখিয়া যুক্তকর হইল। লক্ষ্মীকর্ণ মূর্তিটি দেখিলেন, অনঙ্গকে দেখিলেন ; তারপর মূর্তিটি তুলিয়া লইলেন।

অনঙ্গও লক্ষ্মীকর্ণকে দেখিল। ইতিপূর্বে সে লক্ষ্মীকর্ণের রূপবর্ণনাই শুনিয়াছিল ; দেখিল বর্ণনায় তিলমাত্র অত্যুক্তি নাই। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ সত্যই একটি কদাকার অতিকায় দৈত্য বিশেষ।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। লক্ষ্মীকর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনঙ্গকে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন—'তুমি বিদেশী। তোমার নিবাস কোথায় ?'

অনঙ্গ বলিল—'আজ্ঞা, মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে।'

'নাম কি ?'

'আজ্ঞা, নাম মধুকর সাধু।'

'বৈশ্য ?'

'আজ্ঞা।'

'পিতার নাম ?'

অনঙ্গ প্রস্তুত ছিল, বলিল—'আমার পিতা স্বর্গত। নাম ছিল সুধাকর সাধু।'

'ত্রিপুরীতে কি জন্য এসেছ ?'

'স্বয়ংবর উপলক্ষে শিল্পসামগ্রী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এসেছি।'

'অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই ?'

'অন্য উদ্দেশ্য দেশ ভ্রমণ।'

লক্ষ্মীকর্ণ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন।—

'তুমি পাটলিপুত্রের লোক, যুবরাজ বিগ্রহপালের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে ?'

অনঙ্গ জিভ কাটিয়া বলিল—'আজ্ঞা না। আমি সামান্য ব্যক্তি, রাজপুত্রের সঙ্গে পরিচয় নাই। তবে তাঁকে অনেকবার দেখেছি।'

'বিগ্রহপাল এখন কোথায় জানো ?'

'সম্ভবত পাটলিপুত্রেই আছেন। আমি জানি না।'

লক্ষ্মীকর্ণ গলার মধ্যে শব্দ করিলেন, বলিলেন—'আমি সংবাদ পেয়েছি সে পাটলিপুত্রে নেই। যা হোক—' লক্ষ্মীকর্ণ ক্ষণেক বাক্ সম্বরণ করিয়া পুনশ্চ বলিলেন—'তুমি পাটলিপুত্রের লোক হলেও তোমাকে সজ্জন বলে মনে হচ্ছে।' বিষ্ণুমূর্তিটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন—'লম্বোদরের মুখে শুনলাম তুমি ভাল শিল্পী, তোমার কাজ দেখেও তাই মনে হচ্ছে।—তুমি দেখা-মুখের প্রতিমা গড়তে পারো ?'

'আজ্ঞা পারি' বলিয়া অনঙ্গ লম্বোদরের পানে চাহিল। লম্বোদর সবেগে মুণ্ড আন্দোলন করিল।

'ভাল।' মহারাজ কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া বলিলেন—'তোমাকে দিয়ে একটা গোপনীয় কাজ করাতে চাই। যদি করতে পারো, পুরস্কার পাবে।'

হাত জোড় করিয়া অনঙ্গ বলিল—'আজ্ঞা করুন।'

মহারাজ ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বলিলেন—'তোমরা আমার সঙ্গে এস।'

কয়েকটি অলিন্দ পার হইয়া শিল্পশালার দ্বার। শিল্পশালা রাজভবনের অন্তর্গত হইলেও তাহার প্রবেশদ্বার স্বতন্ত্র। দ্বারে শূলধারী দৌবারিক পাহারা দিতেছে।

লক্ষ্মীকর্ণ সঙ্গীদের লইয়া প্রবেশ করিলেন। শিল্পশালার কক্ষটি সভাগৃহের ন্যায় বিস্তৃত, মাঝে মাঝে স্থূল স্তম্ভ ছাদকে ধরিয়া রাখিয়াছে ; স্তম্ভের গায়ে শিল্পকর্ম। কিন্তু শোভা কিছু নাই। দুই চারিটা প্রাচীরচিত্র, দুই চারিটা প্রস্তরমূর্তি যত্রতত্র বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে, যত্নের অভাবে ধূলিমলিন হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মীকর্ণের পূর্বপুরুষেরা শিল্পকলারসিক ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণ নিজে ও-সবের ধার ধারেন না। হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধি মস্তিষ্কে উদিত হওয়ায় শিল্পশালার দ্বার খুলিয়াছে।

শিল্পশালার মাঝখানে একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়া হতাশ ভঙ্গিতে শিল্পী বসিয়া আছে। তাহার পাশে স্তূপীকৃত মূর্তি গড়িবার মৃত্তিকা, সম্মুখে অসংখ্য মৃন্ময় মুণ্ড, অদূরে একটি মুণ্ডহীন কবন্ধ। কবন্ধ ও মুণ্ডগুলি সবই প্রমাণ আকৃতির।

রাজাকে দেখিয়া শিল্পী ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে বলিলেন—'চক্রনাথ, তুমি এখন গৃহে যাও। তোমার কাজ সম্বন্ধে কারও সঙ্গে জল্পনা করবে না। যদি প্রয়োজন হয় তোমাকে

আবার ডেকে পাঠাব।'

শিল্পী চক্রনাথ অনঙ্গের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করিল, তারপর 'যথা আজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া প্রস্থান করিল।

তখন লক্ষ্মীকর্ণ অনঙ্গকে বলিলেন—'মধুকর, এই মুণ্ডগুলা দেখে বলতে পার, বিগ্রহপালের সঙ্গে কোনও মুণ্ডের সাদৃশ্য আছে কিনা ?'

লক্ষ্মীকর্ণ কোন্ পথে চলিয়াছেন তাহা অনঙ্গ এখনও বুঝিতে পারে নাই, মনের মধ্যে বিস্ময় লুকাইয়া সে মুণ্ডগুলি পরীক্ষা করিল, বলিল—'না আর্য, সাদৃশ্য নেই।'

'তুমি বিগ্রহপালের মুণ্ড গড়ে দেখাতে পার ?'

'মোটামুটি গড়ে দেখাতে পারি।'

'দেখাও।'

অনঙ্গ তখন মর্মর কুট্টিমের উপর উপবেশন করিল, মাথার পাগ খুলিয়া পাশে রাখিল, এক তাল মাটি তুলিয়া দুই হাতে গড়িতে আরম্ভ করিল। রাজা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

বিগ্রহপালের মুখ গঠন করা অনঙ্গের পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ নয় ; চোখ মুদিয়া গড়িতে পারে। কিন্তু সে ত্বরা করিল না ; ধীরে ধীরে, যেন স্মরণ করিতে করিতে গড়িতে লাগিল। অবশেষে অর্ধদণ্ড পরে মুণ্ডটি এক পীঠিকার উপর রাখিয়া বলিল—'তাড়াতাড়িতে ভাল হল না। তবু চিনতে বোধহয় কষ্ট হবে না।'

মুণ্ড দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণের ব্যাঘ্র-মুখে হাসি ফুটিল ; হাঁ, সেই মুখই বটে। তিনি অনঙ্গের স্কন্ধে থাবা রাখিয়া বলিলেন—'তুমি উত্তম শিল্পী, তোমাকে আমি রাজশিল্পী করে রাখব। চক্রনাথটা ঘোর অকর্মণ্য। —এখন কী কাজ করতে হবে শোনো।'

লক্ষ্মীকর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিজ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। শুনিতে শুনিতে অনঙ্গের মুখ ভাবলেশহীন হইয়া গেল, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ক্রিয়া চলিতে লাগিল। হতভাগ্য বুড়ার এই উদ্দেশ্য ! প্রকাশ্য স্বয়ংবর সভায় বিগ্রহপালকে অপদস্থ করিতে চায় !

লক্ষ্মীকর্ণ যতক্ষণে নিজ বক্তব্য শেষ করিলেন ততক্ষণে অনঙ্গ নূতন ফন্দি বাহির করিয়াছে। দাঁড়াও বুড়া, তোমার অস্ত্রে তোমাকে সংহার করিব ! তুমি বিগ্রহপালের মুখে চুন-কালি দিতে চাও, তোমার নিজের মুখে চুন-কালি পড়িবে। এতক্ষণ পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, এবার পাইয়াছি। যৌবনশ্রী স্বয়ংবর সভাতেই বিগ্রহপালের গলায় মালা দিবে—

লক্ষ্মীকর্ণ প্রশ্ন করিলেন—'কত দিন সময় লাগবে ?'

অনঙ্গ যুক্তকরে বলিল—'ভাল করে তৈরি করতে কিছু সময় লাগবে মহারাজ।'

'স্বয়ংবরের আগে তৈরি হওয়া চাই। তোমার যদি কোনও দ্রব্য প্রয়োজন হয় আমাকে জানিও।'

'আজ্ঞা, আমার কিছু বেতস ও বাঁশের কঞ্চি চাই। এই যে মাটির কবন্ধ তৈরি হয়েছে এ বড় ভারী। আমি কঞ্চি ও বেতস দিয়ে দেহের কাঠামো তৈরি করব ; এত লঘু হবে যে দুইজন লোক মূর্তিটাকে এখান থেকে স্বয়ংবর সভায় নিয়ে যেতে পারবে।'

'বেশ বেশ। তুমি যা চাও তাই পাবে। এবার কাজ আরম্ভ করে দাও। আমি মাঝে মাঝে এসে তোমার কাজ দেখে যাব। যতদিন তোমার কাজ শেষ না হয় ততদিন তুমি এখানেই থাকবে। স্বয়ংবরের আগের রাত্রে স্বয়ংবর সভায় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে তারপর তোমার ছুটি।'

অনঙ্গ ত্রস্ত হইয়া বলিল—'কিন্তু মহারাজ—'

'তোমার প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র সব লম্বোদর পৌঁছে দেবে। তুমি এখানেই পানাহার করবে,

রাজ-পাকশালা থেকে তোমার আহার্য আসবে। রাত্রে শয়নের জন্য শয্যা পাবে। যতদিন কাজ শেষ না হয় ততদিন এই ব্যবস্থা।'

মহারাজ লম্বোদরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। দৌবারিককে বলিয়া গেলেন যেন কোনও অবস্থাতেই শিল্পীকে বাহিরে যাইতে দেওয়া না হয়।

অনঙ্গ মাথায় হাত দিয়া বসিল। বাহির হইতে না পারিলে সে বিগ্রহপালের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবে কিরূপে ?

চার

লম্বোদর যখন গৃহে ফিরিল তখন তৃতীয় প্রহর আগতপ্রায়। ইতিমধ্যে বান্ধুলি আসিয়াছিল ; দুই ভগিনী রসবতীতে অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। লম্বোদর ও অতিথি ফিরিলে তাহাদের খাওয়াইয়া নিজেরা খাইতে বসিবে।

লম্বোদরকে দেখিয়া বেতসী বলিল—'এতক্ষণে আসা হল। নাও, আর দেরি নয়, বসে পড়। সব জুড়িয়ে গেল।'

লম্বোদর হাত ধুইয়া পীঠিকায় বসিল। বেতসী তাহার সম্মুখে থালি ধরিয়া দিয়া বলিল—'বান্ধুলি, তুই অতিথির খাবার দিয়ে আয়।'

লম্বোদর মুখে গ্রাস তুলিতে যাইতেছিল, থামিয়া বলিল—'অতিথি আসেনি।'

বেতসী অবাক হইয়া বলিল—'আসেনি ! ওমা, কোথায় গেল অতিথি ?'

লম্বোদর খাদ্যচর্বণ করিতে করিতে নিরুদ্বেগকণ্ঠে বলিল—'রাজপুরীতে আছে।'

বান্ধুলি অতিথির থালা হাতে লইবার জন্য নত হইয়াছিল, সেই অবস্থাতেই রহিল ; তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। সে শুনিয়াছিল অনঙ্গ লম্বোদরের সঙ্গে বাহির হইয়াছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিল না কেন ? রাজবাড়িতে রহিল কি জন্য ?

বেতসী বলিল—'রাজপুরীতে ! কখন ফিরবে ?'

লম্বোদর বলিল—'এখন দু'চার দিন সেখানেই থাকবে।'

বান্ধুলির বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে কি রাজা জানিতে পারিয়াছে, অনঙ্গকে ছলে রাজপুরীতে লইয়া গিয়া কারাগারে পুরিয়াছে ?

বেতসী বলিল—'সে কি ! রাজপুরীতে থাকবে কেন ?'

লম্বোদর বলিল—'রাজা তাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিতে চান, যতদিন কাজ শেষ না হয় ততদিন সে শিল্পশালায় থাকবে। ভাবনার কিছু নেই, খুব আরামে থাকবে। রাজার পাকশালা থেকে খাবার আসবে।'

বেতসী আরও অবাক হইয়া বলিল—'হাঁ গা, কী এমন কাজ ?'

'একটা মূর্তি গড়তে হবে।'

'কার মূর্তি ? রাজার ? রাজকন্যের ?'

লম্বোদর আর উত্তর দিল না, আহারে মন দিল। এতটা না বলিলেই ভাল হইত। মেয়েদের বড় বেশি কৌতূহল, তার উপর পেটে কথা থাকে না। যা হোক, আহার শেষ করিয়া আচমন করিতে করিতে সে বলিল—'এসব কথা কাউকে বলবে না। আমি এখন চললাম, অতিথির কিছু তৈজসপত্র শিল্পশালায় পৌঁছে দিতে হবে।'—

লম্বোদর প্রস্থান করিবার পর দুই ভগিনী আবার রসবতীতে ফিরিয়া আসিল। বেতসী

বলিল—'আয় খেতে বসি।'

বান্ধুলি বলিল—'দিদি!'

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বেতসী চমকিয়া তাহার পানে চাহিল। এতক্ষণ বান্ধুলির মুখের পানে তাহার নজর পড়ে নাই, এখন দেখিল বান্ধুলির মুখ যেন শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বেতসী বলিল—'কি রে?'

বান্ধুলি বলিল—'আমি—আমি রাজবাটীতে ফিরে যাই।'

'বেশ তো। খেয়ে নে, তারপর যাস।'

'না দিদি, আমি যাই—'

বেতসী বান্ধুলির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'কী হয়েছে বল দেখি।'

উত্তর দিতে গিয়া বান্ধুলি কাঁদিয়া ফেলিল, তারপর বেতসীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ গুঁজিল।

বেতসীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না—'বান্ধুলি!'

বান্ধুলি গলার মধ্যে অস্পষ্টস্বরে বলিল—'বড় ভয় করছে।'

হঠাৎ বেতসীর মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল। মধুকর! মধুকরের বিপদ আশঙ্কা করিয়া বান্ধুলি উতলা হইয়াছে। মধুকরকে সে মনে মনে—!

বেতসী বলিল—'দেখি, মুখ তোল।'

বান্ধুলি অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিল। বেতসী তাহার মুখ দেখিয়া মহানন্দে হাসিয়া উঠিল—'তুই মধুকরকে—অ্যাঁ!'

বান্ধুলির অশ্রুপ্লাবন আরও বাড়িয়া গেল। বেতসী তাহাকে আবার কণ্ঠলগ্ন করিয়া বলিল—'এই কথা! তা এত কান্না কিসের? শুনলি তো রাজা মূর্তি গড়াবার জন্যে তাকে রাজপুরীতে রেখেছেন। এতে ভাবনার কী আছে?'

বেতসী সব কথা জানে না, সুতরাং তাহার ভাবনার কিছু না থাকিতে পারে; কিন্তু বান্ধুলি নিশ্চিন্ত হইবে কি করিয়া? লম্বোদর যে মিথ্যা স্তোক দেয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত বান্ধুলির মন প্রবোধ মানিবে না। সে ভাঙ্গা গলায় বলিল—'আমি যাই দিদি। তুই কাউকে কিছু বলিস না। কুটুম্ব যদি জানতে পারে—'

বেতসী বলিল—'তুই নিশ্চিন্ত থাক।'

বান্ধুলি চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

বেতসী একাই খাইতে বসিল। মধুকরের প্রতি বান্ধুলির মন আসক্ত হইয়াছে ইহা বেতসী আগে জানিতে পারে নাই। কি করিয়াই বা জানিবে? তাহার মন নিজের পুনরুজ্জীবিত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার জালে জড়াইয়া গিয়াছিল, বান্ধুলির মনের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। এখন উদ্বেলিত আনন্দে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। কেবল বান্ধুলির জন্য নয়, নিজের জন্যও। সংশয়ের দুষ্ট কীট তাহার বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল, স্বাস্থ্যোন্নতির পরও কীটের দংশন থামে নাই। কিন্তু এখন আর ভয় নাই। বান্ধুলি মধুকরকে চায়। এখন বেতসী লম্বোদরের মন আবার আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিবে।

বান্ধুলি যখন রাজপুরীতে পৌঁছিল তখন তাহার চোখের জল শুকাইয়াছে। সে প্রথমে রাজ-পাকশালায় উপস্থিত হইল। রাজপুরীর কাণ্ড, অনঙ্গ খাইতে পাইয়াছে কিনা তাহা আগে জানা দরকার।

রাজপুরীর বিশাল পাকশালা, দশ বারোটা আখা জ্বলিতেছে। রাজ পরিবারের আহার সমাধা

হইলেও অসংখ্য পরিজনের মধ্যাহ্ন ভোজন এখনও বাকি। একপাল পাচক পাচিকা কলরব করিতেছে, পাকশালা কাকসমাকুল উচ্ছিষ্ট স্থানের ন্যায় মুখরিত।

বান্ধুলিকে দেখিয়া কল-কোলাহল একটু শান্ত হইল। বান্ধুলিকে রাজপুরীতে কে না চেনে? কনিষ্ঠা কুমার-ভট্টারিকার সখী।

বান্ধুলি প্রধান সূপকারের কাছে গিয়া বলিল—'কৃষ্ণ, শিল্পশালায় খাবার পাঠাতে হবে জানো?'

কৃষ্ণ স্থূলকায় বয়স্ক ব্যক্তি, ঘর্মাক্ত দেহে রন্ধন পরিদর্শন করিতেছিল; সে বলিল—'হাঁ দিদি, শিল্পশালায় খাবার পাঠাতে হবে খবর পেয়েছি।—ও মারুতির মা, শিল্পশালায় খাবার নিয়ে যেতে বলেছিলাম তার কি হল?'

মারুতির মা প্রৌঢ়া বিধবা, অদূরে বসিয়া লোহার উদূখলে কচি আম কুটিয়া কাশমর্দ তৈয়ার করিতেছিল, বলিল—'এই যে বাছা, একটা কাজ সেরে তবে তো অন্য কাজে হাত দেব। এটা হলেই দিয়ে আসব।'

বান্ধুলি কৃষ্ণকে বলিল—'আমার হাতে দাও, আমি দিয়ে আসছি।'

কৃষ্ণ বলিল—'তুমি দিয়ে আসবে দিদি! তাহলে তো কথাই নেই। এই যে আমি খাবার সাজিয়ে দিচ্ছি।'

কৃষ্ণ বুঝিয়াছিল রাজকন্যার সখী নিজের হাতে যাহার খাবার লইয়া যাইতে চায় সে সামান্য লোক নয়। কৃষ্ণ প্রকাণ্ড থালায় উৎকৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া বান্ধুলির হাতে দিল।

বান্ধুলি থালি লইয়া শিল্পশালার দিকে চলিল। দেখিল শিল্পশালার দ্বারে অস্ত্রধারী দৌবারিক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল।

দৌবারিকও বান্ধুলিকে চিনিত। বলিল—'শিল্পীর জন্য খাবার এনেছ?'

বান্ধুলি বলিল—'হাঁ। লম্বোদর ভদ্র কি এসেছিলেন?'

দৌবারিক বলিলেন—'হাঁ। শিল্পীর তৈজসপত্র রেখে গেছেন। যাও, ভিতরে যাও।'

যাক, লম্বোদরের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎকার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বান্ধুলি সাহস করিয়া শিল্পশালায় প্রবেশ করিল। বিশাল কক্ষের এক কোণে শয্যা পাতিয়া অনঙ্গ অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। বান্ধুলিকে দেখিয়া সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাতছানি দিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল।

বান্ধুলি যখন তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িয়াছে। অনঙ্গ কিন্তু আনন্দের আবেগে আর একটু হইলেই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিত, যথাসময় আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'বান্ধুলি! তুমি!'

বান্ধুলি শয্যার পাশে থালা নামাইয়া বলিল—'আগে খেতে বোসো। খুব পেট জ্বলছে তো!'

'পেট! হাঁ, জ্বলছে বটে।' অনঙ্গ সংযতভাবে খাইতে বসিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা সে নানা দুশ্চিন্তায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

বান্ধুলি হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'বাড়ি গিয়ে শুনলাম তুমি কুটুম্বের সঙ্গে বেরিয়েছ। তারপর কুটুম্ব ফিরে এলেন, তুমি এলে না। কুটুম্ব বললেন, রাজা তোমাকে শিল্পশালায় আটকে রেখেছেন। তাই আমি—'

'ধন্য।' কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিয়া অনঙ্গ মুখ তুলিল—'তুমি খেয়েছ?'

বান্ধুলি হেঁট মুখে মাথা নাড়িল। অনঙ্গ তখন পাত হইতে এক খণ্ড ভর্জিত মৎস্যাণ্ড লইয়া বান্ধুলির মুখের কাছে ধরিল, বলিল—'খাও।'

বান্ধুলি সলজ্জে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'যাঃ!'

অনঙ্গ মৎস্যাণ্ডটি তাহার মুখের কাছে ধরিয়া রাখিয়া বলিল—'এক পাতে না খেলে বৌ হওয়া

যায় না।'

বান্ধুলি ক্ষণেক দ্বিধা করিল ; তারপর মুখ ফিরাইয়া মৎস্যাণ্ডে একটু কামড় দিয়া মুখ বুজিল। অনঙ্গ আর পীড়াপীড়ি করিল না। বাকি মৎস্যাণ্ড নিজের মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল এবং বান্ধুলির পানে আড়চোখে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বান্ধুলির মুখ আকণ্ঠ রাঙা হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অনঙ্গ সতর্কভাবে ঘাড় তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। দ্বার এখান হইতে অনেকটা দূরে, দৌবারিককেও এ কোণ হইতে দেখা যায় না। তাহাদের কথা কেহ শুনিতে পাইবে না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অনঙ্গ গলা নামাইয়া বলিল—'বান্ধুলি, তোমাকে আমি সব কথা বলিনি। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী, যা বলিনি তা নিশ্চয় অনুমান করে নিয়েছ। আমি এক নূতন ফন্দি বার করেছি। দেবী যৌবনশ্রী যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন তাকে সরাবার কৌশল উদ্ভাবন করেছি। এখন যা বলছি মন দিয়ে শোনো। বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী ছাড়া একথা আর কাউকে বলবে না। আর কেউ যদি জানতে পারে সর্বনাশ হয়ে যাবে ; মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ আমাদের সবাইকে কুচ্ কুচ্ করে কেটে ফেলবেন।'

বান্ধুলি কম্প্রবক্ষে শঙ্কা-হর্ষ-উত্তেজনা লইয়া শুনিল ; অনঙ্গ বক্তব্য শেষ করিয়া বলিল—'তুমি এখন যাও। অনেকক্ষণ আছ, প্রহরীটা সন্দেহ করবে।'

'সন্ধ্যার পর আবার আমি তোমার খাবার নিয়ে আসব।'

অনঙ্গ হাসিল—'এস।'

শূন্য ভোজনপাত্র লইয়া বান্ধুলি পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। অনঙ্গ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার জীবনে অভাবিত পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে ; কিন্তু বান্ধুলির সহিত বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তাহাদের প্রণয়কুঞ্জ স্থানান্তরিত হইয়াছে মাত্র। ...নাঃ, বান্ধুলিকে লইয়া পলাইতে না পারিলে জীবন বৃথা!

সে উঠিয়া গিয়া কাদামাটি লইয়া কাজ আরম্ভ করিল।

পাঁচ

বিগ্রহপালের মন লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল। বণিকের তরণী সাত সাগর পাড়ি দিয়া শেষে নিজ ঘাটের কাছে আসিয়া ডুবিবার উপক্রম করিতেছে। অমৃতের পূর্ণপাত্র অধরের কাছে আসিয়া খসিয়া পড়িতেছে! এখন কি করা যায়?

বিগ্রহপাল প্রথম দর্শনে যৌবনশ্রীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন ; তারপর যৌবনশ্রীর কোমল মধুর প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া প্রীতির রসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এতখানি চরিত্রের দৃঢ়তা যৌবনশ্রীর আছে তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই। এই দৃঢ়তার ফলে বিগ্রহপালের সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মরি মরি! কী চরিত্র! এমন চরিত্র নহিলে মগধের পট্টমহিষী হইবার যোগ্যতা আর কাহার আছে! বিগ্রহপাল এতদিন যৌবনশ্রীকে শুধুই ভালবাসিয়াছেন ; এখন শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। যৌবনশ্রীর মত নারীকে পত্নীরূপে না পাইলে জীবন মরুভূমি।

কিন্তু কী উপায়ে তাহাকে পাওয়া যায়? বিগ্রহপাল নিজে কোনও পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অনঙ্গ পরিস্থিতির কথা শুনিয়াছে কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। রন্তিদেবও শুনিয়াছেন, কিন্তু বিমর্ষভাবে মস্তকান্দোলন করিয়া 'গ্রহের ফের' বলা ছাড়া আর কিছুই

করিতে পারেন নাই।

রাত্রে বিগ্রহপালের ভাল নিদ্রা হয় নাই। প্রভাতে উঠিয়া তিনি বিক্ষিপ্তচিত্তে শয়নকক্ষে পাদচারণ করিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কথা যতবার মনে আসিল ততবার ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। ওই হতভাগা বুড়াই যত নষ্টের গোড়া। ও যদি বাক্যদান করিয়া বাক্যভঙ্গ না করিত তাহা হইলে কোনও গণ্ডগোলই হইত না। নষ্টবুদ্ধি জরদ্গব! মোহান্ধ মর্কট! অনার্য বর্বর পিশুন!

ভাবী শ্বশুরের উদ্দেশে কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া কোনও ফল হইল না, মাথায় বুদ্ধি আসিল না। বেলা বাড়িতে লাগিল। রন্তিদেব প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিগ্রহপালের মন প্রবোধ মানিল না। অনঙ্গও আসিল না। সে কোথায় গেল? বোধহয় বান্ধুলিকে লইয়া মত্ত হইয়া আছে, নহিলে এতক্ষণে একটা ফন্দি বাহির করিতে পারিত। বিগ্রহপাল ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন—হায়, আপৎকালে অতিবড় বান্ধবও ত্যাগ করে—

দ্বিপ্রহরে নামমাত্র আহার করিয়া বিগ্রহপাল শয্যায় শয়ন করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—অগ্নিকন্দুক! তিনি দ্রুত শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ত্রিপুরীতে পদার্পণ করিবার পর হইতে তিনি অগ্নিকন্দুকের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিনা যুদ্ধে শত্রুকে জয় করিবার পর অস্ত্রশস্ত্রের কথা কে মনে রাখে? কিন্তু এখন আবার বিপাকে পড়িয়া এই পরম অস্ত্রটির কথা মনে পড়িয়া গেল।

বিগ্রহপাল উঠিয়া পেটরা খুলিলেন। পেটরার তলদেশে বস্ত্রাবরণের মধ্যে অগ্নিকন্দুকটি রহিয়াছে। পলাণ্ডুকন্দের ন্যায় আকৃতি, অজ্ঞ ব্যক্তি দেখিলে ভাবিতেও পারে না উহার মধ্যে অমিতশক্তি সংহত আছে। কিন্তু বিগ্রহপাল স্বচক্ষে ইহার তেজ দেখিয়াছেন; তিনি অনেকক্ষণ কন্দুকটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর আবার পেটরার মধ্যে সযত্নে রাখিয়া দিতে দিতে মনে মনে বলিলেন—সিধা পথে যদি যৌবনাকে না পাই, স্বয়ংবর সভা ছারখার করিয়া দিব।

সন্ধ্যার পর বিগ্রহপাল নদীতীরে গেলেন। রাজপুরীর পশ্চাতে চাঁদের আলোয় বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী দাঁড়াইয়া আছেন। বিগ্রহপাল প্রথমেই গিয়া বীরশ্রীর হাত ধরিলেন—'দেবি, এ কি হল! এখন কি উপায় হবে?'

বীরশ্রী হাসিয়া বলিলেন—'উপায় হয়েছে।'

বিগ্রহপাল উত্তেজিতভাবে দুই ভগিনীর মুখ পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিলেন—'উপায় হয়েছে!'

'হয়েছে। অনঙ্গ ভদ্র উপায় বার করেছেন।'

'অনঙ্গ! সে কোথায়? তাকে কোথায় পেলেন?'

'সব বলছি, অস্থির হয়ো না। এস, ঘাসের ওপর বসি।'

তিনজন শষ্পাস্তরণের উপর বসিলেন; মধ্যে বিগ্রহ, দুইপাশে দুই ভগিনী। বীরশ্রী বান্ধুলির মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া বিগ্রহপাল কখনও ক্রুদ্ধ হইলেন, কখনও কৌতুকে হাসিলেন; ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি যে ক্রোধ হইল তাহা তরল হাস্যরসে ভাসিয়া গেল। অনঙ্গের প্রতি মনে মনে যে অবিচার করিয়াছিলেন সেজন্য লজ্জিত হইলেন। তারপর যৌবনশ্রীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন—'এবার হয়েছে তো? বানরের গলায় মালা দিতে আপত্তি নেই?'

যৌবনশ্রী মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে নীরব রহিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'যার যেমন পছন্দ।'

সেরাত্রে চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা হইল। অনন্তর বিগ্রহপাল যখন নদীতীর হইতে ফিরিয়া চলিলেন তখন তাঁহার মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। অনঙ্গ মন্দ ফন্দি বাহির করে নাই।

যৌবনশ্রীকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বটে, কিন্তু এই নূতন কৌশল আরও চমকপ্রদ, আরও নাটকীয়। সারা ভারতবর্ষে সাড়া পড়িয়া যাইবে, মুখে মুখে গল্প রচিত হইবে। লক্ষ্মীকর্ণ যেমন মগধকে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেছে তেমনি নিজে হাস্যাস্পদ হইবে। পালবংশের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ছয়

আকাশের চাঁদ স্বয়ংবরের দিন লক্ষ্য করিয়া ক্রমশ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সেদিন আবার বসন্তপূর্ণিমা—হোলিকা ; রঙ ও কুঙ্কুম খেলার দিন।

স্বয়ংবরের দিন যত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তত বড় বড় রাজারা আসিতেছেন। কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ চতুর্দোলায়। বড় রাজাদের মধ্যে আছেন উৎকলরাজ, অন্ধ্ররাজ, এবং সর্বোপরি কর্ণাটের মহাপরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্য। কর্ণাটের বিক্রমাদিত্য বয়সে পঞ্চাশোর্ধ্বগত হইলেও অদ্যাপি যুবরাজ। অতিবৃদ্ধ পিতা এখনও সিংহাসনে আসীন, তাই তিনি যুবরাজ অবস্থাতেই বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছেন। অতিশয় দুর্মদ বীর ; অনেকগুলি মহিষীর স্বামী। কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণের নিকট গোপন ইঙ্গিত পাইয়া স্বয়ংবর সভায় আসিয়াছেন।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের ব্যস্ততা প্রত্যেক নূতন রাজার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি দিবাভাগে অক্লান্তদেহে অতিথি সৎকার করিতেছেন এবং রাত্রিকালে অপর্যাপ্ত মদিরা সেবন ও ময়ূরমাংস ভক্ষণ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তবু শিল্পকর্মের কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই, অবকাশ পাইলেই চট্ করিয়া গিয়া অনঙ্গের কাজকর্ম পরিদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

অনঙ্গের শিল্পকর্ম শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। সে ইচ্ছা করিয়াই মন্থর হস্তে কাজ করিতেছে ; শীঘ্র কাজ শেষ করিলেও স্বয়ংবরের আগে ছাড়া পাওয়া যাইবে না। তাড়া কিসের ? বান্ধুলির সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইতেছে, বান্ধুলি বিগ্রহের সংবাদ আনিয়া দিতেছে। সমস্ত প্রস্তুত ; এখন স্বয়ংবরের শুভলগ্ন উপস্থিত হইলেই হয়।

অনঙ্গ বাঁশের চঞ্চারি দিয়া একটি বৃহৎ খাঁচা তৈয়ার করিয়াছে ; ইহা মূর্তির নিম্নাঙ্গ। খাঁচার অধোভাগ শূন্য, শুধু চারিপাশে ঘন কঞ্চির বেড়া, তাহার উপর মৃত্তিকার লঘু প্রলেপ। এই নিম্নাঙ্গ দেখিয়া মনে হয় মূর্তি উচ্চ আসনের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে। মূর্তির ঊর্ধ্বাঙ্গ ও হস্তদ্বয় বেত্র দিয়া নির্মিত হইয়াছে ; অঙ্গে রঞ্জিত পট্টতন্তুর বড় বড় লোম। এখনও স্কন্ধের উপর মুণ্ড বসে নাই ; যখন বসিবে তখন কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে মগধের যুবরাজ বিগ্রহপাল একটি মর্কট।

বান্ধুলি অনঙ্গের খাবার লইয়া আসে, অনঙ্গ খাইতে বসিলে ব্যাকুলনেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। যত দিন যাইতেছে তাহার মনের উদ্বেগ ততই বাড়িয়া যাইতেছে। কী হইবে ? শেষ রক্ষা হইবে তো ! এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন দিশাহারা হইয়া যায়। অথচ অনঙ্গ সম্পূর্ণ অটল, সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ; যেন তাহার কোনও দুশ্চিন্তাই নাই। বান্ধুলির ভয় ও দুশ্চিন্তা যখন অত্যন্ত বাড়িয়া যায় তখন তাহার দুই চোখে জল ভরিয়া ওঠে ; ইচ্ছা হয় ওই অটল মানুষটির বুকে মুখ গুঁজিয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। অনঙ্গ তাহার চোখের জল দেখিয়া হাসে, মুখের কাছে মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া বলে—'কেঁদো না, চন্দ্রপুলি খাও।'

নগরের মাঝখানে রন্তিদেবের গৃহে বিগ্রহপাল পিঞ্জরনিবদ্ধ বন্য ব্যাঘ্রের ন্যায় পরিক্রমণ করিতেছেন। দিনগুলি তাঁহার পিঞ্জরের লৌহ শলাকা ; একটি একটি করিয়া খসিয়া পড়িতেছে

বটে, কিন্তু যতদিন সবগুলি না খসিবে ততদিন তাঁহার উদ্ধার নাই। প্রত্যহ নদীতীরে যৌবনশ্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে, কিন্তু এ যেন প্রকৃত মিলন নয় ; দুইজনের মাঝখানে অদৃশ্য পিঞ্জরের শলাকা ব্যবধান রচনা করিয়াছে। অধীরতা দূর হইতেছে না। রন্তিদেব নানাভাবে তাঁহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, নববল পাশা ইত্যাদি খেলার দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইতেছে না।

লম্বোদরের গৃহে বেতসীর দেহ-মনে যেন স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তির জোয়ার আসিয়াছে। দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা। ওই বেঁটে খাঁদা বর্তুলচক্ষু লোকটিকে সে ভালবাসে ; কেন এত ভালবাসে সে নিজেই জানে না। স্বামী বলিয়াই যে ভালবাসে তাহা নয় ; নিতান্তই অহৈতুকী প্রীতি, রূপগুণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ভালবাসা চায়। প্রীতির ক্ষেত্রে শুধু দিয়া সুখ নাই, পাওয়াও চাই ; তবে মন ভরে। তাই হারানো ভালবাসা ফিরিয়া পাইবার আশায় বেতসী নববর্ষা সমাগমে কদম্বপুষ্পের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

লম্বোদরের মানসিক অবস্থা একটু অন্য প্রকার। সে যখন বেতসীকে খরচের খাতায় লিখিয়াছিল তখন তাহার মন স্বভাবতই বান্ধুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এখন পুনরুজ্জীবিতা বেতসী আবার তাহাকে টানিতেছে। অথচ বান্ধুলির লোভও সে ছাড়িতে পারিতেছে না। হিন্দোলার মত তাহার মন দুইজনের মাঝখানে দোল খাইতেছে। নিতান্তই বাহিরের কাজে তাহার মন গ্রস্ত হইয়া আছে তাই সে নিজের কথা ভাল করিয়া ভাবিতে পারিতেছে না ; এই স্বয়ংবরটা চুকিয়া গেলেই সে ঘরোয়া সমস্যার নিষ্পত্তি করিবে।

ওদিকে রাজপুরীতে এখন প্রায় অষ্টপ্রহরই বাঁশি বাজিতেছে। উৎসবের উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাতবর্মা শ্বশুরের সঙ্গে গিয়া সমাগত রাজন্যবর্গের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই কপটতায় তাঁহার চিত্তে সুখ নাই। স্বয়ংবর সভায় যে ব্যাপার ঘটিবে তাহার ফল যেরূপই হোক, জাতবর্মা যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন তাহা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা আছে। শ্বশুর মহাশয় লোক ভাল নয়। তিনি জানিতে পারিয়া কিরূপ মূর্তি ধারণ করিবেন তাহা চিন্তা করিয়া জাতবর্মা মনে মনে একটু উদ্বেগ ও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছেন। বীরশ্রী কিন্তু স্ত্রীজাতি, ছলনা কপটতা তাঁহার সহজাত ; তাই তিনি উদ্বেগ অপেক্ষা উত্তেজনাই অধিক অনুভব করিতেছেন।

যৌবনশ্রীর মন উদ্বেগ উত্তেজনা ও অনিশ্চিতের সংশয়ে নিরন্তর দোল খাইতেছে। রাত্রে নিদ্রা আসে না, আসিলে শেষ রাত্রে ভাঙ্গিয়া যায় ; তখন দীর্ঘকাল অন্ধকার শূন্যপানে চাহিয়া থাকেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দিনে দিনে শীর্ণা হইয়া যাইতেছেন। লুকাইয়া প্রেম করার অনেক জ্বালা।

আর আছেন অম্বিকা দেবী। রোগপঙ্গু বৃদ্ধা শয্যায় শুইয়া শুধু চিন্তা করেন। পুত্র কাছে আসে না, তাহাকে আদেশ বা তিরস্কার করিবার সুবিধা নাই। অম্বিকা দেবী মনে মনে গুমরিয়া আগ্নেয়গিরির গর্ভ-গহ্বরের ন্যায় তপ্ত হইতে থাকেন। নাতিনীকে বুকে লইয়া সান্ত্বনা দেন—'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই আমার নাতনী, গাঙ্গেয়দেবের নাতনী ; তোকে জোর করে বিয়ে দেবে এমন সাধ্য তোর বাপের নেই। যদি তা করে আমি দেশসুদ্ধ লোককে ক্ষেপিয়ে দেব, প্রজারা ডিম্ব করবে—'

যৌবনশ্রী মনে মনে ভাবেন আমার প্রিয়তমকে যদি না পাই, প্রজারা ডিম্ব করিলে কী লাভ হইবে !

এইভাবে দিবারাত্র কাটিতেছে। রাজপুরীর অন্য সকলে আনন্দে মগ্ন, কেবল যে চারিজন গূঢ়তত্ত্ব জানেন তাঁহাদের মনে আশঙ্কার ছায়া। প্রদীপের নীচে অন্ধকার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ মধ্যরাত্রির পূর্বেই মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছে ; তিথি জানা না থাকিলে মনে হইত পূর্ণিমার চাঁদ। স্বপ্নাকুল জ্যোৎস্না নগরের মাথার উপর বর্ষিত হইতেছিল, নর্মদার জলে টলমল করিতেছিল, রাজভবনের পাষাণগাত্রে সুধা-লেপন করিয়াছিল। পুরীর পশ্চাতে আম্রকুঞ্জে একটা বপ্‌পীহ পাখি বুক-ফাটা স্বরে ডাকিতেছিল—পিয়া পিয়া পিয়া !

কিন্তু চন্দ্রালোক বা পক্ষীকূজনের প্রতি মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের লক্ষ্য ছিল না। দিনের কর্ম শেষ করিয়া তিনি অপরিমিত পান-ভোজন করিলেন, তারপর ঈষৎ মদ-বিহ্বল অবস্থায় শয়ন করিতে চলিলেন। অদ্যই শেষ রজনী, কাল এই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইবে ; রাজারা সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বিদায় লইবেন। তখন পরিপূর্ণ বিশ্রামের সময় পাওয়া যাইবে।

পালঙ্কে শয়ন করিতে গিয়া তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আজ নানা কর্মের জালে আবদ্ধ হইয়া শিল্পকর্মের তত্ত্বাবধান করা হয় নাই। অথচ আজই শেষ দিন, আজ রাত্রির মধ্যে শিল্পবস্তুটি স্বয়ংবর সভায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। মধুকর সাধু অবশ্য চতুর ব্যক্তি, তাহাকে কিছু বলিতে হয় না ; কি করিতে হইবে সবই সে জানে। তবু—

লক্ষ্মীকর্ণ শিল্পশালায় গেলেন। দৌবারিক দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল হাই তুলিতেছিল, মহারাজ তাহাকে বলিলেন—'তুই যা, এবার তোর ছুটি।'

দৌবারিক দীর্ঘকাল গৃহে যায় নাই, বসন্তরজনীতে মিলনোৎসুকা বধূর কথা স্মরণ করিয়া তাহার মন বড়ই কাতর হইয়াছিল ; সে রাজার পদপ্রান্তে আভূমি নত হইয়া 'জয় হোক মহারাজ' বলিয়া দৌড় দিল।

মুখে প্রসন্ন বিহ্বল হাস্য লইয়া রাজা শিল্পশালায় প্রবেশ করিলেন। অনঙ্গ দীপ জ্বালিয়া মূর্তির অঙ্গে শেষ বারের মত প্রসাধন দিতেছিল। কবন্ধের উপর মুণ্ড বসাইয়া মূর্তিটি এখন পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। মহারাজ ঘুরিয়া ফিরিয়া মূর্তি পরিদর্শন করিলেন, তারপর দুই হস্তে পেট চাপিয়া নিঃশব্দে হাসিতে আরম্ভ করিলেন। হাসি একেবারে নিঃশব্দ নয় ; মাঝে মাঝে তাঁহার বদনগহ্বর হইতে খট্টাশহাস্যের ন্যায় নিগৃহীত শব্দ বাহির হইতে লাগিল। তিনি মূর্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর কৌতুক সংবরণ করিয়া মহারাজ অনঙ্গের পৃষ্ঠে সস্নেহ চপেটাঘাত করিলেন, বলিলেন—'সাধু ! আজ থেকে তুমি আমার সভাশিল্পী। উপস্থিত এই পুরস্কার নাও।' তিনি নিজের অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া অনঙ্গকে দিলেন—'এখন মূর্তিটা স্বয়ংবর সভায় বসাতে হবে। তুমি একা পারবে ?'

অনঙ্গ বলিল—'পারব মহারাজ। যদি না পারি, লোক যোগাড় করে নেব।'

'ভাল। কিন্তু দেখো, বেশি জানাজানি না হয়।' বলিয়া মহারাজ আর একবার পেট চাপিয়া হাস্য করিলেন, তারপর শয়ন করিতে গেলেন। স্বয়ংবরের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

অনঙ্গ দু'দণ্ড অপেক্ষা করিল, তারপর প্রদীপ ঘরের কোণে সরাইয়া রাখিয়া বাহির হইল।

রাজভবনের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পুরঃপ্রাঙ্গণ শূন্য। নবগঠিত স্বয়ংবর সভা বিস্তীর্ণ ভূমির

মাঝখানে বিপুলায়তন শুভ্র বুদ্বুদের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; সেখানেও লোকজন নাই। কিন্তু তোরণের প্রতীহার ভূমিতে প্রহরী আছে। অনঙ্গ সেখানে উপস্থিত হইলে একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি ? কোথা যাও ?'

অনঙ্গ বলিল—'আমি রাজশিল্পী মধুকর সাধু। একজন লোক ডাকতে যাচ্ছি।'

'এত রাত্রে ?'

'হাঁ, রাজার আদেশ।'

'রাজার আদেশ ?'

'হাঁ। এই দেখ রাজার অঙ্গুরীয়।'

অঙ্গুরীয় দেখিয়া প্রহরী বলিল—'রাজশিল্পী মহাশয়, আপনি যথা ইচ্ছা যেতে পারেন। কখন ফিরবেন ?'

'লোক পেলেই ফিরব। দু'তিন দণ্ড লাগবে।'

চন্দ্রালোকে অনঙ্গ নগরের দিকে চলিল। নগর নিদ্রালু, পথ জনবিরল। চতুষ্পথের উপর জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেবের গৃহে দীপনির্বাণ হইয়াছে। অনঙ্গ দ্বারে করাঘাত করিল।

বিগ্রহপাল জাগিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন রাত্রে কোনও সময় অনঙ্গ আসিবে। দুই বন্ধু কণ্ঠলগ্ন হইলেন। রন্তিদেবও বোধ করি নিদ্রা যান নাই, তিনিও আসিয়া জুটিলেন।

অন্ধকার কক্ষে চুপি চুপি কথা হইল। বিগ্রহপাল প্রস্তুত হইলেন। অসময়ে কিছু খাদ্যপানীয় গলাধঃকরণ করিলেন। পেটরা হইতে অগ্নিকন্দুক বাহির করিয়া কবচের ন্যায় বক্ষে ঝুলাইয়া লইলেন। তারপর দুই বন্ধু রন্তিদেবের পদ বন্দনা করিলেন ; হয়তো এ যাত্রা আর সাক্ষাৎ হইবে না। রন্তিদেব আশীর্বাদ করিলেন—'সর্বস্তরতু দুর্গাণি—। আমি সভায় উপস্থিত থাকব।'

রন্তিদেবের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুইজনে রাজভবনে ফিরিয়া চলিলেন। নগর এতক্ষণে নিশুতি হইয়া গিয়াছে, চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। দুইজনের পদশব্দ শূন্য পথে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাজভবনের তোরণদ্বারে প্রহরীরা ঝিমাইতেছিল, অনঙ্গ ও তাহার সাথীর আগমনে চক্ষু তুলিয়া চাহিল। অনঙ্গকে চিনিতে পারিয়া নীরবে পথ ছাড়িয়া দিল।

দুইজনে প্রথমে শিল্পশালায় গেলেন। সেখান হইতে মূর্তি বহন করিয়া স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করিলেন।

দুই

কাক কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরী জাগিয়া উঠিল। চারিদিকে হৈ হৈ হট্টগোল ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়া গেল।

যৌবনশ্রী কাল বীরশ্রী ও বান্ধুলির সহিত অনেক রাত্রি পর্যন্ত পর্যঙ্কে বসিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়াছিলেন ; তারপর বীরশ্রী নিজ কক্ষে শয়ন করিতে গিয়াছিলেন, যৌবনশ্রীও শয়ন করিয়াছিলেন। বান্ধুলি তাঁহার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়াছিল। প্রভাত হইতে বীরশ্রী একদল সখী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

বীরশ্রী হাসিমুখে ডাকিলেন—'ওঠ্ যৌবনশ্রী, বিয়ের দিনে অত ঘুমতে নেই। গ্রহাচার্য বলেছেন, সূর্যোদয়ের সাড়ে সাত দণ্ড পরে শুভকর্মের লগ্ন।'

সখীরা কলকণ্ঠে হুলুধ্বনি করিল। যৌবনা শয্যাত্যাগ করিলেন। বীরশ্রী বান্ধুলিকে বলিলেন,

'তুই বাড়ি যা। একেবারে সাজগোজ করে তৈরি হয়ে আসিস।'

ব্যবস্থা পূর্ব হইতে স্থির হইয়াছিল। বান্ধুলি চলিয়া গেল।

সখীরা যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া স্নানাগারে লইয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে পীঠিকার উপর বসাইয়া প্রথমে গোধূমচূর্ণ ও দুধের সর দিয়া গাত্র-মার্জন করিয়া দিল ; পরে চন্দন হরিদ্রা মিশ্রিত জলে গা ধুইয়া দিল ; তারপর পুষ্পসুবাসিত জলে স্নান করাইল। সঙ্গে সঙ্গে কত রঙ্গ-রস হাস্য পরিহাস চলিল। স্নানান্তে যৌবনশ্রী রক্ত পট্টাম্বর পরিধান করিলেন।

স্নানাগার হইতে প্রসাধন গৃহ। এখানে সোনার থালায় সজ্জিত বহু রত্নালঙ্কার তো ছিলই, উপরন্তু স্তবকে স্তবকে নানা জাতীয় পুষ্প পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল ; অশোক কর্ণিকার নবমল্লিকা চম্পা কুরুবক সিন্ধুবার কুন্দ কুসুম্ভ। বহু পৌরনারী বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। কেহ কাঞ্চনপাত্রে পুষ্প চন্দন অগুরু সাজাইতেছিল। একটি তরুণী মালিনী দূর্বাখচিত মধুকমালা রচনা করিতেছিল ; এই মালা গলায় দিয়া রাজকন্যা স্বয়ংবর সভায় যাইবেন। বরমাল্য প্রস্তুত হইয়াছে ; যূথীপুষ্পের ঘনসংবদ্ধ স্থূল মাল্য। ইহা একজন সখী সুবর্ণস্থালীতে লইয়া কন্যার পিছে পিছে যাইবে ; কন্যা তাহার নিকট হইতে মালা লইয়া ঈপ্সিত বরের গলায় দিবেন।

যৌবনশ্রীকে প্রসাধন কক্ষে লইয়া গিয়া সখীরা তাঁহাকে মাঝখানে বসাইয়া সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার পরাইল। কিন্তু আজ শুধু রত্নালঙ্কার নয়, পুষ্পভূষাও চাই। প্রতিটি রত্নালঙ্কারের সঙ্গে অনুরূপ পুষ্পাভরণ। সখীরা তাঁহার সিক্ত কেশ ধূপের ধুঁয়ায় শুকাইয়া কবরী রচনা করিল, চূড়াপাশে কুরুবকের গুচ্ছ আরোপ করিল, কর্ণে দিল যবাঙ্কুরের অবতংস। চক্ষে কজ্জল, ললাট ঘিরিয়া গণ্ড পর্যন্ত শ্বেতচন্দনের তিলক, কণ্ঠে মুক্তাহারের সঙ্গে দূর্বা-মধুকের মালা। বাহুতে মাণিক্যের সহিত চম্পার কেয়ূর, প্রকোষ্ঠে বজ্রমণির কঙ্কণের সহিত জড়িত কুন্দকলির মণিবন্ধ : কটিতে হিরণ্ময় চন্দ্রহারের সমান্তরালে অশোকপুষ্পের রশনা। কেবল চরণে ফুলের অলঙ্কার নাই, অলক্তরাগের উপর সোনার গুঞ্জরী নূপুর। সুন্দরীর অঙ্গে ফুলের আভরণ যতই শোভাবর্ধন করুক, পায়ে সোনার মঞ্জীর না থাকিলে প্রতি পদক্ষেপে ঝঙ্কার উঠিবে কি করিয়া!

প্রসাধন সম্পূর্ণ হইলে যৌবনশ্রী সোনার বাণ হাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যেন পূর্বগগনে অরুণোদয় হইল। সখীরা ঘিরিয়া ঘিরিয়া হুলুধ্বনি করিল, শঙ্খ বাজাইল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে কল-কোলাহল শান্ত হইল। তিনি একবার কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর ইঙ্গিতপূর্ণ হস্তসঞ্চালন করিলেন ; ইন্দ্রজালের ন্যায় কক্ষ শূন্য হইয়া গেল। কেবল যৌবনশ্রী রহিলেন।

সালঙ্কারা কন্যাকে দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণের হৃদয় গর্বে ভরিয়া উঠিল। হাঁ, স্বয়ংবর দিবার মত কন্যা বটে, রাজাগুলার মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে। তিনি কন্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যৌবনশ্রী নতজানু হইয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন।

যৌবনশ্রীর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন, 'চিরায়ুষ্মতী হও। আজ তোমাকে দেখে তোমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। তিনিও একদিন এমনি বেশে সজ্জিত হয়ে চেদিরাজ্যে এসেছিলেন।'

যৌবনশ্রী নতনেত্রে রহিলেন, তাঁহার ঠোঁট দুটি একটু কাঁপিয়া উঠিল।

লক্ষ্মীকর্ণ তখন বলিলেন—'কন্যা, আজ তোমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। অনেক পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজন যোগ্যপাত্রকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু তুমি বালিকা। জীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই তোমার নেই। তাই আমার কর্তব্য তোমাকে পরিচালন করা। যে রাজারা স্বয়ংবরে এসেছেন তাঁদের সকলকে আমি চিনি। তাঁদের মধ্যে তোমার পাণিগ্রহণের যোগ্য যদি কেউ থাকে তো সে কর্ণাটের যুবরাজ বিক্রমাদিত্য। তাঁর মত শক্তিধর যুবরাজ ভারতবর্ষে আর

নেই। তিনি বয়সে প্রবীণ, চঞ্চলমতি যুবক নয়। তাঁর গলায় বরমালা দিলে তুমি সুখী হবে।'

যৌবনশ্রী এবারও নতনেত্রে রহিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ পুনশ্চ বলিলেন—'রূপবান রাজপুত্র পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু তারা মহাকাল ফল ; তাদের চাকচিক্য ছলাকলায় ভুলো না।—লগ্নের আরও দণ্ড দুই বাকি আছে, আমি সভায় চললাম রাজাদের অভ্যর্থনা করতে। তুমি যথাসময় সভায় যাবে। আমার কথা মনে থাকবে তো ? কর্ণাটের যুবরাজ বিক্রমাদিত্য।'

যৌবনশ্রী উত্তর দিলেন না, পূর্ববৎ ভূমিলগ্ন নয়নে রহিলেন। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ মনে করিয়া লক্ষ্মীকর্ণ পরিতুষ্ট হইলেন। যৌবনশ্রী বড় ভাল মেয়ে, কখনও অবাধ্য হয় নাই। তিনি কন্যার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া প্রস্থান করিলেন।

তিন

বান্ধুলি গৃহে ফিরিয়া দেখিল গৃহের দ্বার খুলিয়াছে। সম্মুখে কেহ নাই। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অনঙ্গের কক্ষের দ্বার ঠেলিল। কক্ষে অনঙ্গ নাই ; শিল্পকর্মগুলি যেমন ছিল তেমনি সাজানো রহিয়াছে।

দরজা ভেজাইয়া দিয়া বান্ধুলি বেতসীর শয়নকক্ষে গেল। বেতসী রাত্রির বাসি কাপড় ছাড়িতেছিল। বান্ধুলি বলিল—'কুটুম কোথায় ?'

বেতসী গাল ফুলাইয়া বলিল—'কুটুম সারা রাত্রি বাড়ি আসেনি। রাজকার্য।'

বান্ধুলি বেতসীর আরও কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ধরা ধরা গলায় বলিল—'দিদি—'

বেতসী আঁচল কাঁধে ফেলিয়া বলিল—'তুই আজ সকালে এলি যে ? স্বয়ংবরে থাকবি না ?'

বান্ধুলি গলদশ্রু নেত্রে বলিল—'দিদি, আজ আমি চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছিস ?' বেতসী সশব্দে নিশ্বাস টানিল।

'জীবনে তোর সঙ্গে আর বোধ হয় দেখা হবে না'—বান্ধুলি দিদির কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেতসী হ্রস্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'সব কথা আমায় বলবি ?'

বান্ধুলি বলিল—'পরে সবই জানতে পারবি। এখন তোর শুনে কাজ নেই।'

এই সময় লম্বোদর দ্বার দিয়া উঁকি মারিল। সে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সমস্ত রাত্রি রাজাদের শিবিরের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া এখন গৃহে ফিরিয়াছে। আবার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া লওয়া প্রয়োজন। শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া সে বান্ধুলির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল।

সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—'বান্ধুলি কাঁদছে কেন ?'

বান্ধুলি চমকিয়া মুখ তুলিল, লম্বোদরকে দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল। বেতসী কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল—'তুমি এলে ! বাবা ধন্যি রাজকার্য।'

লম্বোদর সন্দিগ্ধভাবে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া আবার প্রশ্ন করিল—'কাঁদে কেন ?'

'আমি মেরেছি।' বেতসী হাসিয়া উঠিল ; পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া বলিল—'কাঁদবে না ? আজ ওর প্রিয়সখীর স্বয়ংবর, কাল তিনি স্বামীর ঘরে চলে যাবেন। ইহজন্মে হয়তো আর দেখা হবে না। তাই কাঁদছে।'

কথাটা এমন কিছু অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু লম্বোদরের মনে প্রত্যয় জন্মিল না। ভিতরে ভিতরে কী যেন একটা ঘটিতেছে, একটা পারিবারিক ষড়যন্ত্র অলক্ষিতে ঘরের কোণে জাল বুনিতেছে।

লম্বোদরের মন স্বভাবতই রহস্যভেদী, যেখানে অন্ধকার সেখানেই তার মন উঁকিঝুঁকি মারে ; কিন্তু এখন এদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর নাই। পরে ইহার নিরাকরণ করিতে হইবে। লম্বোদর উত্তরীয় এবং পাগ খুলিয়া বেশ পরিবর্তনের উপক্রম করিল। বান্ধুলি তাহাকে পাশ কাটাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

লম্বোদর বেশিক্ষণ রহিল না। বেশ পরিবর্তন করিয়া কিছু জলপান মুখে দিয়া বাহির হইয়া গেল। কেবল যাইবার পূর্বে বেতসীকে একটা প্রশ্ন করিল—'অতিথি এসেছিল ?'

বেতসী বলিল—'কৈ না তো।'—

বান্ধুলি নিজের ঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা করিল। দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন কিছু পরিল না ; সাধারণ মেঘডম্বর শাড়ি, বাসন্তীরঙের কাঁচুলি, সোনার চিল্‌মীলিকা, কানে সোনার ফুল। পায়ের নূপুর খুলিয়া ফেলিল। আর যে দুই চারিটি সোনার অলঙ্কার ছিল তাহা কর্পটে বাঁধিয়া কোমরে গুঁজিয়া লইল।

ঘরের বাহিরে আসিয়া সে দেওয়ালে মাথা ঠেকাইয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করিল। তারপর দিদির গলা ধরিয়া আর একবার কাঁদিল। তারপর রাজপুরীতে ফিরিয়া চলিল।

চার

স্বয়ংবর সভায় রাজারা আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সভার প্রধান দ্বারে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ জামাতা জাতবর্মা এবং অন্যান্য পারিষদবর্গকে লইয়া বিরাজ করিতেছেন ; মাল্যচন্দনের থালা হাতে বহু কিঙ্করীও উপস্থিত আছে। প্রত্যেক রাজার আগমনের সঙ্গে তোরণ দ্বারে গিড়িগিড়ি শব্দে দুন্দুভি বাজিতেছে। রাজারা যানবাহন হইতে অবতরণ করিয়া একটি বা দুইটি বয়স্যসহ স্বয়ংবর সভার দ্বারে উপস্থিত হইলে মাল্যচন্দন দ্বারা অভ্যর্থিত হইতেছেন এবং সভামধ্যে আপন নির্দিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত হইতেছেন।

এইখানে স্বয়ংবর সভার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সভামণ্ডপের গঠন অনেকটা মৎস্যাকৃতি। দুই প্রান্তে দুইটি প্রধান প্রবেশ দ্বার, তাছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট দ্বার আছে। মৎস্যমুখের দিকে যে দ্বার তাহার শোভা অধিক, এই দ্বার দিয়া রাজারা প্রবেশ করিবেন। ল্যাজের দিকের দ্বারটি অপেক্ষাকৃত সাদামাটা, এই পথে গণ্যমান্য নাগরিকেরা আসিয়া সভারূঢ় হইবেন। স্বয়ংবর সর্বজনগম্য অনুষ্ঠান, সকলে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে ইহাই রীতি।

সভামণ্ডপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় চতুর্দিকের দারু প্রাচীর নানা চিত্রকলায় শোভিত ; হরপার্বতীর বিবাহের দৃশ্য, রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ ; দেব দেবী যক্ষিণী রক্ষিণী। তন্মধ্যে ইন্দ্রাণীর মূর্তি প্রধান ; ইন্দ্রাণী স্বয়ংবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দারু প্রাচীরের ঊর্ধ্বে শুভ্র বস্ত্রের আবরণ। বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া উজ্জ্বল দিবালোক মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ভূমির উপর দূর্বাশ্যামল আস্তরণ। আস্তরণের উপর বীথি রচনা করিয়া দুই সারি ক্ষুদ্র মণ্ডপ সমব্যবধানে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে ; এগুলি রাজাদের বসিবার আসন। বীথি যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে নাগরিকদের বসিবার জন্য বিস্তৃত বেদী।

রাজাদের বসিবার মণ্ডপগুলি চূড়াযুক্ত মন্দিরের মত দেখিতে। তাহাদের মাথায় নানাবর্ণের কেতন উড়িতেছে। মণ্ডপের সম্মুখভাগ উন্মুক্ত, তিন ধাপ সোপান আরোহণ করিলে প্রশস্ত সিংহাসন। সিংহাসনে একাধিক লোক বসিতে পারে। মণ্ডপ ও সিংহাসন পুষ্পমালায় সজ্জিত।

রাত্রি প্রভাত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপে নাগরিক সমাগম আরম্ভ হইয়াছে ; মঞ্চে তিল ধারণের স্থান নাই। স্বয়ংবর দর্শনের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে অনেকেরই হয় নাই ; সকলে বসিয়া চাপা উত্তেজনার সহিত জল্পনা করিতেছেন ; মণ্ডপের এটা ওটা লইয়া আলোচনা হইতেছে। একটি মণ্ডপের সম্মুখে সূক্ষ্ম বস্ত্রের যবনিকা ঝুলিতেছে ; ইহার মধ্যে কী আছে এই লইয়া অনেকের মধ্যে বিতণ্ডা চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন স্বয়ং রাজকুমারী ওখানে লুক্কায়িত আছেন ; কেহ বলিতেছেন, না ওখানে বসিয়া আছেন বীরশ্রীর স্বামী জাতবর্মা, যৌবনশ্রীও তাঁহাকেই মাল্যদান করিবেন। কিন্তু কাহারও অনুমান সন্তোষজনক হইতেছে না।

নাগরিকদের মঞ্চের এক পাশে প্রবেশ-পথের নিকটে লম্বোদর আসিয়া বসিয়াছে এবং নাগরিকদের কথাবার্তা শুনিতেছে। তাহার দলের অন্য চরেরাও নাগরিকদের মধ্যে ইতস্তত বসিয়া আছে। আজ স্বয়ংবর সভার অভ্যন্তর ভাগে দৃষ্টি রাখা তাহাদের কাজ।

লম্বোদরের চক্ষুকর্ণ যদি স্বয়ংবর সভার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সভার পশ্চাদ্ভাগে সঞ্চারিত হইত তাহা হইলে সে বিশেষ বিচলিত হইত সন্দেহ নাই। মণ্ডপের পিছন দিকে একটি নিভৃত স্থানে অনঙ্গ দাঁড়াইয়া ছিল ; তাহার দুই পাশে দুইটি ঘোড়া, রোহিতাশ্ব এবং দিব্যজ্যোতি। অদূরে একটি লতাকুঞ্জের আড়ালে দাঁড়াইয়া বান্ধুলি সঙ্কেত ধ্বনির অপেক্ষা করিতেছিল। পুরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইবার এই দিকে একটি স্বতন্ত্র দ্বার আছে, ভৃত্যদের যাতায়াতের পথ।

ওদিকে সভার সম্মুখদিকে গিড়িগিড়ি দুন্দুভি বাজিতেছে ; রাজারা একে একে আসিয়া স্বয়ংবর সভায় নির্দিষ্ট মণ্ডপে বসিতেছেন। সকলের দেহে বিচিত্র সজ্জা ; অঙ্গদ কুণ্ডল কেয়ূর কাঞ্চি মুক্তাহার। সেকালে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বসনভূষণে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। অবশ্য রাজারা সভারোহণ কালে কটিতে তরবারি ধারণ করিতেন।

যা হোক, রাজারা নিজ নিজ মণ্ডপে বসিয়া তাম্বূলচর্বণ করিতে করিতে বয়স্যের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে রসালাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মণ্ডপগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিল। সর্বশেষে আসিলেন কর্ণাটের বিক্রমাদিত্য। প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ, কিন্তু রত্নালঙ্কারে তাঁর দেহের কঠিন পৌরুষ ঢাকা পড়ে নাই। তিনি কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর লগ্নকাল উপস্থিত হইলে স্বয়ংবর-কন্যার চতুর্দোলা সভার দ্বারে উপস্থিত হইল।

পাঁচ

রাজপুরীর সিংহদ্বার হইতে স্বয়ংবর সভার কদলীস্তম্ভ শোভিত প্রধান প্রবেশ-পথ যদিও মাত্র এক রজ্জু দূরে তথাপি রাজকন্যা চতুর্দোলায় আরোহণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় আসিলেন। যাহা চিরাচরিত রীতি তাহা পালন করিতে হইবে। একদল সখী চতুর্দোলার অগ্রে ও পশ্চাতে লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিতে করিতে আসিল। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইল।

রাজকুমারী সভাদ্বারে চতুর্দোলা হইতে অবতরণ করিলেন, যেন মেঘলোক হইতে হিরণ্ময়ী বিদ্যুল্লতা নামিয়া আসিল। রাজা লক্ষ্মীকর্ণ কন্যার বাহু ধরিয়া সভামধ্যে লইয়া গেলেন, জাতবর্মা রাজপুরোহিত ও ভট্ট প্রভৃতি সঙ্গে রহিলেন।

রাজগণ এযাবৎ শ্লথভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, যৌবনশ্রীর আবির্ভাবে জ্যা-বদ্ধ ধনুর ন্যায় টান হইয়া বসিলেন, তাঁহাদের স্নায়ুতন্তু যেন টঙ্কার দিয়া উঠিল। তাঁহাদের সম্মিলিত চক্ষু একঝাঁক তীরের মত যৌবনশ্রীর উপর গিয়া পড়িল।

সভার অপরপ্রান্তে নাগরিকবৃন্দের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সারসের মত গলা

উঁচু করিয়া একদৃষ্টে রাজকুমারীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একটি অস্ফুট হর্ষ-গুঞ্জন তাঁহাদের মধ্য হইতে উত্থিত হইল।

লক্ষ্মীকর্ণ এতক্ষণে কন্যাকে লইয়া রাজমণ্ডপ শ্রেণীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি পুরোহিতকে ইঙ্গিত করিলেন ; পুরোহিত সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক স্বস্তিসূচনা করিলেন। তারপর রাজার ইঙ্গিতে সম্মুখে আসিলেন ভট্ট। সে সময় প্রত্যেক রাজার একজন করিয়া ভাট থাকিত, ভাটেরা ছিল রাজাদের বাক্‌প্রতিভূ। সদসি বাক্‌পটুতা সকল রাজার ছিল না, ভাটেরা রাজার বক্তব্য নিপুণভাবে প্রকাশ করিত। লক্ষ্মীকর্ণের ভাট একজন সৌম্যকান্তি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ; মুণ্ডিত শীর্ষে সুপুষ্ট শিখা, স্কন্ধে উপবীত, অধরে একটু সরস হাস্য। ভাট মহাশয় প্রথমে রাজাদের সম্বোধন করিয়া রাজকুমারীর পরিচয় দিলেন, তাঁহার বংশগরিমা কীর্তন করিলেন ; তারপর রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া একে একে রাজাদের পরিচয় দিলেন। পরিশেষে মুখের একটি চটুল ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'রাজনন্দিনি, সকল রাজা ও রাজপুত্রের গৌরব-গরিমার কথা তোমাকে শুনিয়েছি, কেবল একটি রাজপুত্রের কথা এখনও বলা হয়নি। ওই যে আবরণের অন্তরালে মণ্ডপটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে ওতে বিরাজ করছেন মগধের যুবরাজ পরম শ্রীমন্ত বিগ্রহপাল।'

যৌবনশ্রী অবিচলিত মুখে নির্দিষ্ট মণ্ডপের দিকে চাহিলেন। রাজারা একসঙ্গে সেইদিকে ঘাড় ফিরাইলেন। মণ্ডপের আবরণ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। রাজারা দেখিলেন, মণ্ডপের মধ্যে বসিয়া আছে এক নরাকৃতি মর্কটমূর্তি। তাহার সর্বাঙ্গ দীর্ঘ কপিশ লোমে আবৃত, কিন্তু মুখখানা সম্পূর্ণ বানরাকৃতি নয়। যাঁহারা বিগ্রহপালকে পূর্বে দেখিয়াছেন তাঁহাদের চিনিতে কষ্ট হইল না, মূর্তির মুখের সহিত মগধের যুবরাজের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

রাজারা এই উপাদেয় রসিকতা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিলেন। কর্ণাটের বিক্রমাদিত্যের কঠোর অধরে একটু বক্র হাসি দেখা দিল ; অন্য সকলে অট্টহাস্য করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিলেন।

অতঃপর রাজকীয় হর্ষোল্লাস প্রশমিত হইলে সভার মূল ক্রিয়া আরম্ভ হইল, রাজকন্যা পতিবরণে অগ্রসর হইলেন। আগে আগে চলিলেন ভট্ট, তাঁহার পিছনে যৌবনশ্রী ; যৌবনশ্রীর পশ্চাতে হেমস্থালীতে বরমাল্য লইয়া এক সখী, তারপর নানা উপচার বহন করিয়া অন্যান্য সখীরা।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে স্বয়ংবরের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পর স্বয়ংবরের বর্ণনা লিখিতে যাওয়া ঘোরতর ধৃষ্টতা। তবু কালিদাস যে সময়ে লিখিয়াছিলেন তাহার পর কয়েক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, রীতি নীতি আচারের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কালিদাসের কালে পরিচারিকা স্বয়ংবর-কন্যার সঙ্গে থাকিয়া রাজাদের পরিচয় দিত, অধুনা ভট্ট সেই কাজ করিতেছেন। কিন্তু মোটের উপর আচার অনুষ্ঠান প্রায় একই প্রকার আছে। তাই, যাঁহারা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছে স্বয়ংবর সভার ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষ্মীকর্ণ জাতবর্মা প্রভৃতি দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভট্ট মহাশয় এক রাজার মণ্ডপ হইতে অন্য রাজার মণ্ডপের দিকে যৌবনশ্রীকে লইয়া চলিলেন। এবার রাজাদের পূর্ণ পরিচয় না দিয়া কেবল নামধামের উল্লেখ করিলেন ; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া যৌবনশ্রীর পানে তাকাইলেন ; তারপর আবার অগ্রসর হইলেন। যে-রাজা পিছনে পড়িলেন তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, যিনি সম্মুখে আছেন তাঁহার মুখ এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে। অন্ধকার রাত্রে কেহ যেন দীপ হস্তে রাজপথ দিয়া চলিয়াছে ; সম্মুখে আলো, পিছনে অন্ধকার।

এইরূপে কয়েকটি রাজমণ্ডপ অতিক্রম করা হইল। কর্ণাটকুমার বিক্রমাদিত্য ও আরও

কয়েকজন রাজার মণ্ডপ এখনও বাকি আছে, যৌবনশ্রী বিগ্রহপালের মণ্ডপ-সম্মুখে উপনীত হইলেন। নাগরিক সঙ্ঘের মধ্য হইতে একটি গুঞ্জন উত্থিত হইয়াই শান্ত হইল। ভট্ট মহাশয় বঙ্কিম হাসিয়া বলিলেন—'রাজকুমারি, ইনি পাটলিপুত্রের যুবরাজ বিগ্রহপাল।' বলিয়া রাজকুমারীর মুখের পানে না চাহিয়াই সম্মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজকুমারী কিন্তু চলিলেন না। তিনি কিছুক্ষণ মণ্ডপস্থ মর্কটমূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর প্রধানা সখীর দিকে ফিরিয়া স্থালী হইতে বরমাল্য তুলিয়া লইলেন।

সভায় যেটুকু শব্দ ছিল তাহাও এবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ভট্ট থমকিয়া পিছু ফিরিলেন। দূরে সভার দ্বারমুখে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের বিরাট দেহ অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন।

যৌবনশ্রী মূর্তির দিকে ফিরিয়া কম্পিত মৃদুস্বরে ডাকিলেন—'কুমার।'

মূর্তি নড়িয়া উঠিল, তারপর উল্টাইয়া পিছন দিকে পড়িল। রাজারা তড়িৎপৃষ্টের ন্যায় স্ব স্ব মণ্ডপে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দেখিলেন মূর্তির নিম্নভাগের শূন্য কোটর হইতে এক যুবাপুরুষ বাহির হইয়া যৌবনশ্রীর সম্মুখে দাঁড়াইল ; যৌবনশ্রী তাহার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিলেন।

লোমহর্ষণ কাণ্ড ! সমস্ত সভা একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের ব্যাঘ্র-চক্ষুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্ফুরিত হইল। নাগরিকমণ্ডলীর ভিতর হইতে কে একজন তীক্ষ্ণোচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'ধন্য ! রাজকুমারী সত্যকার বিগ্রহপালের গলায় মালা দিয়েছেন।' বক্তা আর কেহ নয়, জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেব।

কলরব আরও বাড়িয়া গেল। রাজারা মণ্ডপ হইতে নামিয়া অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ দন্ত কড়মড় করিয়া একটানে কোষ হইতে তরবারি বাহির করিলেন, তারপর বৃষভ-গর্জন করিয়া বিগ্রহপালের প্রতি ধাবিত হইলেন। আজ আর কাহারও নিস্তার নাই। ওই অধম তস্করপুত্রটাকে তিনি বধ তো করিবেনই, কুলকজ্জল কন্যাটাকেও কাটিয়া ফেলিবেন।

লক্ষ্মীকর্ণকে কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না। যৌবনশ্রী পিতাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া বিগ্রহপালের বুকের কাছে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিগ্রহপাল মনস্থ করিয়াছিলেন—মূর্তির তলদেশে বসিয়া বসিয়া তিনি চিন্তা করিবার প্রচুর অবসর পাইয়াছিলেন—ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্বে তিনি মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ ও সভাস্থ রাজবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিবেন ; বলিবেন—'হে আর্যগণ, রাজকুমারী যৌবনশ্রী আর্যরীতি অনুসারে আমার কণ্ঠে বরমাল্য দান করিয়াছেন, সুতরাং আপনাদের রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। রাজকুমারী যদি মর্কটের গলায় মালা দিতেন তাহাও আর্যরীতি অনুযায়ী সিদ্ধ হইত। আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং আনন্দিত মনে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করুন।' কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ তরবারি উঁচাইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন, রাজারাও লোচন ঘূর্ণিত করিতেছেন, এখন বক্তৃতা চলিবে না। বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্বেই মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইবে।

অগ্নিকন্দুকটি বুকের কাছে ঝুলিতেছিল, সেটি ডান হাতে লইয়া বিগ্রহপাল বাম হস্তে যৌবনশ্রীর স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া লইলেন, চুপিচুপি বলিলেন—'ভয় পেও না।' তারপর অগ্নিকন্দুকটি সবেগে মাটিতে আছাড় মারিলেন।

বিরাট ভূমিকম্পে যেন সভাগৃহ কাঁপিয়া উঠিল ; কর্ণবিদারী শব্দের সঙ্গে মাটি হইতে এক ঝলক আগুন ছিটকাইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ কটুগন্ধ ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বিগ্রহপাল বলিলেন—'চল এবার পালাই।' বলিয়া যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া পাশের একটি দ্বারের দিকে লইয়া চলিলেন।

ছয়

যৌবনশ্রী যখন সভাগৃহে প্রবেশ করেন তখন লম্বোদর নাগরিকমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল যে অনুবর্তিনী সখীদের মধ্যে বান্ধুলি নাই। বান্ধুলি রাজকন্যার নিকটতমা সখী, সে উপস্থিত নাই কেন ? কোথায় গেল ? লম্বোদরের সন্দিগ্ধ মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল।

তারপর বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। মৃন্মূর্তির তলা হইতে জীবন্ত মানুষ বাহির হইয়া আসিল। রাজকুমারী তাহার গলায় মালা দিলেন, এবং সর্বশেষে বিকট অপার্থিব শব্দ হইয়া সভা ধূমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। লম্বোদর অতিশয় স্থিরবুদ্ধি মানুষ, কিন্তু তাহার মাথাটাও গোলমাল হইয়া গেল।

ওদিকে রাজাদের অবস্থা সত্যই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ গগনভেদী শব্দ তাঁহারা জীবনে শোনেন নাই, তাই শব্দ শুনিয়া তাঁহাদের হস্তপদ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। যাঁহাদের চলচ্ছক্তি একেবারে লোপ পায় নাই তাঁহারা কেহ স্খলিতপদে কেহ জানু সাহায্যে সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; রাজকন্যার পলায়মানা সখীরা চিৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের ঘাড়ের উপর পড়িতেছিল ; কিন্তু কেহই ভ্রূক্ষেপ করিতেছিলেন না। কলিঙ্গের দুই রাজপুত্র দৃঢ়ভাবে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছিলেন। অভ্যাগত রাজাদের মধ্যে কেবল কর্ণাটের বিক্রম ধৈর্য হারান নাই, তিনি মুক্ত কৃপাণহস্তে নিজ মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধূমজালের মধ্যে সতর্কভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

সর্বাপেক্ষা দুর্গতি হইয়াছিল মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের। ক্রোধান্ধ রক্তপিপাসু মন লইয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ পৈশাচিক শব্দের আঘাতে তিনি মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন ; ক্রোধের স্থানে ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল। তিনি সেই অবস্থায় থাকিয়া ইতিউতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কয়েকজন রাজা ও সখী তাঁহাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া গেল তিনি লক্ষ্য করিলেন না। পিশাচ ! দীপঙ্করের পিশাচ এখানেও আসিয়া জুটিয়াছে।

নাগরিকমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। দলবদ্ধ জনতা এরূপ অবস্থায় যাহা করিয়া থাকে ইহারাও তাহাই করিয়াছিল। অগ্নিকন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাহারা ক্ষণকাল বিমূঢ় অবস্থায় রহিল, তারপর বাঁধভাঙা জলস্রোতের ন্যায় হুড়মুড় শব্দে পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইতে লাগিল। ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতিতে কয়েকজনের হাত-পা ভাঙিল কিন্তু কেহ তাহা গ্রাহ্য করিল না :

এই পলায়মান জনস্রোতের আবর্তে লম্বোদর পড়িয়া গিয়াছিল। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বাহিরের দিকে চলিয়াছিল, কিন্তু দ্বার দিয়া বাহির হইতে পারিল না। সেখানে বড় পেষাপেষি। ভাগ্যক্রমে সে জনতার পাশের দিকে ছিল, তাই দুই-চারিবার সজোরে কফোণি তাড়না করিয়া জনতার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইল। অনতিদূরে ক্ষুদ্র একটি খিড়কি দ্বার, লম্বোদর সেই পথ দিয়া সভা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকটা নির্জন, গণ-সম্বাধের ভিড় নাই। কিন্তু ও কি ? লতাকুঞ্জের নিকটে দুইটা ঘোড়া দাঁড়াইয়া আছে ; শিল্পী মধুকর লাল ঘোড়াটার পিঠের উপর বসিয়া আছে এবং বান্ধুলিকে টানিয়া নিজের কোলের কাছে তুলিতেছে। বান্ধুলি তিলমাত্র আপত্তি করিতেছে না, বরং সেও ঘোড়ায় চড়িবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীলা।

পাগলের মত চিৎকার করিয়া লম্বোদর সেই দিকে ছুটিল। তাহার চিৎকারে অনঙ্গ ও বান্ধুলি দুইজনেই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল। ইত্যবসরে বান্ধুলি ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া বসিয়াছে। সে অনঙ্গের গলা জড়াইয়া ধরিল, অনঙ্গ ঘোড়ার নিতম্বে কশাঘাত করিল ; ঘোড়াটা হরিণের মত

লাফ দিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

লম্বোদর দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোড়ার পিছনে ছুটিয়া সে পলাতকদের ধরিতে পারিবে না এ-জ্ঞান তাহার ছিল। সে বিমূঢ় চক্ষু ফিরাইয়া দ্বিতীয় ঘোড়াটার দিকে চাহিল। শ্বেতবর্ণ অশ্ব পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। কাহার ঘোড়া? এখানে দাঁড়াইয়া আছে কেন? যাহার ঘোড়াই হোক, ইহার পিঠে চড়িয়া পলাতকদের তাড়া করিলে ধরা যাইবে কি? ধরিলেও আটকাইয়া রাখা যাইবে কি?

পিছনে শব্দ শুনিয়া লম্বোদর চকিতে ফিরিল। স্বয়ংবর সভার পাশের একটি দ্বার দিয়া যৌবনশ্রী বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে সেই যুবক যাহার গলায় তিনি মালা দিয়াছিলেন—বিগ্রহপাল! দুইজন হাত ধরাধরি করিয়া প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে এই দিকেই আসিতেছেন। মুহূর্তের মধ্যে লম্বোদরের মাথাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। বান্ধুলিকে লইয়া মধুকর পলাইয়াছে, রাজকুমারীকে লইয়া বিগ্রহপাল পলায়ন করিতেছে। সাদা ঘোড়াটা ইহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে! ষড়যন্ত্র! চক্রান্ত!

লম্বোদর আর চিন্তা করিল না, প্রহর্তুমুদ্যত ষণ্ড যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করে সেইভাবে বিগ্রহপাল ও যৌবনশ্রীর দিকে ছুটিল। তাঁহাদের নিকটে গিয়া সে যৌবনশ্রীর পদতলে আছড়াইয়া পড়িল, দুই বাহু দিয়া সবলে তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া রাসভনিন্দিত কণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল—'ধরো ধরো—শীঘ্র এস—পালাচ্ছে—'

যৌবনশ্রী চলৎশক্তিহীন; লম্বোদর এমনভাবে পা সাপ্টাইয়া ধরিয়াছে যে নড়িবার সামর্থ্য নাই। তিনি ব্যাকুল চক্ষে বিগ্রহপালের পানে চাহিলেন।

বিগ্রহপালের হাতে যদি তরবারি থাকিত নিঃসন্দেহে লম্বোদরকে হত্যা করিতেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত্র, যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। বৃথা চেষ্টা; লম্বোদর কর্কটের মত যৌবনশ্রীর পা আঁকড়াইয়া রহিল। বিগ্রহপাল তাহাকে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; লম্বোদর আরও তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিল—'বাঁচাও। কে আছ—শীঘ্র এস!'

এবার স্বয়ংবর সভার পাশের দ্বার দিয়া লক্ষ্মীকর্ণ বাহির হইলেন। এতক্ষণে তাঁহার পিশাচ-ভয় কাটিয়াছে। তাঁহার পিছনে কয়েকজন রাজাও আছেন, সকলের হস্তে তরবারি। পৈশাচিক শব্দের পুনরাবৃত্তি হইল না দেখিয়া তাঁহাদের ক্ষাত্রতেজ আবার মাথা তুলিয়াছে। যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালকে দেখিয়া তাঁহারা রৈ রৈ শব্দে সেইদিকে ধাবিত হইলেন।

যৌবনশ্রী তাঁহাদের দেখিয়া ভয়ার্তকণ্ঠে বলিলেন—'কুমার, তুমি যাও, আর এখানে থেকো না। ওরা তোমাকে হত্যা করবে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আর তুমি?'

'আমার যা হবার হবে, তুমি যাও।'

'না।'

যৌবনশ্রী ব্যাকুলস্বরে বলিলেন—'কুমার, আমার কথা শোনো। পিতা আমাকে হত্যা করবেন না। আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকব। তুমি আবার এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।'

বিগ্রহপাল সম্মত হইলেন। নিরস্ত্র অবস্থায় সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া মৃত্যুবরণ করা মূঢ়তা। লক্ষ্মীকর্ণ ও রাজার দল তখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, বিগ্রহপাল তাহাদের দিকে বহ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'তাই হবে। আবার আমি আসব। কিন্তু এবার একলা আসব না।'

যৌবনশ্রীর হাত ছাড়িয়া তিনি ছুটিয়া দিব্যজ্যোতির পাশে গেলেন, এক লাফে তাহার পিঠে উঠিয়া বসিলেন। দিব্যজ্যোতি বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল।

শিকার হাতছাড়া হইয়া গেল দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণ ব্যর্থ ক্রোধের হুঙ্কার ছাড়িলেন, তারপর

পাকশাট খাইয়া কন্যার দিকে ফিরিলেন ; জলন্ত চোখে বলিলেন—'কুলকলঙ্কিনি, তোর মনে এই ছিল ! বংশের মুখে কালি দিলি । আজ তোকে কেটে ফেলব ।'

তিনি তরবারি তুলিলেন । কিন্তু কাটা হইল না, রাজারা নিবারণ করিলেন । নিন্দা-কলঙ্ক যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ; শুধু লক্ষ্মীকর্ণের নয়, নিমন্ত্রিত রাজাদেরও ; নারীহত্যা করিলে তাহার মাত্রা কমিবে না । যৌবনশ্রীর মুখে রাগদ্বেষ লজ্জাভয় কিছুই নাই, তিনি মুকুলিত নেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন । লম্বোদর এতক্ষণে কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল । কিন্তু তাহার পানে কেহ ফিরিয়া চাহিল না । তাহার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, সে অলক্ষিতে পিছনে সরিয়া গেল ।

অতঃপর রাজারা একজোট হইয়া লক্ষ্মীকর্ণকে ভর্ৎসনা করিলেন । তাঁহারা কিছু আর বলিতে বাকি রাখিলেন না । বিশেষত কর্ণাটকুমার বিক্রমের রসনার ধার তাঁহার অসির ধার অপেক্ষা কোনও গুণে কম নয় ; তিনি বাছা বাছা কটুবাক্য ও ধিক্কার লক্ষ্মীকর্ণের শিরে বর্ষণ করিলেন । তুমি নির্লজ্জ ও নির্বোধ । যেমন তোমার হস্তীর মত আকার তেমনি হস্তিমূর্খ তুমি । যাহার কন্যা গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত সে স্বয়ংবর সভা আহ্বান করে কোন্ লজ্জায় ! যে নিজের অবরোধের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারে না সে রাজ্যশাসন করিতে চায় কোন্ স্পর্ধায় ! ইত্যাদি ইত্যাদি । অন্য রাজারা সঙ্গে সঙ্গে ঘৃতাহুতি দিলেন । মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ বক্ষে তুষানল জ্বালিয়া সব শুনিলেন, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না ।

রাজারা হৃদয়ভার লাঘব করিয়া প্রস্থান করিবার পর লক্ষ্মীকর্ণ বজ্রমুষ্টিতে কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া চলিলেন ।

সাত

অনঙ্গ ও বান্ধুলিকে পিঠে লইয়া রোহিতাশ্ব বায়ুবেগে নগর পার হইয়া গেল । ক্ষুরধ্বনিতে সচকিত নগরের পথচারীরা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল, এক ঘোড়ার পিঠে যুগলমূর্তি ! তাহারা নানাবিধ জল্পনা করিল । এরূপ দৃশ্য পূর্বে এ নগরে দেখা যায় নাই । কালে কালে এ সব হইতেছে কী ? কলি—ঘোর কলি ।

নগর অতিক্রম করিয়া রোহিতাশ্ব যখন শোণ-ঘাটের পথ ধরিল তখনও অনঙ্গ তাহার গতি শ্লথ করিল না, কেবল মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল বিগ্রহ যৌবনশ্রীকে লইয়া আসিতেছে কিনা । এ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই পরিকল্পিত পথে চলিয়াছে ; অগ্নিকন্দুক ফাটিয়াছে, সভায় বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে বিগ্রহ যৌবনশ্রীকে লইয়া নিশ্চয় পলায়ন করিতে পারিবে । কিন্তু লম্বোদরটা হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ? সে কোনও প্রকার বিঘ্ন করিবে না তো ? নাঃ, বিগ্রহকে লম্বোদর ঠেকাইতে পারিবে না । তবু অনঙ্গ মনে মনে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল ।

রোহিতাশ্ব ছুটিয়া চলিয়াছে, নির্জন অশ্মাচ্ছাদিত পথে তাহার ক্ষুরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে । বান্ধুলি অনঙ্গের বুকের উপর ছিন্নমূল লতার মত পড়িয়া আছে, তাহার মুদিত অক্ষিপল্লব অল্প অল্প স্ফুরিত হইতেছে, মুখ রক্তহীন । অনঙ্গ তাহার পানে দৃষ্টি নামাইয়া হাসিমুখে ডাকিল—'বান্ধুলি !'

বান্ধুলির চোখ দুটি খুলিয়া গেল । অনঙ্গের মুখে হাসি দেখিয়া তাহার অধরেও একটু হাসি ফুটি-ফুটি করিল, কিন্তু ফুটিল না ; অধর একটু কাঁপিল মাত্র । সে আবার চক্ষু মুদিত করিল । তাহার বাম বাহু আরও দৃঢ়ভাবে অনঙ্গের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল ।

অনঙ্গ তাহার কানের উপর মুখ রাখিয়া বলিল—'তোমার এখনো ভয় করছে ?...আমার মনে হচ্ছে পক্ষীরাজে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছি।'—

শোণের ঘাটে বণিকের নৌকা নাই, লোকজন নাই। কিন্তু গরুড় তাহার দলবল লইয়া উপস্থিত আছে। নৌকা পাড়ি দিবার জন্য প্রস্তুত।

অনঙ্গ বান্ধুলিকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া নৌকায় তুলিল। তাহাকে রইঘরে বসাইয়া বাহিরে আসিল। বিগ্রহপালের এখনও দেখা নাই। এত দেরি হইতেছে কেন ? এদিক ওদিক চাহিয়া অনঙ্গ দেখিল, জাতবর্মার নৌকা অদূরে বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দাঁড়ী-মাঝি কেহ নাই, নৌকা শূন্য। অনঙ্গ গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিল—'ও নৌকার লোকজন গেল কোথায় ?'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, ওরা স্বয়ংবর দেখতে নগরে গিয়েছে।'

'কেউ নেই ?'

'না। আমাদের বলে গেছে ওদের নৌকার উপর যেন দৃষ্টি রাখি।'

অনঙ্গ চিন্তা করিল। লক্ষ্মীকর্ণ নিশ্চয় তাড়া করিবে, ছাড়িবে না। ঘাটে আসিয়া যে-নৌকা পাইবে তাহাতে চড়িয়া তাড়া করিবে। জাতবর্মার নৌকায় এখন নাবিক নাই বটে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে পারে ; তখন জাতবর্মার নৌকায় চড়িয়া লক্ষ্মীকর্ণ পশ্চাদ্ধাবন করিবে। অতএব জাতবর্মার নৌকাটাকে বানচাল করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

অনঙ্গ গরুড়কে বলিল—'তুমি লোকজন নিয়ে ও নৌকায় যাও। যত দাঁড় আছে সব এ নৌকায় নিয়ে এস।'

গরুড় জিজ্ঞাসুনেত্রে একবার অনঙ্গের পানে চাহিল, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়া আদেশ পালনে অগ্রসর হইল।

সব দাঁড়গুলি এ নৌকায় উঠিয়াছে এমন সময় দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। অনঙ্গ নৌকা হইতে লাফাইয়া তীরে নামিল। দিব্যজ্যোতির পিঠে বিগ্রহপাল আসিতেছেন। কিন্তু যৌবনশ্রী কোথায় ?

ঘোড়া থামিবার পূর্বেই অনঙ্গ ছুটিয়া গিয়া তাহার বল্‌গা ধরিল—'দেবী যৌবনশ্রী ?'

বিগ্রহপাল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলিলেন—'তাকে আনতে পারলাম না।'

নৌকা ঘাট ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বায়ু প্রতিকূল তাই পাল তোলা হয় নাই, ছয়জন দাঁড়ী দাঁড় ধরিয়াছে। নৌকা স্রোতের মুখে গিয়া পড়িল।

অনঙ্গ ও বিগ্রহপাল রইঘরের ছাদে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ঘাটের দিকে চাহিয়া আছেন।

বান্ধুলি চুপিচুপি আসিয়া অনঙ্গের পাশে দাঁড়াইল, চুপিচুপি তাহার একটা আঙ্গুল মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া তীরের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। এরূপ সময়ে কত বিচিত্র হৃদয়াবেগ নারীর চিত্ত জুড়িয়া বসে তাহার ইয়ত্তা নাই। অশ্রুধারাই তাহার একমাত্র অভিব্যক্তি।

ঘাটে জনমানব নাই। লক্ষ্মীকর্ণের দল এখনও আসে নাই, কিম্বা হয়তো আসিবে না ; যৌবনশ্রীকে তাহারা ধরিয়াছে, না আসিতেও পারে। ঘাটে কেবল দুইটি অশ্ব তীরের অতি নিকটে আসিয়া গ্রীবা বাড়াইয়া নৌকার পানে নিষ্পলক চাহিয়া আছে। দিব্যজ্যোতি ও রোহিতাশ্ব। তাহারা কি বুঝিয়াছে যে তাহাদের প্রভু চলিয়া যাইতেছে, আর ফিরিবে না ?

বিগ্রহপাল সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন—'দিব্যজ্যোতি আর রোহিতাশ্বকেও ফেলে যেতে হল !'

গ্র

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক

স্বয়ংবর অনুষ্ঠানের গোড়া হইতেই জাতবর্মা শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। প্রকাশ্যভাবে যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালের পলায়নে সাহায্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, সাহায্য প্রয়োজন হইবে এ সম্ভাবনাও তাঁহার মনে আসে নাই। তাই, যৌবনশ্রী যখন ধরা পড়িয়া গেলেন তখন জাতবর্মা কিছুই করিতে পারিলেন না। মুহূর্তমধ্যে একটা অঘটন ঘটিয়া গেল ; কোথাকার একটা নগণ্য ভৃত্য সব পণ্ড করিয়া দিল।

লক্ষ্মীকর্ণ যৌবনশ্রীকে হাত ধরিয়া অবরোধে টানিয়া লইয়া চলিলে জাতবর্মাও সঙ্গে চলিলেন। শ্বশুরের প্রতি তাঁহার মন কোনও কালেই প্রসন্ন ছিল না, এখন আরও বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তবু শ্বশুরগৃহে শ্বশুরের সহিত কলহ বাঞ্ছনীয় নয়, তিনি যথাসাধ্য শান্তস্বরে বলিলেন—'মহাশয়, এ আপনার অনুচিত। কন্যা যার গলায় সর্বসমক্ষে বরমাল্য দিয়েছে তাকে আপনার গ্রহণ করা উচিত ছিল। নইলে স্বয়ংবরের সার্থকতা কি ?'

লক্ষ্মীকর্ণের চক্ষু দেখিয়া মনে হইল এখনি চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে। তিনি সেই চক্ষু জামাতার দিকে ফিরাইয়া গলার মধ্যে গূঢ় শব্দ করিলেন—'ষড়যন্ত্র ! চক্রান্ত ! সবাই বিশ্বাসঘাতক।'

জাতবর্মা এবার প্রকাশ্যভাবেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—'ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী আপনি। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করতেন ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন হত না।'

লক্ষ্মীকর্ণের ইচ্ছা হইল জাতবর্মাকে কাটিয়া ফেলেন। কন্যার বৈধব্য না ঘটাইয়া জামাতাকে কাটিয়া ফেলা সম্ভব হইলে তিনি অবশ্য তাহা করিতেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব জানিয়া বলিলেন—'কালসাপ ! আমি ক্ষীর খাইয়ে কালসাপ পুষেছি।'

জাতবর্মা দেখিলেন তর্ক করা বৃথা। তিনি অতি কষ্টে আত্মনিগ্রহ করিয়া নীরব রহিলেন, মনস্থ করিলেন অবিলম্বে পত্নীকে লইয়া পাপপুরী ত্যাগ করিবেন। এমন যাহার শ্বশুর তাহার শ্বশুরালয় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের নামান্তর মাত্র। রাজভবনে প্রবেশ করিয়া তিনি বীরশ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সংবাদ রাজপুরীতে রাষ্ট্র হইয়াছিল, বীরশ্রী সজল শঙ্কিত চক্ষে স্বামীর পানে চাহিলেন।

জাতবর্মা বলিলেন—'চল বীরা, দেশে ফিরে যাই। এখানে আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।'

বীরশ্রী কাছে সরিয়া আসিয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিলেন—'যৌবনা কোথায় ?'

জাতবর্মা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন—'তাকে তোমার পিতৃদেব এইমাত্র অবরোধে টেনে নিয়ে এলেন। বোধহয় পাকশালায় নিয়ে গেছেন, কেটে কুটে শূল্য মাংস রন্ধন করবেন।'

লক্ষ্মীকর্ণ কিন্তু কন্যাকে রন্ধনশালায় লইয়া যান নাই, তাহাকে তাহার নিজ গৃহাংশে লইয়া গিয়া শয়নকক্ষের মর্মর কুট্টিমে বসাইয়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিগ্রহপালের সহিত কোথায় যৌবনশ্রীর দেখা হইয়াছিল ? কে দূতীর কাজ করিয়াছে ? কেমন করিয়া যোগাযোগ ঘটিল ? রাজপুরীর কোন কোন ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। ইত্যাদি। যৌবনশ্রী একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেন নাই, বসুধাবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নীরব ছিলেন।

উত্তর না পাইয়া লক্ষ্মীকর্ণ খুব খানিকটা দাপাদাপি করিয়া শেষে বলিলেন—'বিশ্বাসঘাতিনি, তুই যেমন রাজাদের সমক্ষে আমাকে অপদস্থ করলি, আমিও তেমনি তোকে শাস্তি দেব। এই ঘরে তুই সারা জীবন বন্ধ থাকবি, পুরুষের মুখ দেখতে পাবি না। আজ থেকে এই ঘর তোর কারাগার।' বলিয়া তিনি রঙ্গিণীকে ডাকিলেন।

রঙ্গিণী রাজপুরীর এক প্রেষ্যা। আট নয় বছর আগে সে কিছুদিনের জন্য লক্ষ্মীকর্ণের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। বর্তমানে গতযৌবনা হইলেও তাহার শরীর শক্ত ও সমর্থ, মুখে লাবণ্যের স্থানে কঠিনতা দেখা দিয়াছে। এখন সে অবরোধের দীপ-পালিকা। পুরাতন অনুগ্রহভাগিনীদের মধ্যে তাহাকেই লক্ষ্মীকর্ণ সর্বাধিক বিশ্বাস করেন।

রঙ্গিণী আসিলে লক্ষ্মীকর্ণ তাঁহার নিজের তরবারি তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিলেন—'রঙ্গিণি, আজ থেকে তোর অন্য কাজ নেই, তুই একে পাহারা দিবি। একে ঘরের বাইরে যেতে দিবি না। কাউকে ঘরে ঢুকতে দিবি না। এই আমার আদেশ, যদি অন্যথা হয়, তোর রক্ত দর্শন করব।'

বিদ্রোহিণী কন্যাকে প্রহরিণীর হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া লক্ষ্মীকর্ণ প্রস্থান করিলেন। রাগ যতই হোক, তাঁহার বুদ্ধির ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন ষড়যন্ত্রে রাজপুরীর অনেকেই লিপ্ত আছে। দশম গ্রহরূপী জামাতা বাবাজী আছেন, সম্ভবত বীরশ্রীও আছে। এবং নিশ্চয় আছেন পরমারাধ্যা মাতৃদেবী। তিনিই নিঃসন্দেহে এই ষড়যন্ত্রের প্রবর্তক, সকল অনিষ্টের মূল। লক্ষ্মীকর্ণ মাতৃদেবীর কক্ষে গেলেন।

হস্ত সঞ্চালনের ইঙ্গিতে সেবিকাদের কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লক্ষ্মীকর্ণ কট্‌মট্‌ চক্ষে মাতার প্রতি চাহিলেন। শয্যায় শায়িতা মাতাও কট্‌মট্‌ চাহিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। ষড়যন্ত্র যে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এ সংবাদ এখনও অম্বিকা দেবীর কাছে পৌঁছে নাই। রোগপঙ্গু বৃদ্ধাকে কে সংবাদ দিবে?

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'আপনি যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা সফল হয়নি। অণ্ড দ্রব হয়ে গেছে।'

অম্বিকার চক্ষে উদ্বেগের ছায়া পড়িল, তিনি একটি ভ্রূ তুলিয়া নীরবে পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন।

পুত্র বলিলেন—'বিগ্রহপাল কুক্কুর শাবকের মত পালিয়েছে, যৌবনশ্রীকে নিয়ে যেতে পারেনি। তাকে আমি ঘরে বন্ধ করে রেখেছি। যতদিন বেঁচে থাকবে বন্ধ করে রাখব। আর যারা ষড়যন্ত্র করেছে—' লক্ষ্মীকর্ণ ব্যাঘ্র-চক্ষু মেলিয়া অকথিত বাক্যাংশের ইঙ্গিত মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন।

অম্বিকার পক্ষাহত মুখে বিশেষ ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, কেবল কণ্ঠ হইতে একটি অস্পষ্ট ধ্বনি নির্গত হইল। এই ধ্বনিকে পরাজয়ের স্বীকৃতি মনে করিয়া লক্ষ্মীকর্ণ ঈষৎ সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন।

দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন এমন সময় পিছন হইতে অম্বিকার জড়িত কণ্ঠস্বর আসিল—'তোর স্বয়ংবর তো পণ্ড হয়েছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোধ আবার শিখায়িত হইয়া উঠিল। এই জড়পিণ্ড বুড়িটাকে গলা টিপিয়া মারিলেই ভাল হয়। কিন্তু মাতৃহত্যা মহাপাপ; বিশেষত প্রজারা জানিতে পারিলে ডিম্ব করিতে পারে। হতভাগ্য প্রজাগুলা বুড়িকে ভালবাসে। লক্ষ্মীকর্ণ কয়েকবার উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া অনিচ্ছাভরে প্রস্থান করিলেন।

দুই

গুপ্ত মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া রাজা দেখিলেন লম্বোদর দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিলেন—'তোকে শূলে দেব।'

লম্বোদর হাত জোড় করিল—'আয়ুষ্মন্, আমি নির্দোষ।'

'তুই সব নষ্টের মূল। শিল্পীটাকে ঘরে পুষে রেখেছিলি।'

'প্রভু, শিল্পীটা আমার শ্যালীকে নিয়ে পালিয়েছে।'

'ভাল করেছে। এবার তোকে শূলে দেব।'

'মহারাজ, আমি বাধা না দিলে বিগ্রহপাল রাজকন্যাকে নিয়ে পলায়ন করত।'

মহারাজ এ কথাটা চিন্তা করেন নাই। লম্বোদর ষড়যন্ত্রে থাকিলে যৌবনশ্রীর পা জড়াইয়া ধরিয়া নিজেই ষড়যন্ত্র পণ্ড করিয়া দিত না। তিনি অঙ্গুলির ইঙ্গিতে লম্বোদরকে মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিতে বলিলেন। চারিদিকে গুপ্তশত্রু পরিবৃত হইয়া মহারাজ মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন, এখন যেন সহায় পাইলেন। যাক, তবু একজন বিশ্বাসী মানুষ আছে।

মন্ত্রগৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া আলোচনা হইল। পরস্পরের সহিত সংবাদ বিনিময়ের ফলে ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া স্পষ্ট হইল। বিগ্রহপালকে তাড়া করিয়া কোনও লাভ আছে কিনা তাহাও আলোচিত হইল। বিগ্রহপাল সম্ভবত নদীপথেই পলাইয়াছে, কিন্তু এত বিলম্বে আর বোধহয় তাহাকে ধরা যাইবে না। তবু রাজা শোণের ঘাটে একদল অশ্বারোহী পাঠাইলেন। লম্বোদর সঙ্গে গেল। বলা বাহুল্য বিগ্রহপালের নৌকা বহু পূর্বেই ঘাট হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল।—

সূর্যাস্তের পর লম্বোদর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে গৃহে ফিরিল। আজিকার দিনটা যেন বিভীষিকায় পূর্ণ। প্রাণ বাঁচিয়াছে বটে কিন্তু মন ক্ষতবিক্ষত।...কর্তব্য করিতে গেলে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত, না করিলে, রাজরোষ—লাঞ্ছনা—। তাহাও সহ্য হয়—কিন্তু বান্ধুলি! তাহার চোখের উপর দিয়া বান্ধুলি চলিয়া গিয়াছে, মধুকরের ঘোড়ায় চড়িয়া তাহার গলা জড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে!

বেতসী দ্বার পিণ্ডিকার বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল নয়নে পথের পানে চাহিয়া ছিল। স্বয়ংবর সভায় কি একটা গোলমাল হইয়াছে এইটুকুই তাহার কানে আসিয়াছিল। তাই অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তায় সে দ্বিপ্রহর হইতেই গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাটাইয়াছে, মধ্যাহ্নে অন্নগ্রহণের কথাও মনে ছিল না। লম্বোদর স্বয়ংবরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কি জানি কি ঘটিয়াছে! তারপর সন্ধ্যার সময় লম্বোদরকে আসিতে দেখিয়া সে ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল।

প্রদোষের ম্লান আলোকে লম্বোদরের মুখ দেখিয়া বেতসীর বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। যেন সর্বস্বহারার মুখ। বেতসীর মনে অনেক প্রশ্ন জমা হইয়াছিল, কিন্তু একটি প্রশ্নও সে মুখে আনিতে পারিল না। নীরবে হাত ধরিয়া সে লম্বোদরকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। পীঠিকায় বসাইয়া তাহার পা ধুইয়া দিল। মুখে জল দিয়া গামোছায় গা মুছিয়া লম্বোদরের দেহ অনেকটা সুস্থ হইল। বেতসী তাহাকে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া নিজের শয্যায় বসাইয়া বলিল—'আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি।'

বেতসী খাবার আনিতে গেল। লম্বোদর শয্যায় বসিয়া রহিল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হইতেছে। এ জগতে কেহ কাহারও নয়, সব বিচ্ছিন্ন সংযোগহীন নিরর্থক। জীবন শূন্য, কেবল বুকের মধ্যে একটা অবশ বেদনা হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

বেতসী খাদ্য পানীয় আনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—'আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

লম্বোদর কী খাইল কিছুরই স্বাদ পাইল না। কপিত্থ সুরভিত তক্র, তাহারও স্বাদ নাই।

পানাহার শেষ হইলে বেতসী বলিল—'তুমি শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। দীপ জ্বালব ?'

'না।'

লম্বোদর শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিল, বেতসী শিয়রে বসিয়া লঘুহস্তে চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে লম্বোদর যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সংসারে কোনও কিছুরই অর্থ হয় না...রাজকার্য...গুপ্তচরবৃত্তি...বান্ধুলি...সব অলীক...মিথ্যা। মিথ্যা।

পূর্বগগনে চাঁদ উঠিতেছে, পূর্ণিমার চাঁদ। শয্যার উপর চাঁদের আলো বাতায়ন দিয়া আসিয়া পড়িল, যেন শুভ্র ফুলের আস্তরণ বিছাইয়া দিল। সেই আলোতে লম্বোদরের মুখের পানে চাহিয়া বেতসী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে নত হইয়া লম্বোদরের মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিল।

লম্বোদর চমকিয়া চোখ খুলিল। একি! চাঁদের আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল সে যেন এক অন্ধকারময় দুঃস্বপ্নের পঙ্ককুণ্ড হইতে উঠিয়া আসিল। এত আলো পৃথিবীতে আছে! আলো আছে, মাধুর্য আছে, স্নেহমমতা আছে। তাহার আপনার জন আছে, একান্ত আপনার জন। সুখে দুঃখে জীবনে মরণে সে শুধু তাহারই। তবে আর কিসের জন্য ক্ষোভ ?

দুই বিন্দু আতপ্ত অশ্রু লম্বোদরের গণ্ডের উপর পড়িল। সে হাত বাড়াইয়া বেতসীকে বুকের কাছে টানিয়া লইল, পুরাতন চিরাভ্যস্ত স্নেহার্দ্র স্বরে ডাকিল—'বেতসি—'

তিন

পরদিন প্রভাতে জাতবর্মা সস্ত্রীক স্বদেশ প্রতিগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বীরশ্রী প্রথমে ঠাকুরানীর ঘরে গেলেন। অম্বিকা তাঁহার প্রিয়তমা নাতিনীর গলা জড়াইয়া অশ্রু বিসর্জন করিলেন। তারপর বলিলেন—'তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিন্তু তুই এ পাপপুরীতে আর থাকিস না, স্বামীকে নিয়ে নিজের দেশে চলে যা। এ রাজ্যের আর ইষ্ট নেই, পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। বিধাতার অভিশাপ, রাজা পুত্রহীন ; তার উপর এত পাপ। এ বংশ আর বেশি দিন নয়।'

বীরশ্রী বলিলেন—'কিন্তু দিদি, যৌবনার কী হবে ?'

অম্বিকা বলিলেন—'যৌবনার ভালই হবে। দেশসুদ্ধ লোকের সামনে সে বিগ্রহপালের গলায় মালা দিয়েছে, এখন আর অন্য কোনও রাজা তাকে বিয়ে করবে না। তোর বাপ কতদিন তাকে বন্ধ করে রাখবে ? তুই দেখিস যৌবনার ভালই হবে। বাপ যতবড় দুরাচারই হোক, এ বংশের কোনও মেয়ে কখনও অসুখী হয়নি।'

ঠাকুরানীর পদধূলি মাথায় লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বীরশ্রী বিদায় লইলেন। পিতামহীর সহিত জীবনে আর দেখা হইবে না ; পিত্রালয়ে আর কখনও আসিবেন সে সম্ভাবনাও অল্প।

সেখান হইতে বীরশ্রী যৌবনার নিকটে গেলেন। রঙ্গিণী খোলা তলোয়ার হাতে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বীরশ্রীকে আসিতে দেখিয়া তাহার কঠিন মুখ আরও কঠিন হইল। বীরশ্রী কাছে আসিলে সে বলিল—'বড় কুমারি, এ ঘরে প্রবেশ নিষেধ।'

বীরশ্রী ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, যেন রঙ্গিণী নাম্নী দাসীকে দেখিতেই পান নাই। কিন্তু তিনি কক্ষে প্রবেশ করিলেন না, বাহির হইতে ডাকিলেন—'যৌবনা।'

যৌবনশ্রী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। তিনিও দ্বার অতিক্রম করিলেন না। দুই বোন দ্বারের দুই দিক হইতে পরস্পরের পানে চাহিলেন। দুইজনেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কাল যৌবনশ্রীর রূপ ছিল নবোদ্ভিন্ন হিমচম্পকের ন্যায়, আজ সেই রূপ শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চোখের কোলে ছায়া, কেশ-বেশ অবিন্যস্ত, অঙ্গ নিরাভরণ। বীরশ্রীর হৃদয় মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

কিন্তু রঙ্গিণীর সম্মুখে অধিক হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা চলিবে না। বীরশ্রী কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া বলিলেন—'যৌবনা, আজ আমরা চলে যাচ্ছি।'

এই কথা কয়টির মধ্যে কি ছিল জানি না, তাঁহাদের হৃদয়াবেগ আর শাসন মানিল না ; দুইজনে ছুটিয়া আসিয়া পরস্পরের কণ্ঠলগ্না হইলেন। রঙ্গিণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তলোয়ার হাতে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ঘোর বিপদ, একদিকে রাজা অন্যদিকে দুই রাজকন্যা ; আগু হইলে রাম, পিছাইলে রাবণ।

বীরশ্রী ভগিনীর কানে কানে বলিলেন—'আমরা পাটলিপুত্রে থামব। তুই বিগ্রহকে কিছু বলবি ?'

যৌবনশ্রী কয়েকবার অশ্রু গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—'তাঁকে বলো, এ জন্মে যদি দেখা না হয়, পরজন্মে দেখা হবে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'এ জন্মেই দেখা হবে। তোকে বিগ্রহের কোলে যদি না তুলে দিতে পারি, বৃথাই আমি তোর দিদি।'

আরও খানিক কান্নাকাটি হইল, তারপর বীরশ্রী চলিয়া গেলেন। রঙ্গিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মধ্যাহ্নের পূর্বেই জাতবর্মা ও বীরশ্রী রথে চড়িয়া শোণ-ঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ মন্ত্রীদের লইয়া গুপ্ত মন্ত্রগৃহের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন, বিদায়কালে কন্যা-জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

ঘাটে পৌঁছিয়া জাতবর্মা ও বীরশ্রী বিষণ্ণমনে নৌকায় উঠিলেন। দিশারু শুভঙ্কর অপহৃত দাঁড়ের পরিবর্তে নূতন দাঁড় যোগাড় করিয়াছিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

চার

পূর্বদিন এই সময় বিগ্রহপালের নৌকা ঘাট ছাড়িয়াছে।

ঘাট ছাড়িয়া নৌকা স্রোতের মুখে পড়িল। বায়ু প্রতিকূল হইলেও স্রোত ও দাঁড়ের জোরে নৌকা ক্ষিপ্রবেগে চলিল। দুই দণ্ডের মধ্যে শোণের ঘাট দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল। দিব্যজ্যোতি ও রোহিতাশ্বকে আর দেখা গেল না।

আকাশে প্রখর রৌদ্র ; এক মাসেই উত্তরগামী সূর্য বিলক্ষণ তপ্ত হইয়াছে। তিনজনে নিশ্বাস ফেলিয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। বান্ধুলি শয্যা পাতিয়া দিল, দুই বন্ধু উপবেশন করিলেন। বান্ধুলি ঘরের এক কোণে গিয়া পান সাজিতে লাগিল।

কথা বলিতে যেন সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। অনঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া উদ্বিগ্নচক্ষে বিগ্রহপালের দিকে চাহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতেছে না। সে জানে বিগ্রহের মনের অবস্থা কিরূপ ; এখন সান্ত্বনা দিতে গেলে সে আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। আর বান্ধুলি ? সে কী কথা বলিবে ? তাহার অবস্থা নববধূর মত ; উপরন্তু শঙ্কা ও সঙ্কোচে সে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। যৌবনশ্রী

আসিতে পারেন নাই অথচ সে আসিয়াছে, এই অপরাধের ভারে সে যেন মাটিতে মিশিয়া আছে।

বিগ্রহপালের মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে ; তাঁহার সংজ্ঞা অন্তর্মুখী, তাই তিনিও নীরব।—এ কী হইল ! যৌবনশ্রী ! যৌবনা ! তোমাকে পাইয়াও পাইলাম না। এতদিনের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা সমাপ্তির উপান্তে আসিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।...আরম্ভ হইতে দৈব ছিল অনুকূল। পথে বীরশ্রী ও জাতবর্মার সহিত সাক্ষাৎ, যৌবনশ্রীকে হরণ করার প্রস্তাবে তাঁহাদের সম্মতি ও সহায়তা, যৌবনশ্রীর সহিত সাক্ষাৎমাত্রেই উভয়পক্ষের অনুরাগ, তারপর কার্যসিদ্ধির পক্ষে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা যেন অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ এ কী হইয়া গেল ! প্রসন্ন ভাগ্যদেবতা অকস্মাৎ মুখ ফিরাইলেন। তীরে আসিয়া তরী ডুবিল !

বিগ্রহপালের মনে আত্মগ্লানিও কম ছিল না। কেন যৌবনাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। না হয় দুইজনে একসঙ্গে মরিতাম। রাজারা হাসিবে, কাপুরুষ বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে। আর যৌবনা ! সে যদি আমাকে কাপুরুষ মনে করে ? না না, তা করিবে না। কিন্তু যৌবনশ্রী কি বাঁচিয়া আছে ? যদি—

তাঁহার মন অস্থিরতায় ছটফট করিয়া উঠিল ; তিনি আর রইঘরে থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া গিয়া ছাদে বসিলেন। সূর্যের তাপ কমিয়াছে, দক্ষিণ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রইঘরে বান্ধুলি অনঙ্গের কাছে আসিয়া চোখ ডাগর করিয়া চাহিল। দুইজনে নিম্নস্বরে কথা হইল। তারপর অনঙ্গও ছাদে গিয়া বিগ্রহের কাছে বসিল।

দুইজনে বসিয়া আছেন, কাহারও মুখে কথা নাই। সূর্যের বর্ণ পীত হইয়া ক্রমে লোহিতাভা ধারণ করিল। নৌকার ছায়া সম্মুখে দীর্ঘায়িত হইতে লাগিল।

হঠাৎ বিগ্রহপাল কথা বলিলেন। যেন দীর্ঘ নীরবতা লক্ষ্য করিয়া লঘুতার অভিনয় করিলেন, বলিলেন—'তুই ঠিক বলেছিলি অনঙ্গ। পাটলিপুত্রের ঘাটে যে পাখি দুটো দেখেছিলাম সে-দুটো খঞ্জন নয়, কাদাখোঁচাই বটে।'

অনঙ্গ একটু হাসিল, বলিল—'আর্য রন্তিদেবও ঠিক বলেছিলেন, এখন পূর্ণ সিদ্ধি না হলেও অন্তে সিদ্ধি অনিবার্য।'

বিগ্রহপালের মনের অন্ধকার কিছু স্বচ্ছ হইল না। রন্তিদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তাঁহার মনে ছিল না। তবে একেবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। অন্তে সিদ্ধি—কিন্তু সে অন্ত কতদূর ?

তিনি ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বে অনঙ্গকে অতি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলেন, সভা হইতে বাহির হইবার পর লম্বোদর কর্তৃক যৌবনশ্রীর পদধারণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শেষে প্রশ্ন করিলেন—'এ অবস্থায় তুই কি করতিস ?'

অনঙ্গ যেন একটু চিন্তা করিল, তারপর মাথা নাড়িল—'কি করতাম বলতে পারি না। ঢাল নেই তলোয়ার নেই, এ অবস্থায় মানুষ কি করতে পারে ? হয়তো লম্বোদরের বগলে কাতুকুতু দিতাম। কিন্তু তাতে ফল হত বলে মনে হয় না। লম্বোদর মানুষ নয়, গণ্ডার।'

এতক্ষণে বিগ্রহপালের মুখে হাসির আভাস দেখা দিল, আত্মগ্লানিও লাঘব হইল। অনঙ্গ অপ্রত্যক্ষভাবে সেই চেষ্টাই করিতেছিল।

সূর্যাস্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশে চাঁদ উঠিল। বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি। বিগ্রহপাল চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

গরুড় আসিয়া বলিল—'রাত্রি হল, এবার নৌকা বাঁধি ?'

অনঙ্গ বিগ্রহের পানে চাহিল। বিগ্রহ বলিলেন—'আমি জানি না। যা ইচ্ছা কর।'

অনঙ্গ তখন গরুড়কে বলিল—'পিছনে ওরা আসছে কিনা জানা নেই, নৌকা বাঁধা নিরাপদ হবে না। সারা রাত চাঁদ থাকবে, দিনের মত আলো। তুমি নৌকা চালাও। অনুকূল বাতাস উঠেছে, দাঁড় বন্ধ করে পাল তোল। স্রোতের মুখে পালের ভরে ভেসে চল। কিন্তু সাবধান, নৌকা চরে আটকে না যায়।'

'আজ্ঞা' বলিয়া গরুড় প্রস্থান করিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই গরুড় দাঁড় বন্ধ করিয়া পাল তুলিয়া দিল। চারিদিক আবছায়া হইয়া গিয়াছে, তীররেখা অস্পষ্ট। নৌকার সম্মুখে গরুড় বসিয়াছে, পিছনে আছে হালী। দুইজনে সতর্কভাবে নৌকা চালাইতে লাগিল।

রাত্রির আহার শেষ হইলে বিগ্রহ অনঙ্গকে বলিলেন—'তুই আর বান্ধুলি রইঘরে থাক। আমি ছাদে শোব।'

অনঙ্গ বলিল—'আমিও ছাদে শোব।'

বিগ্রহ বলিলেন—'কিন্তু, একা বান্ধুলির ভয় করবে না?'

অনঙ্গ মুখ টিপিয়া বলিল—'আমি থাকলেই ওর ভয় বেশি।—চল শুই গিয়ে।'

ছাদে শয্যা রচনা করিয়া দুই বন্ধু শয়ন করিলেন। মুক্ত আকাশের তলে জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেন ভাসিয়া চলিলেন। বিগ্রহপাল ভাবিতে লাগিলেন—যৌবনা যদি আজ এই নৌকায় থাকিত, পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসিত। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। ক্লান্ত-পীড়িত মন লইয়া একে একে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কেবল গরুড় ও হালী সারা রাত্রি জাগিয়া নৌকা চালাইল।

পাঁচ

তিন দিন নদীবক্ষে যাপন করিয়া চতুর্থ দিনের পূর্বাহ্নে বিগ্রহপাল পাটলিপুত্রের রাজঘাটে পৌঁছিলেন।

মহারানী পুত্রের মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, কিছু ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি কুশলপ্রশ্ন করিবার পূর্বেই বিগ্রহপাল বলিলেন—'মা, দেখ অনঙ্গ কেমন বৌ এনেছে।'

বান্ধুলি মহারানীকে প্রণাম করিল। মহারানী বিস্ময়োৎফুল্ল মুখে তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন, তাহার ভীত-লজ্জিত মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'কী সুন্দর বউ! এমন বউ কোথায় পেলি অনঙ্গ?'

অনঙ্গ ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। বিগ্রহ বলিলেন—'সব পরে শুনো। ওদের এখনও বিয়ে হয়নি, তোমাকে বিয়ে দিতে হবে। এখন এদিকের সংবাদ বল। মহারাজ কেমন আছেন?'

রানী বলিলেন—'মহারাজ অসুস্থ।'

'অসুস্থ?'

'কিছুদিন থেকে শরীর ভাল নেই। তোরা তাঁর কাছে যা। তোদের আসার খবর পেয়েছেন, বিরামকোষ্ঠে আছেন।'

বিগ্রহ ও অনঙ্গ বান্ধুলিকে মায়ের কাছে রাখিয়া মহারাজ নয়পালের নিকটে গেলেন।

নয়পাল প্রাসাদের একটি কক্ষে দিবাশয্যায় অর্ধশয়ান অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, একজন সংবাহক পদসেবা করিতেছিল। মহারাজের শরীর কিছু কৃশ, মুখের চর্ম শিথিল ও রেখাঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি শয্যাশায়ী হন নাই। লক্ষ্মীকর্ণের উদ্দেশে তিনি যে মারণ যজ্ঞের প্রবর্তন

করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজেও যোগ দিয়াছিলেন ; কুম্ভক রেচকাদি প্রক্রিয়ার ফলে, লক্ষ্মীকর্ণের যত না অনিষ্ট হোক, তিনি নিজে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি উলট-পালট হইয়া গিয়াছিল। অজীর্ণ ও অনিদ্রা রোগ ধরিয়াছিল।

বিগ্রহ ও অনঙ্গ আসিয়া পদবন্দনা করিলে তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, সংবাহককে বিদায় করিয়া কুশল প্রশ্নাদি করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ? কোন কোন দেশ দেখলে ?'

এখনই পিতাকে সব কথা বলার সংকল্প বিগ্রহপালের ছিল না, কিন্তু সরাসরি মিথ্যা কথাও বলিতে পারিলেন না। বলিলেন—'কেবল ত্রিপুরী গিয়েছিলাম।'

মহারাজ উচ্চকিত হইয়া চাহিলেন—'ত্রিপুরী ! অর্থাৎ—লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার স্বয়ংবরে ?'

বিগ্রহ কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন—'আজ্ঞা মহারাজ।'

নয়পাল বিরক্ত হইলেন—'অনাহূত শত্রুরাজ্যে গিয়েছিলে ! লক্ষ্মীকর্ণ মহাপিশুন, সে যদি অসহায় পেয়ে তোমাকে হত্যা করত ! কি জন্য গিয়েছিলে ? যাবার আগে আমাকে বলনি কেন ?'

বিগ্রহপাল অধোমুখে রহিলেন। অনঙ্গ তখন সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে বলিল—'মহারাজ, যদি অনুমতি হয় আমি সব কথা বলতে পারি।'

নয়পাল তাহার প্রতি অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—'বল।'

অনঙ্গ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া সব কথা বলিল। শুনিতে শুনিতে মহারাজের অপ্রসন্নতা দূর হইল, তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আখ্যান শেষ হইলে তিনি শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'যৌবনশ্রী স্বয়ংবর সভায় বিগ্রহের গলায় বরমাল্য দিয়েছে ! তবে তো যৌবনশ্রী আমার পুত্রবধূ ! লক্ষ্মীকর্ণ তাকে আটকে রাখে কোন্ স্পর্ধায় !'

অনঙ্গ যখন মহারাজকে কাহিনী শুনাইতেছিল বিগ্রহপাল তখন বাতায়নের সম্মুখে গিয়া বাহিরে তাকাইয়া ছিলেন। এখন তিনি সচকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তিনি দ্রুত গিয়া পিতার হাত ধরিলেন—'মহারাজ, আপনি শান্ত হোন। আপনার শরীর অসুস্থ—'

মহারাজ কিন্তু শান্ত হইলেন না, বলিলেন—'তোমরা যৌবনশ্রীকে আনতে পারলে না, অত্যন্ত পরিতাপের কথা। কিন্তু আমি ছাড়ব না। আমি এখনি লক্ষ্মীকর্ণের কাছে দূত পাঠাচ্ছি। সে যদি এই দণ্ডে আমার পুত্রবধূকে আমার কাছে পাঠিয়ে না দেয় আমি যুদ্ধ করব। চেদিরাজ্য ছারখার করে দেব।'

বিগ্রহ ও অনঙ্গ মহারাজকে ধরিয়া শয্যায় বসাইয়া দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—'মহারানী কোথায় ? তিনি সংবাদ জানেন ? তাঁকে ডেকে আনো। আমি যুদ্ধ করব। মহারানী কোথায় ?'

দুই বন্ধু মহারানীর কাছে গেলেন। গিয়া দেখিলেন মহারানী বান্ধুলির নিকট হইতে সব কথাই বাহির করিয়া লইয়াছেন। তিনি হাস্যবিম্বিতমুখে পুত্রের বুকের উপর স্নিগ্ধ করতল রাখিয়া বলিলেন—'তুই ভাবনা করিস না। আমার ঘরের লক্ষ্মী আট্‌কে রাখে এমন সাধ্য কারও নেই।'

বিগ্রহ পিতার উত্তেজিত আস্ফালনে যে আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন মাতার শান্ত দৃঢ়তায় তদপেক্ষা অধিক আশ্বাস পাইলেন। হাসিমুখে কহিলেন—'মহারাজ বলছেন যুদ্ধ করবেন।'

মহারানী বলিলেন—'প্রয়োজন হলে যুদ্ধ হবে। আপাতত বান্ধুলি আর অনঙ্গের বিয়েটা দিয়ে দিই। অনেকদিন বাড়িতে উৎসব হয়নি।'

তারপর মহারানী বান্ধুলির হাত ধরিয়া এবং বন্ধুযুগল কর্তৃক অনুসৃত হইয়া মহারাজের নিকট চলিলেন।

ছয়

দুই দিন পরে জাতবর্মা ও বীরশ্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাটলিপুত্রের রাজভবনে অনঙ্গের বিবাহ উপলক্ষে উৎসবের সূচনা হইয়াছিল, এখন তাহা চতুর্গুণ বর্ধিত হইল। বিগ্রহপাল বীরশ্রীকে প্রায় কাঁধে করিয়া ঘাট হইতে রাজপুরীতে আনিয়া মায়ের কোলে সঁপিয়া দিলেন। জাতবর্মাকে নয়পাল পুত্রস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। এই সময় ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পর প্রীতির সম্পর্ক ছিল না, যেখানে বাহিরে মৈত্রীবন্ধন আছে সেখানেও ভিতরে ভিতরে ঈর্ষা দ্বেষ অসহিষ্ণুতা ছিল। জাতবর্মা সস্ত্রীক পাটলিপুত্রে আসিয়া যেন সত্যকার হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। নয়পাল স্বয়ং হৃদয়বান পুরুষ, তিনি বিগলিত হইয়া গেলেন। তাঁহার শত্রুর কন্যা এবং জামাতা স্বেচ্ছায় প্রীতিবশে তাঁহার কাছে আসিয়াছে। নয়পাল অসুস্থ শরীর লইয়া সর্বদা জাতবর্মার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার অবরোধে গিয়া বীরশ্রীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া আসিলেন। মহারানী স্বহস্তে জাতবর্মাকে মিষ্টান্ন খাওয়াইলেন। বীরশ্রী তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিয়া তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। বান্ধুলি বীরশ্রীকে পাইয়া নববধূসুলভ লজ্জা সঙ্কোচ ভুলিয়া গেল এবং ক্রমাগত মহারানীর জন্য পান সাজিতে লাগিল। মহারানী পান ভালবাসেন, দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা পান খান।

একদিন মহা ধুমধামের সহিত অনঙ্গ ও বান্ধুলির বিবাহ হইয়া গেল। মহারাজ স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন ; মহারানী ও বীরশ্রী বান্ধুলিকে মহার্ঘ যৌতুক দিলেন। অনঙ্গ বধূ লইয়া নিজ গৃহে গেল। বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীর কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বেদনা পাইলেও বন্ধুর বিবাহে সর্বদা অগ্রণী হইয়া রহিলেন এবং বাসক রজনীতে নবদম্পতিকে পুষ্পশয্যায় শয়ন করাইয়া গৃহে ফিরিলেন।

অতঃপর উৎসবের কলবলা কথঞ্চিত শান্ত হইলে নয়পালের বিরামকোষ্ঠে কূটনৈতিক সভা বসিল। সভায় উপস্থিত রহিলেন কেবল পাঁচজন, নয়পাল বিগ্রহপাল জাতবর্মা অনঙ্গ ও সচিব যোগদেব। যৌবনশ্রী সম্পর্কে কি করা যাইবে তাহাই বিচার্য। আলাপ আলোচনা মুখ্যত নয়পাল ও জাতবর্মার মধ্যে হইল।

নয়পালের মানসিক উত্তেজনা এখন সমীভূত হইয়াছে, তিনি ধীরকণ্ঠে বলিলেন—'আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। তার উপর দেহ পীড়াগ্রস্ত। তোমরা নবীন, আজ নয় কাল রাজ্যশাসনের ভার তোমাদের উপর পড়বে। তোমাদের প্রজা পালন করতে হবে, অন্য রাজাদের সঙ্গে মন্ত্রযুদ্ধ করতে হবে। এখন তোমরা বল, স্বয়ংবর সভায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সমাধান কোন পথে ? আমাদের কর্তব্য কি ?'

কেহ কোনও উত্তর দিল না, যোগদেব নীরব রহিলেন। তখন জাতবর্মা অগ্রণী হইয়া বলিলেন—'আগে আপনি আজ্ঞা করুন, আর্য, আপনি কি কোনও কর্তব্য স্থির করেছেন ?'

নয়পাল বলিলেন—'স্থির কিছু করিনি। তবে আমার বিবেচনায় প্রথমে লক্ষ্মীকর্ণের কাছে দূত পাঠানো উচিত।'

জাতবর্মা বলিলেন—'রাষ্ট্রনীতির নিয়মে দূত পাঠানোই হয়তো কর্তব্য। কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে না আর্য। শ্বশুর মহাশয়কে আমি চিনি।'

'তাহলে অন্য উপায় আর কী আছে ? ছলে বা কৌশলে কার্যোদ্ধার হতে পারে কি ?'

'এখন আর সম্ভব নয়। শ্বশুর মহাশয় সাবধান হয়েছেন। যৌবনশ্রীর ঘরের দ্বারে পাহারা, রাজপুরী ঘিরে পাহারা বসেছে। ছল-চাতুরীতে আর কিছু হবে না।'

নয়পাল নিশ্বাস ফেলিলেন। যৌবনশ্রী যদি চুপি চুপি পলায়ন করিতে সম্মত হইতেন তাহা

হইলে কোনও গণ্ডগোল হইত না একথা সকলেরই মনে হইল। কিন্তু সেজন্য যৌবনশ্রীকে দোষী করিবার চিন্তা কাহারও মনে আসিল না। তিনি উচিত কার্য করিয়াছেন, আর্য নারীর ন্যায় আচরণ করিয়াছেন ; তাঁহার আচরণে সকলেই গৌরবান্বিত। তবু—তিনি উচিত কার্য সম্বন্ধে এতটা সচেতন না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

'তাহলে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নেই, এই তোমার মত ?'

জাতবর্মা নতমস্তকে নীরব রহিলেন। নয়পাল তখন বলিলেন—'আমি নিজের অভিপ্রায় তোমাদের বললাম। যদি বিনা যুদ্ধে কার্যসিদ্ধি হয় তাই ভাল, কিন্তু যদি যুদ্ধ করতেই হয় তাতে আমার অমত নেই। এখন তোমরা বল তোমাদের অভিপ্রায় কি !'

বিগ্রহ নির্বাক রহিলেন, অনঙ্গও কথা বলিল না ; যোগদেব একটা কিছু বলি বলি করিয়া থামিয়া গেলেন। শেষে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া জাতবর্মা বলিলেন—'মহারাজ, আপনাকে মন্ত্রণা দেবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় যুদ্ধ ছাড়া যৌবনশ্রীকে উদ্ধার করা যাবে না। এবং যদি যুদ্ধই করতে হয় তবে যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। শ্বশুর মহাশয় এখন একটু বিপাকে পড়েছেন, চেদিরাজ্য আক্রমণের এই প্রকৃষ্ট সুযোগ।'

ঈষৎ হাসিয়া নয়পাল প্রশ্ন করিলেন—'কিরূপ বিপাক ?'

জাতবর্মা বলিলেন—'স্বয়ংবর সভায় যে-সব মিত্র রাজা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেছেন, তাঁদের ধারণা চেদিরাজ তাঁদের হাস্যাস্পদ করেছেন। এখন আপনি চেদিরাজ্য আক্রমণ করলে তাঁরা কেউ সাহায্য করতে আসবেন না। শ্বশুর মহাশয় ভয় পেয়ে আপনার হাতে যৌবনশ্রীকে অর্পণ করতে পারেন।'

নয়পাল প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন—'যথার্থ বলেছ। একথা আমার মনে উদয় হয়নি। হয়তো যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হবে না, হুঙ্কারেই কাজ হবে। বৎস জাতবর্মা, আমি তোমার প্রতি বড় প্রীত হয়েছি। তুমি তোমার পিতার সুপুত্র বটে। আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও।'

এইবার সচিব যোগদেব প্রথম কথা বলিলেন, জাতবর্মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—'ক্ষমা করবেন, একটি প্রশ্ন আছে। মগধ যুদ্ধযাত্রা করলে আপনি সঙ্গে থাকবেন তো ?'

জাতবর্মা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, নয়পালের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মহারাজ, অন্তর্যামী জানেন আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধাভিযানে যোগ দিতে কত উৎসুক। শ্বশুর মহাশয় যেরূপ ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর প্রতি তিলমাত্র সহানুভূতি আমার নেই। কিন্তু আমি স্বাধীন নই, মাথার উপর পিতৃদেব আছেন। আমি দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে সব নিবেদন করব। তিনি ন্যায়বান পুরুষ, অন্যায়ের পক্ষ কদাপি অবলম্বন করবেন না।'

'ভাল। আমি তাঁকে পত্র লিখব, তারপর তাঁর ইচ্ছা।'—নয়পাল ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আর একটা কথা। আমি লক্ষ্মীকর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে মাতা যৌবনশ্রীর কোনও অনিষ্ট সম্ভাবনা নেই ?'

জাতবর্মার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—'মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ যদি আপনার প্রতি বিদ্বেষবশত নিজের কন্যার অনিষ্ট করেন তবে তাঁর মত নরাধম ভূ-ভারতে নেই।'

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। যোগদেব কনিষ্ঠ সচিব হইলেও রাজার পারিবারিক মন্ত্রণায় যোগ দিতেন ; বিশেষত এই ব্যাপারের সহিত আরম্ভ হইতেই তাঁহার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি এখন সমস্ত করণীয় কর্মের ভার লইলেন। স্থির হইল চেদিরাজ্যে দূত পাঠানো হইবে, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ হইবে। দৌত্য যদি বিফল হয় তখন নয়পাল যুদ্ধযাত্রা করিবেন। বজ্রবর্মা যদি তাঁহার সহযাত্রী হন ভাল, নচেৎ একাই যুদ্ধে

যাইবেন। মগধ এখন আর সে-মগধ নাই সত্য, কিন্তু একেবারে মরিয়া যায় নাই।

সাত দিন মগধের আতিথ্য উপভোগ করিয়া জাতবর্মা ও বীরশ্রী আবার নৌকায় উঠিলেন। যাত্রার পূর্বে মহারানী বীরশ্রীর কণ্ঠে মহামূল্য রত্নহার পরাইয়া দিলেন। নয়পাল জাতবর্মাকে মণিমাণিক্যখচিত অঙ্গদ ও শিরস্ত্রাণ দিলেন।

প্রণামকালে বীরশ্রী মহারানীকে বলিলেন—'মা, আমরা আবার আসব। এবার যৌবনাকে নিয়ে আসব।'

মহারানী সজল নেত্রে তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন—'এস।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক

স্বয়ংবরে আমন্ত্রিত রাজারা লক্ষ্মীকর্ণকে গালি দিতে দিতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরী নগরীতে বহু জন সমাগমে যে সংখ্যাস্ফীতি ঘটিয়াছিল তাহা আবার সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। নগরীর ব্যবসায়ী ও বিলাসিনীরা দুঃখিত, শান্তিপ্রিয় গৃহস্থেরা আনন্দিত। জল্পকেরা স্বয়ংবর সম্পর্কে নানা সম্ভব অসম্ভব কাহিনী পরস্পরকে শুনাইতেছে এবং শুনিতেছে। মোটের উপর নগরীর অবস্থা স্বাভাবিক।

রাজভবনের অবস্থা কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক নয়। রাজমাতা অম্বিকা দেবী নিজ শয্যায় অনড় হইয়া পড়িয়া আছেন ; আগে দুই একটি কথা বলিতেন এখন তাহাও বলেন না, কেবল দুঃস্বপ্নভরা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকেন। গভীর রাত্রে প্রদীপের আলোকে তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি উৎকর্ণ হইয়া চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীর ক্রম-বিলীয়মান পদধ্বনি শুনিতেছেন।

প্রাসাদের অন্যত্র যৌবনশ্রী নিজ কক্ষে অবরুদ্ধা আছেন। দ্বারে রঙ্গিণী প্রহরিণী। একাকিনী রাজকন্যা, দিন কাটে তো রাত কাটে না। তিনি বেণী খুলিয়া আবার বয়ন করেন ; আবার খোলেন, আবার বয়ন করেন। পাচিকা অন্ন রাখিয়া যায়, কখনও আহারে বসেন, কখনও বসেন না। কক্ষে কালিদাসের কয়েকটি পুঁথি আছে, তাহাই খুলিয়া নাড়াচাড়া করেন। মেঘদূতের দুই চারিটি শ্লোক পড়েন, রঘুবংশের অজবিলাপ পড়েন, কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ পড়িতে পড়িতে সহসা পুঁথি বন্ধ করিয়া শয্যায় শয়ন করেন। চক্ষু মুদিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকেন। বাতায়নের বাহিরে বপ্‌পীহ পাখিটা আম্রকানন হইতে বুক-ফাটা স্বরে ডাকে—পিয়া পিয়া পিয়া!

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মানসিক অবস্থা বোধ করি সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। যত দিন যাইতেছে অপমান ও লাঞ্ছনার শেল ততই গভীরভাবে তাঁহার মর্মে প্রবেশ করিতেছে। মন্ত্রীরা তাঁহাকে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইতেছে না। তিনি পণ করিয়াছেন মগধের কুক্কুরবংশকে নির্বংশ করিবেন, পালবংশে বাতি দিতে কাহাকেও রাখিবেন না। মন্ত্রণাসভায় এইরূপ আস্ফালন করিতে করিতে হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া তিনি দেখিয়া আসিতেছেন, মেয়েটা পলাইয়াছে কিনা। যদিও রাজপুরী ঘিরিয়া কঠিন প্রহরা বসিয়াছে, প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া একটি ইন্দুরেরও বাহির হইবার উপায় নাই, তবু মহারাজ নিজ চক্ষে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না।

মন্ত্রীরা তাঁহাকে বুঝাইতেছেন, মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে পরিপূর্ণরূপে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। স্বয়ংবর সংক্রান্ত ব্যয়বাহুল্যের ফলে রাজকোষের অবস্থা ভাল নয় ; এক্ষেত্রে একা যুদ্ধযাত্রা না করিয়া যদি কোনও মিত্র রাজাকে সহযাত্রী রূপে পাওয়া

যায় তাহা হইলে সব দিক দিয়া মঙ্গল। সম্প্রতি মগধের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধযাত্রা করিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার পুনরভিনয় বাঞ্ছনীয় নয়।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের ওইখানেই সবচেয়ে বেশি ব্যথা। তিনি ক্রোধে লাফাইতে লাগিলেন। গড্ডলচূড়ামণি নয়পাল যুদ্ধের জানে কি? দীপঙ্কর ও তাহার পিশাচগুলা না থাকিলে তিনি দেখিয়া লইতেন! এখন দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়াছে, তাহার পিশাচগুলাও সুতরাং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এইবার তিনি দেখিয়া লইবেন। নয়পালকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবেন, তারপর কাক-শকুন ডাকিয়া তাহাদের ভূরিভোজন করাইবেন।

যা হোক, শেষ অবধি মন্ত্রিগণ রাজাকে রাজী করাইলেন, কর্ণাটকুমার বিক্রমাদিত্যকে পত্র পাঠানো হইবে। পত্র এইরূপ—

স্বস্তি শ্রীমন্মহাপরাক্রম কর্ণাটযুবরাজ পরমভট্টারক শ্রীবিক্রমাদিত্য সমীপে চেদীশ্বর শ্রীলক্ষ্মীকর্ণদেবের সাদর সংবোধন। অতঃপর স্বয়ংবর সভায় অধম গুপ্তশত্রুর দ্বারা আমি কিভাবে অপমানিত হইয়াছি তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেবল আমি নয়, সমগ্র রাজকুল অপমানিত হইয়াছেন। আপনার ন্যায় বীরকেশরী অপমানিত হইয়াছেন। সিংহের গ্রাস যদি শৃগালের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয় তবে কি সিংহ তাহা সহ্য করে? কদাপি নয়।

আমি প্রস্তাব করিতেছি, আসুন, আপনি এবং আমি সম্মিলিত হইয়া মগধ আক্রমণ করি। নষ্টবুদ্ধি নয়পালকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার রাজ্য উভয়ে ভাগ করিয়া লইব। আপনি পুরুষসিংহ, অপমানের প্রতিশোধ লইতে এবং ক্ষত্রোচিত ধর্মযুদ্ধের সুযোগ লইতে কখনও বিরত হইবেন না। অলমিতি।

পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব হইল না। বিক্রম লিখিলেন—নরপুঙ্গব চেদিরাজ, আপনি নিতান্তই বালকোচিত পত্র লিখিয়াছেন। যুদ্ধ করিয়া আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, কৈতববাদে আর্দ্র হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইবার বয়স আমার নাই। আপনি যদি অপমানিত হইয়া থাকেন সেজন্য দোষ সম্পূর্ণ আপনার; মগধের যুবরাজকে মর্কটবৃত্তি অবলম্বন করিতে আপনিই শিখাইয়াছেন। অনুরক্তা কন্যার জন্য স্বয়ংবর সভা আহ্বান করা অতীব গর্হিত কার্য; আপনি স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিয়া আমাদের সকলকে অপমান করিয়াছেন। মগধরাজ বা মগধের যুবরাজের প্রতি আমার ক্রোধ নাই; তাহারা আমার কোনও অনিষ্ট করে নাই। আমি কিজন্য মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব? বরং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে অন্যায় হইত না। কিন্তু আপনি নিজ নির্বুদ্ধিতার জন্য সমুচিত দণ্ডিত হইয়াছেন, আপনাকে আর অধিক দণ্ড দিতে চাহি না।

আপনি যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। শ্রবণ করুন।—আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বর্বর ম্লেচ্ছ জাতি বারবার উপদ্রব করিতেছে। বহু আর্য রাজার রাজ্য তাহারা কাড়িয়া লইয়াছে; তাহারা নারীহরণ করিতেছে, মন্দির দূষিত করিতেছে। আসুন, যদি যুদ্ধ করিবার সাধ থাকে, আমার নেতৃত্বে যুদ্ধযাত্রা করুন; আপনি আমার সঙ্গে যোগ দিলে অন্য রাজারাও যোগ দিবেন। বর্বর বিজাতীয়দের অচিরাৎ হিমালয়ের পরপারে খেদাইয়া দিতে পারিব। আসুন, আর্তত্রাণরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিয়া যশস্বী হোন। অলমিতি।

পত্র পাইয়া মহারাজ লেলিহ শিখায় জ্বলিতেছিলেন, এমন সময় আসিল মগধের দূত। অগ্নি দাবানলে পরিণত হইল।

মন্ত্রীদের মধ্যস্থতায় দূতের প্রাণটা বাঁচিয়া গেল। মহারাজ বজ্রকণ্ঠে মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া দূতকে বিদায় করিলেন। এবার আর ছয় হাজার সৈন্য নয়, বিশ হাজার সৈন্য লইয়া তিনি যাইবেন; রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত করিবেন। প্রথমে নয়পালের কাটা-মুণ্ড হাতে লইয়া তাণ্ডব নাচিবেন, তারপর কর্ণাটের ওই অথর্ব জরদ্গবটাকে মজা দেখাইবেন। এতবড় স্পর্ধা! আমাকে

তাহার অধীনে যুদ্ধ করিতে ডাকে। তিনটা যুদ্ধ জিতিয়া এত দর্প! ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে সহস্র যোজন দূরে বর্বর হানা দিয়াছে তাহাতে আমার কি? আমি কেন বর্বরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইব?

মন্ত্রিগণ রাজার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। রণসজ্জা আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের অবর্তমানে কে শূন্যপাল হইয়া থাকিবে, কিভাবে মন্ত্রীরা রাজ্য পরিচালনা করিবেন, রাজকোষ পূর্ণ করিবার জন্য কিরূপ কর ধার্য করিতে হইবে তাহার আলোচনা হইতে লাগিল।

একদিন মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ অবরোধ পরিদর্শনে গিয়াছেন। কন্যা যথাস্থানে আছে দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল মাতৃদেবীকেও একবার দর্শন করেন। ইচ্ছাটা মাতৃভক্তি প্রণোদিত নয়; মাতৃদেবীকে একটি বিশেষ সংবাদ শুনাইয়া তাঁহার মর্মপীড়া ঘটানোই প্রধান উদ্দেশ্য।

মাতৃদেবী তাঁহাকে দেখিয়া প্রীতা হইলেন না, কেবল একটি ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন। মহারাজ বলিলেন—'আমি মগধ জয় করতে যাচ্ছি বোধহয় শুনেছেন। এবার কুকুর দুটাকে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে আনব, তারপর নর্মদার জলে চুবিয়ে মারব।'

অম্বিকা বললেন—'তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। প্রজাদের ওপর নূতন কর বসিয়েছিস। তুই যুদ্ধে গেলেই প্রজারা ডিম্ব করবে।'

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'ডিম্বের ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছি। আপনি যে আমার বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র করে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলবেন তা হতে দেব না। আপনাকে এবং যৌবনশ্রীকে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নিয়ে যাব।'

জননীর মুখে নিরাশার ব্যঞ্জনা দেখিয়া মহারাজ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

দুই

অম্বিকা দেবীর মস্তিষ্কের অর্ধাংশ রোগে অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেও চিন্তা করিবার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি দুই দিন ধরিয়া একাগ্রভাবে চিন্তা করিলেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বিগ্রহপাল ত্রিপুরীতে আসিয়া জ্যোতিষী রন্তিদেবের গৃহে লুকাইয়া ছিল। তিনি পথ দেখিতে পাইলেন। মনে মনে প্রবন্ধ স্থির করিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ ভাবিলেন মাতৃদেবী যুদ্ধে যাওয়ার নামে ভয় পাইয়াছেন, স্তুতিমিনতি কান্নাকাটি করিয়া গৃহে থাকিবার অনুমতি ভিক্ষা করিবেন। তিনি প্রফুল্ল মনে মাতৃসকাশে চলিলেন।

অম্বিকা কিন্তু কান্নাকাটি করিলেন না, বলিলেন—'জ্যোতিষীকে পাঠিয়ে দে। কবে মরব জানতে চাই।'

লক্ষ্মীকর্ণ একটু বিমূঢ় হইলেন। অবশ্য মাতার মৃত্যুকাল জানিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না; কিন্তু একটা অসুবিধা ছিল। মগধ হইতে ভ্রষ্ট-অভিযানের পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি সভাজ্যোতিষীকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। যাহার কথায় যুদ্ধযাত্রা করিয়া এমন দুর্দশা হয় তাহাকে সভাপণ্ডিত করিয়া রাখার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু তাহার পরিবর্তে অন্য পণ্ডিত নিয়োগ করাও ঘটিয়া উঠে নাই। তেমন ত্রিকালদর্শী পণ্ডিতই বা কোথায়? সব পিণ্ডভোজী ভণ্ড!

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'আমার সভাপণ্ডিত নেই, তাকে দূর করে দিয়েছি।'

অম্বিকা বলিলেন—'সভাজ্যোতিষী চাই না। তোর সভাজ্যোতিষীর জ্ঞানবুদ্ধি তোরই মত।

রন্তিদেবকে ডেকে পাঠা।'

রন্তিদেব ! রন্তিদেবের কথা লক্ষ্মীকর্ণের মনে ছিল না। লোকটা স্পষ্টবাদী বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্য আছে। সে একবার বলিয়াছিল, মাতার আয়ু যতদিন লক্ষ্মীকর্ণেরও ততদিন। 'আচ্ছা দেখি' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে তিনি ফিরিয়া গেলেন। রন্তিদেব যে আকণ্ঠ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন তাহা লক্ষ্মীকর্ণ জানিতে পারেন নাই।

রন্তিদেব সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময় রাজার আহ্বান আসিল। রন্তিদেব শঙ্কিত হইলেন। পাষণ্ড জানিতে পারিয়াছে নাকি ? অবশ্য জ্যোতিষ গণনা অনুসারে রন্তিদেবের সময় এখন ভালই যাইতেছে। তবু কিছুই বলা যায় না ; জন্ম মৃত্যু বিবাহ বলিতে পারে না বরাহ। তিনি ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া বাহির হইলেন। সহধর্মিণীকে বলিয়া গেলেন—'যদি না ফিরি, পুত্রকন্যার হাত ধরে পাটলিপুত্রে যেও, সেখানে আমার ভাই আছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ রন্তিদেবকে ভদ্রভাবেই সম্ভাষণ করিলেন। বলিলেন—'আমি যুদ্ধযাত্রার সংকল্প করেছি। গণনা করে দেখুন ফলাফল ভাল হবে কিনা।'

ভয়ের কোনও কারণ নাই দেখিয়া রন্তিদেব নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন—'এটা যুদ্ধযাত্রার সময় নয়, তবে জ্যেষ্ঠা-মূলীয়া যাত্রা হতে পারে। দেখি।'

তিনি খড়ি পাতিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলেন। আজ আর কোনও প্রকার চাতুরী অবলম্বন করিলেন না। বলিলেন—'নরপাল, গণনায় বড় বিচিত্র ফল পাচ্ছি। আপনার এই যুদ্ধযাত্রার জয় কিম্বা পরাজয় কিছুই হবে না।'

লক্ষ্মীকর্ণ ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিলেন—'তা কি করে সম্ভব ? যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই।'

রন্তিদেব কহিলেন—'কি করে সম্ভব তা জানি না মহারাজ। গণনায় যা পেলাম তাই বলছি।'

মহারাজ খুব তুষ্ট হইলেন না, কিয়ৎকাল ভ্রূবদ্ধ-ললাটে থাকিয়া বলিলেন—'পরাজয় হবে না ?'

'না মহারাজ।'

'প্রাণের আশঙ্কা নেই ?'

'না মহারাজ।'

'ভাল। যদি আপনার গণনা সত্য হয়, অভিযান থেকে ফিরে এসে আপনাকে সভাজ্যোতিষী নিয়োগ করব।'

রন্তিদেব অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, শুধু বলিলেন—'মহারাজের অনুগ্রহ।'

লক্ষ্মীকর্ণ পণ্ডিতকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিতেছিলেন, অম্বিকা দেবীর কথা মনে পড়ায় বলিলেন—'মাতৃদেবী আপনাকে স্মরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুকাল জানতে চান।'

'ভাল মহারাজ।'

এক কিঙ্করী রন্তিদেবকে লইয়া অম্বিকা দেবীর কক্ষে উপনীত করিল। অম্বিকা চোখের ইঙ্গিতে কিঙ্করী এবং সেবিকাদের বিদায় করিলেন, তারপর রন্তিদেবকে শয্যার পাশে বসিতে আদেশ করিলেন। রন্তিদেব উপবিষ্ট হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—'দেবি, আপনার কোষ্ঠী গণনা—'

অম্বিকা বলিলেন—'কোষ্ঠী গণনার জন্য তোমাকে ডাকিনি। কাছে এসে আমার কথা শোনো। —বিগ্রহপাল ত্রিপুরীতে এসে তোমার গৃহে ছিল। তুমি সবই জানো ?'

রন্তিদেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণ করিয়া সতর্কভাবে ঘাড় নাড়িলেন। বৃদ্ধা বলিলেন—'এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো। লক্ষ্মীকর্ণ যৌবনশ্রীকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু সে শীঘ্রই মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে, তখন যৌবনশ্রীকে এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমাদের চোখের আড়াল করতে চায় না। এই সংবাদ বিগ্রহপালকে জানানো প্রয়োজন। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব পাটলিপুত্রে যাও। সেখানে গিয়ে বিগ্রহপালকে সব কথা

বলবে। বলবে, লক্ষ্মীকর্ণ যখন আমাদের নিয়ে মগধে উপস্থিত হবে তখন যেন কৌশলে যৌবনশ্রীকে হরণ করে নিয়ে যায়। আমি যত প্রকারে সম্ভব সাহায্য করব।'

রন্তিদেব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। এই জাতীয় কার্য তাঁহার অত্যন্ত রুচিকর। তিনি নিজের ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিলেন না, মহোৎসাহে বলিলেন—'দেবি, আমি অবিলম্বে পাটলিপুত্র যাত্রা করব। অনেক দিন স্বদেশে যাইনি। আর কিছু আজ্ঞা আছে কি ?'

অম্বিকা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আমার বড় নাতনী বংগাল দেশের রাজপুত্রবধূ—'

'জানি দেবি।'

'সে বড় চতুরা। তাকেও সংবাদটা দিতে পারলে ভাল হয়।'

'দেব। পাটলিপুত্র থেকে আমি স্বয়ং বংগাল দেশে যাব। বীরশ্রীকে নিজমুখে সব কথা বলব।'

'ভাল। তোমার পাথেয় এবং পুরস্কার—'

'দেবি, আপনার দর্শন পেলাম—এই আমার পাথেয় এবং পুরস্কার।'

রাজপুরী হইতে বাহির হইবার পথে রন্তিদেব আবার মহারাজের সাক্ষাৎ পাইলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাতৃদেবীর আয়ু আর কতদিন ?'

রন্তিদেব সহাস্যে বলিলেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর্যা এখনও দীর্ঘকাল বাঁচবেন।'

তিনদিনের মধ্যে রন্তিদেব স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। বন্ধু ভৃত্য যজমানদের বলিয়া গেলেন তীর্থযাত্রায় চলিয়াছেন ; কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া দুই চারি মাসের মধ্যে ফিরিবেন। সঞ্চিত নিধি যাহা ছিল সব সঙ্গে লইলেন। মন একটু বিষণ্ণ হইল। সংসার অনিত্য, আবার ফিরিতে পারিবেন কিনা কে জানে ?

তিন

ত্রিপুরীতে রণসজ্জা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে।

রাজার যে স্থায়ী সেনাদল আছে তাহা যথেষ্ট নয়। তাই রাজ্যের সর্বত্র রাজপুরুষেরা গিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। নবাগত সৈনিকেরা রণাভ্যাস করিতেছে, ধনুর্বাণ অসি ভল্ল চালাইতে শিখিতেছে। নবাগতদের মধ্যে যাহারা যোগ্যতর তাহারা নায়ক পত্তিনায়কের পদ পাইতেছে। মাঠে মাঠে রণাঙ্গন। কড় কড় শব্দে রণভেরী বাজিতেছে, শৃঙ্গ তূরী করতাল বাজিতেছে। সেই তুমুল শব্দ-সংঘট্টে সৈনিকদের রক্ত নাচিয়া উঠিতেছে। হুলস্থূল কাণ্ড।

কেবল সৈন্য সংগ্রহ নয় ; সেই সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ, খাদ্য সংগ্রহ, বাহন সংগ্রহ। চতুরঙ্গ সেনা, হস্তী অশ্ব রথ পদাতি। তাহার উপযোগী খাদ্য চাই, খাদ্য বহনের জন্য যানবাহন চাই। অসংখ্য অনুচর—পাচক, বৈদ্য, গুপ্তচর, পথনির্দেশক, হস্তীপক, অশ্বপাল, গণক, গণিকা। উপরন্তু রাজমাতা ও রাজকন্যা সঙ্গে যাইতেছেন, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র অবরোধ, স্বতন্ত্র দাসী কিঙ্করী সেবিকা। রাজ্যের রাজপুরুষগণ নানা প্রকার ব্যবস্থা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছেন। সময় বড় বেশি নাই, জ্যেষ্ঠা-মূলীয়া তিথি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

প্রজারা, বিশেষত নগরবাসী প্রজারা, নূতন করবৃদ্ধির জন্য প্রথমে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু রণসজ্জা যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাহারাও অসন্তোষ ভুলিয়া যাইতে লাগিল। রণোদ্যমের একটা প্রবল উন্মাদনা আছে ; রণবাদ্য, শ্রেণীবদ্ধ সেনার সদর্প পদপাত, অস্ত্রের ঝনঝনা, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহণ, সকল মিলিয়া অসামরিক মানুষকেও রণমত্ত করিয়া তোলে, যুদ্ধটা ন্যায়যুদ্ধ

কি অন্যায় যুদ্ধ সে বিচার আর থাকে না।

একদিন অশ্ব-ব্যাপৃতকের অধীন এক সেনানী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন—'আয়ুষ্মন্, ঘোড়া কিছু কম পড়ছে। তিন হাজার ঘোড়া সংগ্রহ হয়েছে। আরও চার পাঁচ শত প্রয়োজন।'

মহারাজ বলিলেন—'যখন প্রয়োজন তখন সংগ্রহ কর।'

সেনানী বলিলেন—'যুদ্ধের উপযোগী ঘোড়া আর পাওয়া যাচ্ছে না। দেশান্তরে পাঠিয়েও সংগ্রহ করা গেল না।'

মহারাজ বলিলেন—'কি আশ্চর্য, কোনও দেশে ঘোড়া নেই!'

সেনানী বলিলেন—'দূর দেশে লোক পাঠালে সংগ্রহ করা যায় কিন্তু তাতে বিলম্ব হবে। জ্যৈষ্ঠ মাস আগতপ্রায়, জ্যেষ্ঠা-মূলীয়া তিথিতে যাত্রা করতে হলে আর সময় নেই।'

মহারাজ বলিলেন—'তোমরা অপদার্থ। যেখান থেকে পার সংগ্রহ কর।'

সেনানী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'এখানে এক ম্লেচ্ছ অশ্ব-বণিক কিছুদিন থেকে রয়েছে, তার আগড়ে তিন চার শত ঘোড়া আছে। উৎকৃষ্ট ঘোড়া, কিন্তু বড় বেশি মূল্য চাইছে। কোষাধ্যক্ষ বলছেন, অত মূল্য দিয়ে ঘোড়া কেনা যেতে পারে না।'

লক্ষ্মীকর্ণ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন—'বেশি মূল্য চাইছে! কত মূল্য চায়?'

'প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য আট স্বর্ণ-দীনার।'

মহারাজ লাফাইয়া উঠিলেন—'আট দীনার! একটা ঘোড়ার মূল্য আট দীনার! চোর! তস্কর! আট দীনারে আটটা ঘোড়া পাওয়া যায়। যাও তুমি, সৈন্য নিয়ে এখনি সমস্ত ঘোড়া কেড়ে নিয়ে এস।'

সেনানী ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'কত মূল্য দেওয়া হবে?'

রাজা বলিলেন—'দেব না মূল্য। এক কপর্দক মূল্য দেব না।'

সেনানী আরও কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—'কিন্তু আয়ুষ্মন্, বিদেশী বণিকের পণ্য হরণ করলে নিন্দা হবে। ভবিষ্যতে কোনও বিদেশী বণিক এ রাজ্যে আসবে না।'

রাজা গর্জন করিলেন—'না আসুক। ম্লেচ্ছ বণিকের এত স্পর্ধা সে আমার রাজ্যে বাণিজ্য করবে আবার আমাকেই ঠকাবে! যাও, তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে এস। শুধু ঘোড়া নয়, ধনরত্ন যা পাবে সব হরণ করে আনবে।'

সেনানী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন অপরাহ্নে একদল সৈন্য গিয়া ম্লেচ্ছ বণিকের আস্তানায় হানা দিল। তাহাদের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া বণিক নীরব রহিল, এতগুলা সশস্ত্র সৈনিকের বিরুদ্ধে তাহারা কয়জন কী করিতে পারে? কেবল তাহাদের চক্ষু দিয়া অসহায় ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।

সৈন্যগণ অশ্ব ও ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিলে বণিক কিছুক্ষণ শূন্য আগড়ের দিকে চাহিয়া কঠিন-দেহে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে সূর্য মাঠের পরপারে দিগন্তরেখা স্পর্শ করিল। বণিক তখন একজন সহচরকে ইঙ্গিত করিল, সহচর কয়েকটি পট্টিকা আনিয়া মুক্ত স্থানে পাতিয়া দিল। তারপর সকলে পট্টিকার উপর পশ্চিমাস্য দাঁড়াইয়া তাহাদের পুষ্প-নৈবেদ্যহীন অনাড়ম্বর উপাসনা আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মীকর্ণ বিনা শুল্কে ঘোড়া পাইয়া হৃষ্ট হইলেন। তিনি জানিতেন না যে এ সংসারে বিনা শুল্কে কিছুই পাওয়া যায় না, মহাকালের অক্ষপটল পুস্তিকায় কালির আঁচড় পড়িয়াছে।

চার

রন্তিদেব পাটলিপুত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন সেখানেও সাজ সাজ রব। তিনি ভ্রাতা যোগদেবের গৃহে পরিবার রাখিয়া রাজভবনে চলিলেন।

রাজভবনের বাতাস কিছু উত্তপ্ত। একে তো যুদ্ধের উত্তেজনা, উপরন্তু ত্রিপুরী হইতে দূত ফিরিয়া আসিয়া নয়পালের নিকট লক্ষ্মীকর্ণের যুদ্ধঘোষণাকালীন কটুবাক্যগুলি নিবেদন করিয়াছে। মহারাজ অসুস্থ দেহে চটিয়া আগুন হইয়া আছেন।

বিগ্রহপালের সহিত রন্তিদেবের সাক্ষাৎ হইলে বিগ্রহ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন, প্রশ্নোৎফুল্ল নেত্রে বলিলেন—'আর্য, আপনি! কোনও সংবাদ আছে নাকি?'

রন্তিদেব বলিলেন—'আছে। গ্রহ অনুকূল। চল, নিভৃত স্থানে বসা যাক।'

এই সময় অনঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিবাকালে অধিকাংশ সময় রাজপুরীতেই কাটায়, বিগ্রহের সঙ্গ ছাড়ে না। রাত্রিকালে বিগ্রহ জোর করিয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেন, বলেন—'তুই মহাপাষণ্ড, সারাদিন বান্ধুলিকে একলা ঘরে ফেলে চলে আসিস। বান্ধুলি হয়তো ভাবে, আমিই তোকে আট্‌কে রাখি। কাল থেকে তুই আর এখানে আসবি না। এখানে তোর এত কি কাজ?' অনঙ্গ হাসিয়া চলিয়া যায়, পরদিন আবার আসে। সে বিগ্রহপালের চরিত্রের দুর্বলতা জানে, অতি অল্প কারণে তিনি হতাশ্বাস হইয়া পড়েন; তাই সে সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকে।

অনঙ্গকে দেখিয়া রন্তিদেব আহ্লাদিত হইলেন। তিনজনে রাজপুরীর এক নিভৃত বিশ্রামকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন।

রন্তিদেবের মুখে সংবাদ শুনিয়া বিগ্রহপাল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, অনঙ্গও উল্লসিত হইল। তিনজনে মিলিয়া মন্ত্রণা হইল। মহারাজকে বা অন্য কাহাকেও এখন একথা বলিবার প্রয়োজন নাই; মহারাজের শরীর ভাল নয়, এ সময় তাঁহার চিত্ত বহু চিন্তায় ভারাক্রান্ত করা অনুচিত। যাহা করিবার তাঁহারা তিনজনে করিবেন। লক্ষ্মীকর্ণদেবের গুপ্তচরেরা নিশ্চয় পাটলিপুত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোনও প্রকারে মন্ত্রভেদ ঘটিলে সব ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

রন্তিদেব বলিলেন—'আর একটা কথা। অম্বিকা দেবীর আজ্ঞা, বীরশ্রীকেও সংবাদ দিতে হবে।'

বিগ্রহপাল অনঙ্গের উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—'ঠিক কথা। অনঙ্গ, দিদিকে সংবাদ দিতে হবে! কিন্তু কে যাবে দিদিকে সংবাদ দিতে? অচেনা কেউ গেলে চলবে না। অনঙ্গ, তুই—'

রন্তিদেব বলিলেন—'আমি বিক্রমণিপুর যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। বীরশ্রী আমাকে চেনে, কোনও অসুবিধা হবে না।'

বিগ্রহপাল বিগলিত হইয়া বলিলেন—'আপনি যাবেন! ধন্য! আর্য, আমাদের জন্য আপনাকে কত ক্লেশ স্বীকার করতে হচ্ছে—'

রন্তিদেব বলিলেন—'কুমার, এতেই আমার আনন্দ। তুমি আমার যাত্রার ব্যবস্থা কর।'

বিগ্রহ বলিলেন—'যাত্রার ব্যবস্থাপক তো আপনার ঘরেই রয়েছেন। আর্য যোগদেব সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। পরদিন পূর্বাহ্ণে রন্তিদেব নৌকায় চড়িয়া বংগাল যাত্রা করিলেন। যে নৌকায় বিগ্রহপাল ত্রিপুরী গিয়াছিলেন সেই নৌকা। দিশারুও সেই গরুড়।

যাত্রার পূর্বে বিগ্রহপাল রন্তিদেবের হাতে একটি লিপি দিয়া বলিলেন—'এই পত্রখানি দেবী

বীরশ্রীকে দেবেন।'

পাটলিপুত্র হইতে জাতবর্মা ও বীরশ্রী যথাকালে বিক্রমণিপুর পৌঁছিয়াছিলেন।

জাতবর্মা পিতাকে সমস্ত সমাচার জানাইয়া নয়পালের পত্র তাঁহাকে দিলেন। মহারাজ বজ্রবর্মা স্থিরবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ; তিনি একদিকে যেমন পরিতোষ লাভ করিলেন, অন্যদিকে তেমনি উদ্বিগ্ন হইলেন। নয়পালের সহিত এতদিন তাঁহার রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল না, এখন যদি মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয় তাহা অতীব সুখের কথা ; কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণদেব কুটুম্ব, তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বিরোধও বাঞ্ছনীয় নয়। একদিকে পর আপন হইতেছে, অপরদিকে আপন পর হইয়া যাইতেছে। জীবনে নিত্যই এই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু মিত্রের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। লক্ষ্মীকর্ণটা মহা দুষ্ট, স্বয়ংবর সভায় এ কী করিয়া বসিল ! কিন্তু তবু সে কুটুম্ব ; যতই দুর্ব্যবহার করুক এক কথায় তাহাকে ত্যাগ করা যায় না। অথচ নয়পাল প্রকৃত সজ্জন, তাঁহার মিত্রতার প্রস্তাব উপেক্ষা করিলে নিজেরই অনিষ্ট—

বজ্রবর্মা সহসা মনঃস্থির করিতে পারিলেন না, কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

এই সময় হঠাৎ রন্তিদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতবর্মা তাঁহাকে চিনিতেন না, পরিচয় শুনিয়া বীরশ্রীর কাছে সংবাদ পাঠাইলেন। বীরশ্রী আসিয়া গ্রহাচার্যকে প্রণাম করিলেন।

রন্তিদেব তখন তাঁহার আগমনের রহস্য ভেদ করিলেন। বিগ্রহপালের পত্রও বীরশ্রীকে দিলেন। বীরশ্রী পাঠ করিয়া পত্র জাতবর্মাকে দিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

ভ্রাতৃজায়া দেবী বীরশ্রী ও অগ্রজ শ্রীজাতবর্মার চরণাম্বুজে হতভাগ্য বিগ্রহপালের শতকোটি বিনতি। দিদি, তোমরা চলিয়া গিয়া অবধি পাটলিপুত্র শূন্য হইয়া গিয়াছে। অধিক কি লিখিব, আমার হৃদয়ের বেদনা তোমরা অবগত আছ। যৌবনশ্রীকে যদি না পাই এ জীবন রাখিব না, আগামী যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিব। আর্য রন্তিদেবের মুখে নূতন সংবাদ শুনিও। একটু আশার আলো দেখা দিয়াছে। কিন্তু তুমি না থাকিলে কে বুদ্ধি দিবে ? কে নিয়ন্ত্রিত করিবে ? যদি ভাগ্যহত দেবরের প্রতি তিলমাত্র করুণা থাকে, পতিদেবতাকে লইয়া নিজ গৃহ পাটলিপুত্রে চলিয়া আসিও। পিতৃদেব অসুস্থ, যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। অলমিতি।

সপ্তাহকাল পরে পাঁচখানি রণতরী সাজাইয়া জাতবর্মা পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে বীরশ্রী ও রন্তিদেব। স্থলপথে একশত রণহস্তী চলিয়াছে। মহারাজ বজ্রবর্মা কর্তব্য স্থির করিয়া নয়পালকে পত্র দিয়াছেন—

...কুমার জাতবর্মাকে আমার প্রতিভূস্বরূপ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য পাঠাইলাম। আমার একশত রণহস্তী আপনার পক্ষে যুদ্ধ করিবে। ধর্মের জয় হোক।

পাঁচ

জ্যৈষ্ঠ মাসের নির্দিষ্ট তিথিতে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ চতুরঙ্গ সেনা সাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সৈন্যদলের মাঝখানে অন্তঃপুর, ব্যূহের মধ্যে ব্যূহ। রাজমাতা অম্বিকা ও রাজকুমারী যৌবনশ্রী আন্দোলিকায় চলিয়াছেন। দুইটি স্বতন্ত্র আন্দোলিকা, সূক্ষ্ম পট্টাবরণ দ্বারা বেষ্টিত। অম্বিকা নিজ আন্দোলিকায় শয়ান রহিয়াছেন, দুই পাশে দুই উপস্থায়িকা। যৌবনশ্রী নিজ আন্দোলিকায় একাকিনী আছেন ; তপঃকৃশা অপর্ণার ন্যায় মূর্তি, যেন পঞ্চাগ্নি তপস্যা করিয়া শরীর কৃশ হইয়াছে ; তবু রূপের অবধি নাই। রঙ্গিণী ও দাসী কিঙ্করীরা পশ্চাতে কেহ শিবিকায় কেহ

গো-রথে চলিয়াছে।

শঙ্খধ্বনি তূর্যধ্বনি করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া বিপুল বাহিনী মহাস্থানীয় হইতে নির্গত হইল। সর্পিল গতিতে মেখল পর্বতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শোণ নদের উৎস পরিক্রমণ করিয়া নদের পূর্বপারে পৌঁছিল. তারপর তীর ধরিয়া ঈশান কোণ অভিমুখে চলিল। ওইদিকে মগধ।

রাজ্যের মহামন্ত্রী ত্রিপুরীতে শূন্যপাল হইয়া রহিলেন। তাঁহার অধীনে কর্মসচিব হইয়া রহিল লম্বোদর। লম্বোদর অনুচ্চপদস্থ গুপ্তচর, এ পদ তাহার প্রাপ্য নয় ; কিন্তু সে যৌবনশ্রীর পলায়নে বাধা দিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল, এ পদ তাহারই পুরস্কার। উপরন্তু মহামন্ত্রী মহাশয়ের মনে যদি পাপ থাকে, লম্বোদর তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিবে। চক্রের ভিতর চক্র।—

পাটলিপুত্রেও রণসজ্জা সম্পূর্ণ হইয়াছে। জাতবর্মা বীরশ্রী ও শত হস্তী উপস্থিত। গুপ্তচরেরা প্রত্যহ আসিয়া ত্রিপুরীর সংবাদ দিতেছে। লক্ষ্মীকর্ণ শোণ নদকে পাশ কাটাইয়া পূর্বতটে উপস্থিত হইয়াছেন এবং শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন। তিনি মগধের সীমান্তে পদার্পণ করিবার পূর্বেই তাঁহার পথরোধ করিতে হইবে।

যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যে যৌবনশ্রীকে উদ্ধার করিবার পরামর্শ চলিতেছে। মন্ত্রণাচক্রে আছেন বীরশ্রী জাতবর্মা বিগ্রহপাল অনঙ্গ ও রন্তিদেব। বহু আলোচনার পর পরামর্শ স্থির হইয়াছে। দুই সৈন্যদল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইবে তখন বীরশ্রী মাতামহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। রন্তিদেবের বড়ই ইচ্ছা ছিল তিনি সন্ন্যাসী সাজিয়া শত্রুব্যূহে প্রবেশ করেন কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব এক কথায় অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। বীরশ্রী বলিয়াছেন—'আপনি যদি ধরা পড়েন পিতৃদেব আপনার মুণ্ডটি কেটে নেবেন, কিন্তু আমার উপর যত রাগই হোক মুণ্ড কাটবেন না।' অগত্যা রন্তিদেব রাজবৈদ্যের নিকট হইতে একটি অতি দুষ্প্রাপ্য চৈনিক ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ঔষধের নাম অহিফেন। ইহা বিষও বটে রসায়নও বটে ; অধিক সেবন করিলে মৃত্যু, কিন্তু অল্প সেবন করিলে অনিদ্রার মহৌষধ। এই পরম বস্তুটি যৌবনশ্রীর উদ্ধার কার্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তারপর একদিন যুদ্ধযাত্রার কাল উপস্থিত হইল। মহারাজ নয়পাল আপন বিশ্রামকক্ষে যুদ্ধগামীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। নয়পালের বাসনা ছিল তিনি স্বয়ং সৈন্যদলের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে যাইবেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মহারানী তাঁহাকে যাইতে দেন নাই, রাজবৈদ্যও ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া আপত্তি করিয়াছেন। মহারাজের কক্ষে বিগ্রহপাল জাতবর্মা অনঙ্গ ও প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ সমবেত হইলে নয়পাল বলিলেন—'আমি অসমর্থ, তাই যুবরাজ বিগ্রহপালকে সেনাপতিত্বে বরণ করলাম।' বিগ্রহপালের ললাটে তিলক পরাইয়া দিয়া পুনশ্চ বলিলেন—'বৎস, তোমাকে উপদেশ আর কী দেব ? তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত, বুদ্ধিমান, বীর ; বীরকুলে তোমার জন্ম। তোমার সঙ্গে রইলেন অগ্রজপ্রতিম কুমার জাতবর্মা আর রণপণ্ডিত সেনানীগণ ; এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ করবে। যাও, শত্রু দলন করে ফিরে এস। ভগবান সিদ্ধার্থ তোমার মনোরথ সিদ্ধ করুন।'

নয়পাল পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, বিগ্রহ পিতার পদধূলি মস্তকে লইলেন। তারপর নয়পাল অন্য সকলকে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে জাতবর্মার হাত ধরিয়া জনান্তিকে বলিলেন—'তোমরা ভিতরে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র করছ আমি বুঝতে পেরেছি। কী ষড়যন্ত্র আমি জানতে চাই না। তুমি বিগ্রহকে দেখো। আর স্মরণ রেখো, আমার পুত্রবধূ যৌবনশ্রীর মুখ না দেখা পর্যন্ত আমার প্রাণে আনন্দ নেই।'

জাতবর্মা তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলেন—'স্মরণ রাখব মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর জাতবর্মা বিগ্রহ ও অনঙ্গপাল মহারানীর নিকট গেলেন। বীরশ্রী ও বান্ধুলি সেখানে

উপস্থিত। সকলে মহারানীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। মহারানী দরবিগলিত নেত্রে সকলের শিরশ্চুম্বন করিয়া রণমঙ্গল কামনা করিলেন।

দ্বিপ্রহরে মগধের সৈন্যদল শঙ্খধ্বনি তূর্যধ্বনি করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া বাহির হইল। সেনাদলের মধ্যস্থলে পুষ্পমাল্যভূষিত একটি রথ, রথের চূড়ায় রক্তবর্ণ কেতন উড়িতেছে। রথ চালাইতেছেন বীরশ্রী, তাঁহার পাশে উপবিষ্টা বান্ধুলি। দিদিরানী যুদ্ধে যাইতেছেন, তাই বান্ধুলিকেও ধরিয়া রাখা যায় নাই ; সে না থাকিলে দিদিরানীর পর্ণসম্পুট বহন করিবে কে ? রথের দুইপাশে বিগ্রহপাল ও জাতবর্মা অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছেন, রথের পিছনে অনঙ্গ।

এ যেন যুদ্ধযাত্রা নয়, অপূর্ব শোভাযাত্রা।

নবম পরিচ্ছেদ

এক

দুই পক্ষের গুপ্তচরগণ বিপক্ষ-বাহিনীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল। মগধের সৈন্যদল পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিবার অষ্টাহ পরে একদিন প্রখর মধ্যাহ্নে দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। স্থানটি শোণ নদের পূর্বতটে, পাটলিপুত্র হইতে পঞ্চাশ-ষাট ক্রোশ দক্ষিণে।

নদের অববাহিকায় কোথাও ঊষর মুক্ত ভূমি, কোথাও বা শাল তমাল জম্বু শাল্মলীর বন, শাখোট শিংশপাও আছে। চেদিরাজ্য ও মগধের সীমান্ত এই জনবসতিহীন অরণ্যমেখলা দ্বারাই নির্দেশিত হইত, সুচিহ্নিত সীমারেখা ছিল না। সেদিন দ্বিপ্রহরে লক্ষ্মীকর্ণ এই সীমান্তের এক জম্বুবনে আসিয়া বাহিনীর যাত্রা স্থগিত করিলেন। জম্বুবন ছায়াস্নিগ্ধ, তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ; এইখানে তপ্ত দ্বিপ্রহর নিষ্পন্ন করিয়া তৃতীয় প্রহরে আবার অগ্রসর হইবেন। মগধের সৈন্যদল বেশি দূরে নাই, শীঘ্রই সাক্ষাৎকার ঘটিবে। অতএব সৈন্যদলকে বিশ্রাম দিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

ধূলিধূসর সৈন্যদল ছুটি পাইয়া প্রথমেই ছুটিয়া গিয়া নদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল ; হস্তী ও অশ্বগণ তীরে গিয়া জল পান করিল। সৈন্যগণ স্নানান্তে জম্বুকুঞ্জে ফিরিয়া দ্বৈপ্রাহরিক আহারের চেষ্টায় তৎপর হইল। ঘোড়াগুলি নদীর তীরে সবুজ শষ্প যাহা পাইল ছিঁড়িয়া খাইল। হস্তীযূথ জম্বুবৃক্ষের সপত্র সফল শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া চর্বণ করিতে লাগিল।

সৈনামণ্ডলীর মধ্যস্থলে এক বিশাল জম্বুবৃক্ষতলে আসন পরিগ্রহ করিয়া মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ একটি আস্ত কণ্টকী ফল সেবন করিয়া পিণ্ডপূজা সম্পন্ন করিলেন ; সঙ্গে পরিপাকের জন্য এক স্কন্ধ কদলী। রাজমাতা আন্দোলিকায় শুইয়া কেবল এক ঘটিকা জল পান করিলেন। যৌবনশ্রী আহার্যের স্থালী হইতে এক মুষ্টি ভিজা মুদ্গ দাল লইয়া মুখে দিলেন।

সহসা সৈন্যদলের সম্মুখভাগ হইতে কড় কড় শব্দে পটহ বাজিয়া উঠিল। সৈন্যগণ যে যেমন অবস্থায় ছিল ক্ষণকাল তেমনি রহিল, তারপর হাতের কাজ ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিল। লক্ষ্মীকর্ণ আসন ত্যাগ করিয়া নিমেষমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পটহধ্বনির সংকেত সুস্পষ্ট ; শত্রুসৈন্য দেখা দিয়াছে।

লক্ষ্মীকর্ণ লৌহজালিক ত্যাগ করেন নাই, তরবারি কটিতে ছিল ; কিন্তু হাতের কাছে যানবাহন ছিল না। তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় সেনাদলের সম্মুখদিকে চলিলেন। অনেক সৈনিকও সেইদিকে ছুটিয়াছিল ; লক্ষ্মীকর্ণ তাহাদের মৃগযূথের ন্যায় দুইপাশে সরাইয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন।

মহারাজ সেনাদলের পুরোভাগে উপস্থিত হইলে পটহধ্বনি নীরব হইল। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় দশ রজ্জু। প্রান্তরের পরপারে শালবন আরম্ভ হইয়াছে। শালবনের মাথা ভেদ করিয়া ধ্বজশীর্ষে কেতন উড়িতেছে, কয়েকটা হস্তী বন হইতে বাহিরে আসিয়া শুণ্ড আস্ফালন করিতেছে। বনের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায় কাতারে কাতারে সৈন্য। তাহারাও প্রান্তরের পরপারে শত্রু সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছে এবং ডঙ্কা বাজাইতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কিছুক্ষণ শাণিত চক্ষে শালবনের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার মস্তিষ্কে দ্রুত চিন্তার ক্রিয়া হইতে লাগিল। এই সুযোগ ! উহারা পথশ্রমে ক্লান্ত, ব্যূহ রচনার অবকাশ পায় নাই। আমার সৈন্যদল বিশ্রাম পাইয়াছে, আহার করিয়াছে। এখন যদি আক্রমণ করি উহারা দাঁড়াইতে পারিবে না। —

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীকর্ণের সেনানীদল তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, লক্ষ্মীকর্ণ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বজ্রকণ্ঠে কহিলেন—'দেখছ কি ! ঢক্কা বাজাও—শৃঙ্গ বাজাও ! সৈন্যগণ প্রস্তুত হোক। এখনি ওদের আক্রমণ করব। আর কাল বিলম্ব নয়, সন্ধ্যার পূর্বেই অধম শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে দেব।'

ঢক্কা ও শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল—ডঙ্ক ডঙ্ক ! তুতুহু তুতুহু ! এই বিপুল শব্দ-সংঘট্টের সঙ্কেত সৈন্যগণের অপরিচিত নয়। হস্তী অশ্ব রথ পদাতি ঝটিতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। —

সেদিন লক্ষ্মীকর্ণ যদি মগধ-বাহিনীকে আক্রমণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে ফল কিরূপ হইত বলা যায় না ; হয়তো তিনি জয়লাভ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আক্রমণ করা হইল না, বিধাতা বাদ সাধিলেন। সহসা সূর্যের মুখের উপর ছায়া পড়িল, চারিদিক ধূম্রবর্ণ হইয়া গেল। লক্ষ্মীকর্ণ চকিতে ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিলেন। নৈর্ঋত হইতে যমদূতাকৃতি মেঘ ছুটিয়া আসিতেছে। নিদাঘের প্রমত্ত ঝঞ্ঝাবাত।

দেখিতে দেখিতে ঝড় আসিয়া পড়িল। ঝক্‌মক্ বিদ্যুৎ, কড় কড় বজ্র, শন্ শন্ ঝটিকা। মনে হইল উন্মত্ত ঝটিকা জম্বুবনের বৃক্ষগুলাকে কেশ ধরিয়া নাড়া দিয়া উন্মূলিত করিয়া ফেলিবে। তারপর সেখান হইতে লাফাইয়া শালবনের উপর গিয়া পড়িল। শালবন মথিত হইয়া উঠিল।

ঝড়ের সঙ্গে নামিল বৃষ্টি। মুষলধারায় বর্ষণ। হাতি ঘোড়া ভিজিতে লাগিল ; সৈন্যদল ভিজিয়া কাদা হইল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ ভিজিলেন। আন্দোলিকার আবরণের জন্য অম্বিকা ও যৌবনশ্রী কিছু রক্ষা পাইলেন। আর এক বিপদ, জম্বুবৃক্ষের মোটা মোটা ডাল ঝড়ের ঝাঁকানিতে মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। দুই-চারি জন সৈনিকের হাত-পা ভাঙ্গিল। কয়েকটা ঘোড়া ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। হাতিগুলা আত্মরক্ষার চেষ্টায় শুঁড় উঁচু করিয়া রহিল। দুই পক্ষের প্রায় সমান অবস্থা। ওপক্ষে বীরশ্রী বান্ধুলি জাতবর্মা বিগ্রহপাল সকলে রথে বসিয়া ভিজিলেন ; সৈন্যদের তো কথাই নাই। কেবল শালগাছের ডাল অত পল্‌কা নয়, তাই বেশি ভাঙ্গিল না।

এ দুর্যোগে কে যুদ্ধ করিবে ? সকলে সাময়িকভাবে যুদ্ধচিন্তা ত্যাগ করিলেন।

প্রায় দুই ঘটিকা মাতামাতি চলিবার পর ঝড় উড়িয়া গিয়া আকাশ আবার পরিষ্কার হইল। চতুর্দিক বর্ষণধৌত সূর্যকিরণে ঝলমল করিয়া উঠিল। তখনও সূর্যাস্ত হইতে দুই ঘটিকা বিলম্ব আছে।

এখন আর যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই, আরম্ভ করিলে যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে। দুই পক্ষ বনের মধ্যে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলেন ; কয়েকটা শিবির পড়িল। যুদ্ধ হইবে কাল প্রাতে।

দুই

দুই সৈন্যদল মুখোমুখি বসিয়াছে, মাঝখানে প্রান্তরের ব্যবধান। দুই পক্ষই সতর্ক আছে; জম্বুবন ও শালবন ঘিরিয়া রক্ষীরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাদ্যকরের দল বনের কিনারে স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিতেছে, শত্রুপক্ষের কোনও প্রকার সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখিলেই ভেরী-তূরী বাজাইয়া নিজপক্ষকে সাবধান করিয়া দিবে।

তখনও সূর্যাস্ত হইতে দুই তিন দণ্ড বিলম্ব আছে, শালবনের ভিতর হইতে একটি রথ বাহির হইয়া আসিল। জম্বুবনের রক্ষীরা দেখিল রথটি ধীর মন্থর গমনে কণ্টকগুল্ম বাঁচাইয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে। সঙ্গে হস্তী অশ্ব পদাতি নাই, কেবল একটি রথ। সকলে বিস্ময়-বর্তুলিত চক্ষে চাহিয়া রহিল।

রথটি অর্ধেক পথ আসিলে বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। রথের সারথি স্ত্রীলোক। সঙ্গে আর কেহ নাই, স্ত্রীলোকটি রথ চালাইয়া একাকিনী আসিতেছে।

অবশেষে রথ আসিয়া জম্বুবনের সম্মুখে দাঁড়াইল। রক্ষীরা রথ ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা পূর্বে বীরশ্রীকে দেখে নাই, ভাবিল—এ কি মগধের রাজ্যশ্রী! এমন নয়ন ভুলানো রূপ, এমন রত্নদ্যুতি বিচ্ছুরিত বেশভূষা—এ রাজলক্ষ্মী না হইয়া যায় না।

রক্ষীদের নায়ক সাহসে ভর করিয়া বলিল—'দেবি, আপনি কে? এখানে কার সঙ্গে প্রয়োজন?'

দেবী প্রসন্ন হাসিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন, বলিলেন—'একজন ঘোড়ার রাশ ধর।—তোমরা আমাকে চেনো না। আমি মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রী।'

সকলে মুখ ব্যাদান করিয়া রহিল। বীরশ্রী রথ হইতে একটি জলপূর্ণ তাম্রকুণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন—'হাঁ করে দেখছ কি? রথের মধ্যে ঠাকুরের প্রসাদ আছে, বার কর। আমি ঠাকুরানীকে দেখতে এসেছি। কোথায় আছেন ঠাকুরানী, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।'

একজন রক্ষী রথ হইতে প্রকাণ্ড থালি বাহির করিল; থালির উপর স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের গোলক। বীরশ্রী তাম্রকুণ্ড হস্তে মরাল গমনে জম্বুবনে প্রবেশ করিলেন, রক্ষী মিষ্টান্নের থালি হস্তে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। বীরশ্রী শত্রুশিবির হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার আদেশ যে অমান্য করা যাইতে পারে একথা কাহারও মনে আসিল না। কেবল, তিনি বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইলে রক্ষীদের নায়ক একজনের কানে কানে কিছু বলিল, সে ছুটিয়া গেল মহারাজকে সংবাদ দিতে।

জম্বুবনের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ চলিবার পর বীরশ্রী দেখিলেন, বড় বড় কয়েকটি গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি শিবির তোলা হইয়াছে। এই শিবিরগুলিতে রাজা, তাঁহার প্রধান সেনানীগণ, রাজমাতা এবং রাজকন্যার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণ সৈনিকদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নাই, তাহারা যে যেখানে পাইবে মাটিতে শুইয়া রাত্রি কাটাইবে।

মধ্যস্থলে রাজার শিবির। তাহার বামপার্শ্বে কয়েকটি বৃক্ষের অন্তরে অন্তঃপুর, অর্থাৎ রাজমাতা, রাজকন্যা এবং তাঁহাদের চেটী-কিঙ্করীদের বাসস্থল। মিষ্টান্নের থালি লইয়া রক্ষী সেইদিকে চলিল, বীরশ্রী তাহার অনুসরণ করিলেন। জম্বুবনের মধ্যে দিনের আলো কমিয়া আসিতেছে; এখনও শিবির ঘিরিয়া পাহারা বসে নাই। একটি বস্ত্রাবাসের সম্মুখে আসিয়া রক্ষী দাঁড়াইল। বলিল—'এটি রাজমাতার শিবির।'

বীরশ্রী শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রক্ষী দ্বারের কাছে থালি নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শিবিরের মধ্যে দিবালোক নিঃশেষিত, এখনও দীপ জ্বলে নাই। অম্বিকা একাকী শয্যায় শুইয়া

আছেন। বীরশ্রী হ্রস্বকণ্ঠে ডাকিলেন—'দিদি !'

কর্কশ স্খলিতস্বরে অম্বিকা প্রশ্ন করিলেন—'কে ?'

'আমি বীরা'—জলের পাত্র রাখিয়া বীরশ্রী পিতামহীর শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইলেন। অম্বিকা একটি বাহু দিয়া তাঁহাকে সবলে জড়াইয়া লইলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ থাকিবার পর অন্ধকারে দুইজনে কানে কানে কথা বলিতে লাগিলেন ; দ্রুত নিম্নকণ্ঠে বার্তা বিনিময় হইল।

ওদিকে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কাছে সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। তিনি তীরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। কী, এত বড় স্পর্ধা ! শত্রুর পুত্রবধূ আমার শিবিরে আসিবে ! আজ দেখিয়া লইব। বলা বাহুল্য, বীরশ্রী ও জাতবর্মা যে একশত রণহস্তী লইয়া নয়পালের পক্ষে যোগ দিয়াছেন, লক্ষ্মীকর্ণ গুপ্তচরের মুখে তাহা অবগত ছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ যখন মাতৃদেবীর শিবিরে প্রবেশ করিলেন তখন শিবিরে দীপ জ্বলিয়াছে। উপস্থায়িকা দুইজন ভয়ে ভয়ে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। বীরশ্রী পিতামহীর শয্যাপার্শে বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া আসিয়া সহজভাবে পিতাকে প্রণাম করিলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ জ্বলজ্বল চক্ষে চাহিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন, বলিলেন—'তুই কি জন্য এখানে এসেছিস ?'

উপস্থায়িকারা মহারাজের মূর্তি দেখিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া পলায়ন করিল। বীরশ্রী শান্তস্বরে বলিলেন—'আমি ঠাকুরানীকে দেখতে এসেছি। তাঁর জন্য গঙ্গাজল আর দেবতার প্রসাদ এনেছি।'

লক্ষ্মীকর্ণ গর্জন করিলেন—'গঙ্গাজল ! প্রসাদ ! দুষ্টা, তুই শত্রুর গুপ্তচর, তোকে পাঠিয়েছে সন্ধান নেবার জন্য। যা—এই দণ্ডে চলে যা আমার শিবির থেকে। নইলে—'

শয্যা হইতে ঠাকুরানী কথা বলিলেন—'নইলে কী ? নিজের কন্যাকে হত্যা করবি ? তাই কর্। তুই অপুত্রক, মেয়ে দুটোকেও হত্যা কর্। বংশে বাতি দেবার জন্যে কাউকে রাখিসনি।'

মাতার বাক্যে লক্ষ্মীকর্ণের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল ; কিন্তু তিনি বাক্যব্যয় করিলেন না, কেবল কষায় চক্ষে মাতার পানে চাহিলেন। বীরশ্রীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—'পিতা, কেন আপনি আমাকে এত নিষ্ঠুর কথা বলছেন ? আমি কি আপনার কন্যা নই ?'

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'কন্যা হলেও তুই আমার শত্রু। তোরা সবাই আমার শত্রু। আমি ক্ষীর খাইয়ে কালনাগিনী পুষেছি।' বলিয়া মাতার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

বীরশ্রী বলিলেন—'পিতা, কেউ আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেনি। আপনি যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর সভা আহ্বান করেছিলেন, যৌবনশ্রী নিজের মনোমত বরের গলায় মালা দিয়েছে। এ কি তার দোষ ? আপনি বাক্যদান করে কেন বিগ্রহপালকে স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করেননি ? এ কি যৌবনশ্রীর অপরাধ ? পিতা, যারা আপনার একান্ত আপন জন তাদের আপনি পর করে দিয়েছেন। কিসের জন্য যুদ্ধ ? জগতের চক্ষে বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীর স্বামী ; আপনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। যুদ্ধে পরাজয় যারই হোক, ইষ্ট কার হবে ? পিতা, আমরা আপনার সন্তান, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, ক্রোধ ত্যাগ করুন।'

লক্ষ্মীকর্ণ পদদাপ করিয়া বলিলেন—'না না না—যুদ্ধ হবে। আমি বুঝেছি, ধূর্ত নয়পাল তোকে পাঠিয়েছে চাটুবাক্যে আমাকে বশ করতে। কিন্তু তা হবার নয়। কাল যুদ্ধ হবে। তোর শ্বশুর যত হাতিই পাঠাক, মগধ আমি ছারখার করব। নয়পালকে শূলে দেব। তারপর বংগাল দেশে গিয়ে তোর শ্বশুরকে উৎখাত করব। আমার কুটুম্ব হয়ে আমার বিরুদ্ধে হাতি পাঠিয়েছে, এতবড় স্পর্ধা !'

বীরশ্রী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—'ভাল, আপনার যা অভিরুচি তাই করবেন। নিয়তি কে খণ্ডাতে পারে ? আমি আজ চক্রস্বামীর প্রসাদ এনেছিলাম, ভেবেছিলাম দেবতার প্রসাদে আপনার মন প্রসন্ন হবে।' বীরশ্রী প্রসাদের থালি দুই হাতে ধরিয়া লক্ষ্মীকর্ণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'পিতা, চক্রস্বামীর প্রসাদও কি আপনি গ্রহণ করবেন না ?'

চক্রস্বামীর প্রসাদ—অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসাদ। মহারাজ ধর্মে বৈষ্ণব। যুদ্ধের প্রাক্কালে ইষ্টদেবতার প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন নয়। ফাঁপরে পড়িয়া মহারাজ একখণ্ড মিষ্টান্ন তুলিয়া মুখে ফেলিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'যাই, বাকি প্রসাদ পরিজনদের বিতরণ করে দিই। আমি বেশিক্ষণ থাকব না পিতা। ঠাকুরানী ও আপনার চরণ দর্শন করলাম, এবার যৌবনার সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে যাব।'

লক্ষ্মীকর্ণ গলার মধ্যে ঘুৎকার শব্দ করিয়া পদদাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কন্যার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই, কন্যাকে শাস্তি দেওয়াও সম্ভব নয়, এই খেদ বক্ষে লইয়া তিনি নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন এবং শয্যায় শয়ন করিলেন। এ সংসারে স্ত্রীজাতিকে সমুচিত শাস্তি দিবার কোনও উপায় নাই, বিশেষত যদি তাহারা মাতা কিম্বা কন্যা হয়। পুরুষ এরূপ ধৃষ্টতা করিলে—

শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে করিতে মহারাজের ক্ষুব্ধ মন—সম্ভবত চক্রস্বামীর প্রসাদের গুণে—ক্রমশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। কাপুরুষ নয়পাল নিশ্চয় ভয়ে মুক্তকচ্ছ হইয়াছে, তাই বীরশ্রীকে পাঠাইয়াছে সন্ধি করিবার আশায়। ধূর্ত শৃগাল ! কণ্টক দিয়া কণ্টক উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু আমি সতর্ক আছি। আমার চক্ষে ধূলা দেওয়া নয়পালের কর্ম নয়—

ক্রমে একটি পরম সুখকর আলস্য তাঁহার সারা দেহে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। চিন্তার সূত্র ক্ষীণ হইয়া আসিল। কাল যুদ্ধ, আজ রাত্রে উত্তম বিশ্রাম প্রয়োজন—

মহারাজ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

তিন

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ মাতৃশিবির হইতে বাহির হইবার পর বীরশ্রীও প্রসাদের পাত্র হস্তে বাহির হইলেন। বাহিরে জম্বুবনে তখন অন্ধকার নামিয়াছে। একদল রক্ষী শিবিরগুলিকে ঘিরিয়া পরিক্রম আরম্ভ করিয়াছে, দুই চারিটা উল্কা জ্বলিতেছে। সেনানিবাসের নিয়ম, সন্ধ্যার পূর্বেই রাত্রির আহার সম্পন্ন করিতে হইবে ; সৈনিকেরা আহার সমাপ্ত করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে।

একজন শিবির-রক্ষী উল্কা হস্তে অম্বিকা দেবীর শিবিরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, বীরশ্রীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল। বীরশ্রী যে শত্রুশিবির হইতে পিতৃশিবিরে আসিয়াছেন একথা কাহারও অবিদিত ছিল না ; মহারাজের উগ্রকণ্ঠের চিৎকারও বাহির হইতে অনেকে শুনিয়াছিল। চেটী-কিঙ্করীরা শুনিয়াছিল বস্ত্র-প্রাচীরের পরপার হইতে ; মুখে মুখে কথাটা প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। দেবী বীরশ্রী শান্তির প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্ধত রাজা প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। কাল যুদ্ধ হইবেই। কত লোক মরিবে, কত লোক অন্ধ খঞ্জ হইবে। কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে ? রাজার ইচ্ছায় যুদ্ধ।

বীরশ্রী রক্ষীর কাছে আসিলেন, হাসিমুখে তাহাকে একটি মিষ্টান্ন দিয়া বলিলেন—'চক্রস্বামীর প্রসাদ নাও।'

রক্ষী কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ মুখে দিল। বীরশ্রী বলিলেন—'সকলকে প্রসাদ দেওয়া তো সম্ভব নয়, কেবল রক্ষীদেরই দিই, চক্রস্বামীর দয়ায় সকলেরই মঙ্গল হবে। চল তুমি উল্কা নিয়ে আমার সঙ্গে, আমি সকলকে প্রসাদ দিয়ে আসি।'

রক্ষী বলিল—'কোথাও যাবার প্রয়োজন হবে না দেবি। রক্ষীরা সবাই এই পথেই ঘুরছে, এখনি একে একে আসবে।'

বীরশ্রী দাঁড়াইয়া রহিলেন, রক্ষীও উল্কা লইয়া রহিল। অন্য রক্ষীরা আবর্তনের পথে সেখানে আসিল এবং রাজকুমারীর হাত হইতে প্রসাদ পাইয়া চরিতার্থ হইল। তারপর বীরশ্রী বলিলেন—'এবার অন্তঃপুরিকাদের প্রসাদ দিই গিয়ে। কুমারী যৌবনশ্রীর শিবির কোনটা?'

'এই যে—পাশেই'—রক্ষী বীরশ্রীকে যৌবনশ্রীর শিবিরের দ্বার পর্যন্ত আলো দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, যাইবার সময় ভক্তিভরে বীরশ্রীকে প্রণাম করিল। বীরশ্রী মধুরকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন—'চিরঞ্জীব হও—বিজয়ী হও।'

রক্ষী মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, বীরশ্রীর মধুর বাক্যে তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। সে গদ্‌গদ স্বরে বলিল—'মা, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমি সামান্য যোদ্ধা, আমার আয়ুর হিসাব চিত্রগুপ্তও রাখেন না। জয়-বিজয়েও আমার গৌরব নেই; সে গৌরব রাজার। আশীর্বাদ কর, আমার সন্তান-সন্ততি যেন সুখে থাকে।'

এই সরল যোদ্ধার ক্ষুদ্র আকিঞ্চনে বীরশ্রীর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। তিনি বলিলেন—'তোমরা সকলে সুখে থাক।'

বীরশ্রী শিবিরদ্বারের প্রচ্ছদ সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দীপের মন্দালোকে যৌবনশ্রী শয্যায় বসিয়া আছেন; আর, ভূমিতে বসিয়া রঙ্গিণী রাবণ রাজার চেড়ীর মত তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। যৌবনশ্রী যেন অশোক বনের সীতা। রণক্ষেত্রে শিবিরে বসিয়াও তাঁহার বন্দীদশা ঘুচে নাই।

কিন্তু রঙ্গিণীর ভাবভঙ্গি এখন আর তেমন কঠিন নয়। দীর্ঘকাল রাজকন্যাকে পাহারা দিয়া সে বোধহয় বুঝিয়াছে এ কাজ কেবল গায়ের জোরে হয় না, কিছু কলাকৌশলও প্রয়োজন। বিশেষত রাজপ্রাসাদে ও রণক্ষেত্রের বাতাবরণে অনেক প্রভেদ; কাল যুদ্ধের ফলাফল কী হইবে কেহ জানে না, যদি লক্ষ্মীকর্ণ পরাজিত হন তখন রঙ্গিণীর দশা কী হইবে? তাই বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী যখন আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন তখন সে বাধা দিল না, ভূমি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্বচ্ছন্দভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বীরশ্রী বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'কী হয়ে গিয়েছিস যৌবনা!'

যৌবনশ্রীর গণ্ডে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

যৌবনশ্রীকে ছাড়িয়া বীরশ্রী আবার প্রসাদের থালি হাতে লইলেন। রঙ্গিণীর সম্মুখে কোনও কথাই হইতে পারে না। তিনি যৌবনশ্রীর সম্মুখে থালি ধরিয়া বলিলেন—'চক্রস্বামীর প্রসাদ নে যৌবনা।'

যৌবনশ্রী প্রসাদ হাতে লইবার পূর্বেই বীরশ্রী রঙ্গিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'তুমিও নাও। আর, অন্য সব মেয়েদের ডেকে নিয়ে এস। সকলকে প্রসাদ দেব।'

রঙ্গিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রসাদ লইয়া মুখে দিল, তারপর মাথায় হাত মুছিয়া অন্য সকলকে ডাকিতে গেল।

সে প্রস্থান করিলে বীরশ্রী যৌবনশ্রীর কানে কানে দ্রুত হ্রস্বকণ্ঠে সংক্ষেপে ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। যৌবনশ্রী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন, তারপর থরথর কাঁপিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন।

রঙ্গিণী যখন পুরস্ত্রীদের লইয়া ফিরিয়া আসিল তখন দুই ভগিনী শয্যায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পুরস্ত্রীরা সংখ্যায় দশ বারো জন, অম্বিকার উপস্থায়িকা দুইজনও আছে। সকলেই বীরশ্রীর পরিচিতা। তাহারা বীরশ্রীর পদধূলি লইল, কলকণ্ঠে সংবর্ধনা করিল। বীরশ্রী সকলের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন, সকলের হাতে মিষ্টান্ন দিলেন। সকলে প্রসাদ মুখে দিয়া আনন্দিত মনে চলিয়া গেল।

রঙ্গিণী কিন্তু গেল না, শিবিরের এক পাশে ভূমির উপর বসিয়া রহিল।

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী শয্যার উপর মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতেছেন। বীরশ্রী অধিকাংশ কথা বলিতেছেন ; শ্বশুরবাড়ির গল্প, নৌকাযোগে ত্রিপুরী হইতে বিক্রমণিপুর গমনের গল্প। তাঁহার নিজ শিবিরে ফিরিয়া যাইবার কোনও ত্বরা নাই। যৌবনশ্রী মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলিতেছেন। অদূরে বসিয়া রঙ্গিণী কান পাতিয়া শুনিতেছে।

দুই দণ্ড বসিয়া বসিয়া গল্প করিবার পর দুই ভগিনী শয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিলেন ; শুইয়া শুইয়া গল্প চলিতে লাগিল।

রঙ্গিণীও হাই তুলিয়া শয়ন করিল।

শুইয়া শুইয়া তাহার তন্দ্রাবেশ হইল। সে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মাথার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের যোগসূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ কাটিবার পর বীরশ্রী ঘাড় তুলিয়া রঙ্গিণীর দিকে দেখিলেন, ডাকিলেন—'রঙ্গিণি !'

রঙ্গিণী সাড়া দিল না। সাড়া দিলে হয়তো বীরশ্রী পানীয় জল চাহিতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন তিনি নিঃশব্দে শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন, শিবিরের দ্বারের কাছে গিয়া প্রচ্ছদ সরাইয়া বাহিরে উঁকি মারিলেন।

বাহিরে জম্বুছায়াচ্ছন্ন নীরন্ধ্র অন্ধকার ; আকাশ মৃত্তিকা কিছুই দেখা যায় না। শব্দও নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

চার

কেবল শিবিরের মধ্যে স্নিগ্ধ দীপ জ্বলিতেছে।

বীরশ্রী ভিতর দিকে ফিরিয়া হাতছানি দিলেন, যৌবনশ্রী নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইলেন। বীরশ্রী তাঁহার হাত ধরিলেন ; তাঁহার জিজ্ঞাসু নেত্র একবার রঙ্গিণীর দিকে সঞ্চারিত হইল ; সে অঘোরে ঘুমাইতেছে। বীরশ্রী ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন—'ওষুধ ধরেছে। চল্, এবার যাই। আগে ঠাকুরানীর শিবিরে।'

হাত ধরাধরি করিয়া দুইজনে বাহিরে আসিলেন। পিছনে শিবিরদ্বারের প্রচ্ছদ দীপের ক্ষুদ্র আলোর সম্মুখেও আবরণ টানিয়া দিল। চতুর্দিকে কাজলরুচি তমিস্রা, নিজের হাত দেখা যায় না।

এই অন্ধকারে অম্বিকা দেবীর শিবির কোন্ দিকে ? বীরশ্রী স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। যৌবনশ্রীর শিবিরে আসিবার সময় অম্বিকার শিবির ডান দিকে পড়িয়াছিল, মাঝে একটি সুপুষ্ট জম্বুকাণ্ডের ব্যবধান। যৌবনশ্রীর হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া বীরশ্রী সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। কোনও অদৃশ্য বস্তুতে হোঁচট খাইলে শব্দ হইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। মন্দং নিধেহি চরণৌ—

সম্মুখে হাত বাড়াইয়া চলিতে চলিতে একটি বৃক্ষের কর্কশ ত্বক হাতে ঠেকিল। সঙ্গে সঙ্গে

পায়ে ঠেকিল একটি মনুষ্য দেহ। বীরশ্রী তীক্ষ্ণ নিশ্বাস টানিয়া সরিয়া আসিলেন। বোধহয় কোনও সৈনিক কিম্বা রক্ষী বৃক্ষতলে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ভাগ্যক্রমে পদস্পর্শে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। রক্ষীই হইবে, চক্রস্বামীর প্রসাদে বুঁদ হইয়া ঘুমাইতেছে। সৈনিক হইলে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত।

আরও সাবধানে দুইজনে চলিলেন। একটু একটু পা বাড়াইয়া ; অন্ধ কিঞ্চুলুক যে-ভাবে চলে। আর কাহারও গায়ে পা ঠেকিল না।

কিছুক্ষণ চলিবার পর হঠাৎ একটি অতি ক্ষুদ্র আলোকের বিন্দু যৌবনশ্রীর চোখে পড়িল। মাটির উপর যেন একখণ্ড অঙ্গার জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভস্মাবৃত হইয়াছে। যৌবনশ্রী দিদির হাত চাপিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'দিদি—'

বীরশ্রীও দেখিতে পাইলেন। নিঃশব্দে সেইদিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অঙ্গার নয় ; কোনও একটি শিবিরের প্রচ্ছদ নিম্নভাগে একটু সরিয়া গিয়াছে, ভিতরের আলো দেখা যাইতেছে।

কাহার শিবির ? যদি ঠাকুরানীর শিবির না হয় ! যদি ভিতরে অন্য কেহ জাগিয়া থাকে ! বীরশ্রী প্রচ্ছদের বাহিরে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক কান পাতিয়া শুনিলেন, কিন্তু নিজের হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। তখন তিনি ধীরে ধীরে পর্দার কোণ তুলিয়া উঁকি দিলেন।

দ্বারের কাছেই দুই উপস্থায়িকা হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে : শয়নের অসম্বৃত ভঙ্গি দেখিয়া বোঝা যায় তাহারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী নির্ভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

অম্বিকা জাগিয়া ছিলেন ; স্থিরচক্ষে ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হাত তুলিয়া সঙ্কেত করিলেন।

তিনটি মাথা কিছুক্ষণ শয্যার উপর একত্র হইয়া রহিল। শেষে বীরশ্রী বলিলেন—'দিদি, বাইরে বড় অন্ধকার, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। ভয় হচ্ছে, যদি ধরা পড়ে যাই।'

ঠাকুরানী বলিলেন—'এক কাজ কর। আমার শিবিরের প্রদীপ দ্বারের বাইরে নিয়ে গিয়ে রাখ। তবু খানিকটা দেখতে পাবি।'

বীরশ্রী বলিলেন—'সে ভাল। হাতে প্রদীপ নিয়ে তো যাওয়া চলবে না। যে রক্ষীরা সীমানা পাহারা দিচ্ছে তারা নিশ্চয় ঘুমোয়নি, আলো দেখলে তারা ধরে ফেলবে।'

অম্বিকা বলিলেন—'হাঁ। এবার তোরা যা। যত দেরি করবি তত ধরা পড়ার ভয়। নিজের শিবিরে পৌঁছে একবার ডঙ্কায় ঘা দিতে বলিস, যাতে আমি শুনতে পাই।'

দুই ভগিনী আবার বাহির হইলেন। প্রথমে যৌবনশ্রী শিবির হইতে নির্গত হইলেন, পরে বীরশ্রী প্রদীপ হাতে লইয়া আসিলেন। তিনি প্রদীপটি দ্বারের সম্মুখে রাখিলেন। বাহিরে বাতাস নাই, প্রদীপ অকম্প্রশিখায় জ্বলিতে লাগিল।

এতটুকু আলো, বাহিরের সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তবু নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের চেয়ে ভাল। নিজেকে দেখা যায়। পাশের মানুষকে দেখা যায় ; বিরাট দৈত্যের মত গাছগুলাকে ঠাহর করা যায়। কোনও ক্রমে জম্বুবন পার হইতে পারিলে হয়তো নক্ষত্রের আলো পাওয়া যাইবে।

প্রদীপ পশ্চাতে রাখিয়া দুইজনে পা বাড়াইলেন—

অকস্মাৎ প্রলয়ঙ্কর শব্দে তাঁহাদের মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ! ঢং ঢং ঢং ঢং শব্দ ! সমস্ত জম্বুবন যেন এই শব্দের অট্টরোলে আলোড়িত হইয়া উঠিল। দুই ভগিনী ভয় পাইয়া পরস্পর জড়াইয়া ধরিলেন। মনে হইল, সর্বনাশ হইয়াছে, সকলে জানিতে পারিয়াছে ; তাঁহারা

ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

শব্দ যতটা ভয়ঙ্কর মনে হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে ততটা ভয়ঙ্কর নয়। রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হইয়া দ্বিতীয় প্রহর আরম্ভ হইয়াছে, ঘটিকাশালার প্রহরীরা তাহাই ঘোষণা করিতেছে। প্রথম ভয়বিহ্বলতা কাটিয়া যাইবার পর দুইজনে তাহা বুঝিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, শিবির-প্রহরী রক্ষীরা যতই ঘুমাক, জম্বুবনের কিনারে সীমান্ত রক্ষীরা সতর্কভাবে জাগিয়া আছে।

দুইজনে আবার চলিলেন। কোন্ দিকে চলিয়াছেন তাহা জানেন না, কেবল প্রদীপশিখাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়াছেন। একবার ভাঙ্গা গাছের ডাল তাঁহাদের পথরোধ করিল ; তাহাকে এড়াইয়া বীরশ্রী একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন। আলোকরশ্মি দেখা যায় কি যায় না।

আরও কিছুদূর চলিবার পর তাঁহারা হঠাৎ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। সম্মুখে ও কী ? অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ় অন্ধকারের পিণ্ড যেন তাল পাকাইতেছে। সঙ্গে ফোঁস ফোঁস শব্দ ; যেন কাহারা সমবেতভাবে নিশ্বাস ফেলিতেছে। একটা দীর্ঘ কালো হাত আসিয়া লঘুভাবে তাঁহাদের মস্তক স্পর্শ করিল।

যৌবনশ্রী বলিলেন—'দিদি ! হাতি !'

দুই ভগিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন। অন্ধকারে অপরিচিত হস্তীর মত ভয়াবহ জীব আর নাই। বনের এক স্থানে সমস্ত রণহস্তী বাঁধা ছিল, বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী একেবারে তাহাদের দঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলেন।

হাত ধরাধরি করিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহারা বার কয়েক হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন ; বসন ছিঁড়িয়া গেল, পায়ে কাঁটা ফুটিল। তারপর সহসা এক সময় আছাড় খাইয়া উঠিয়া তাঁহারা অনুভব করিলেন, অন্ধকার যেন একটু তরল হইয়াছে। তাঁহারা চারিদিকে চাহিলেন, তারপর ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন আকাশে তারা মিটমিট করিতেছে। তাঁহারা জম্বুবনের বাহিরে আসিয়াছেন।

যাক, জম্বুবনের দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধা হইতে নির্গত হইয়াছেন। কিন্তু কোন্ দিকে ? সম্মুখদিকে না পশ্চাদ্দিকে ? নক্ষত্রের আলোকে যতটুকু অনুভব করা যায়, তাহা নিতান্তই সীমাবদ্ধ ; প্রান্তরের এখানে ওখানে দুই চারিটা আগাছার গুল্ম রহিয়াছে ; একটা কণ্টকগুল্ম অসংখ্য খদ্যোতিকার জ্যোতিরলঙ্কার পরিয়া ঝলমল করিতেছে। কিন্তু প্রান্তরের পরপারে শালবন আছে কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই।

তবু জম্বুবনের প্রহরীচক্র যে তাঁহারা নিরাপদে পার হইয়া আসিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। এখন জম্বুবনকে পশ্চাতে রাখিয়া যত দূর যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

দুই বোন আবার চলিতে লাগিলেন। জম্বুবনে বেশি কাঁটা ছিল না, এখানে দুই পা চলিলেই পায়ে কাঁটা ফোটে। কিছুদূর চলিয়া উভয়ে মাটিতে বসিলেন, অনুভবের দ্বারা পায়ের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। একটি দীর্ঘকম্পিত নিশ্বাস যৌবনশ্রীর বুক হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বীরশ্রী বলিলেন—'নিশ্বাস ফেলছিস কেন রে যৌবনা ?'

যৌবনশ্রী বলিলেন—'আমার জন্য তুই কত কষ্ট পেলি তাই ভেবে কান্না পাচ্ছে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'আমার কষ্টের কথাই ভাবছিস ! তোর নিজের ?'

যৌবনশ্রী বলিলেন—'আমার আবার কষ্ট কি ! আমি আমার স্বামীর কাছে যাচ্ছি। দরকার হলে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারি।'

যৌবনশ্রীর এই স্বভাব-বিরুদ্ধ প্রগল্‌ভতাটুকু বীরশ্রীর বড় মিষ্ট লাগিল। তিনি হাসিলেন—'আমিও আমার স্বামীর কাছে যাচ্ছি। নে ওঠ্। শিবিরে গিয়ে প্রথমেই বিগ্রহকে

বলবি পায়ের কাঁটা তুলে দিতে।'

দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যৌবনশ্রী বলিলেন—'কিন্তু শিবির কোথায় ?'

প্রশ্ন অনুত্তর রহিয়া গেল। এই সময় হঠাৎ সন্নিকট হইতে একপাল অদৃশ্য শৃগাল হুক্কাহুয়া করিয়া ডাকিয়া উঠিল। দুইজনে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

শৃগালের হট্টকোলাহল থামিলে বীরশ্রী বলিলেন—'তোর প্রেমের পথে যে এত কাঁটা তা কে জানত ! শেষ পর্যন্ত শিয়ালকাঁটা। দেখছি আজ রাত্রিটা এই মাঠেই কাটাতে হবে। নইলে হয়তো পথ ভুলে আবার জম্বুবনেই ফিরে যাব। দিগ্‌ভ্রম হয়েছে। ভোরের আলো ফুটলে তখন—'

'কিন্তু—'

ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত মাঠে বসিয়া থাকার বিপদ আছে তাহা বীরশ্রীও জানিতেন। ভোর হইলে কেবল তাঁহারাই চক্ষু পাইবেন তা নয়, জম্বুবনের প্রহরীরাও চক্ষু পাইবে। তখন—

সমস্যার সমাধান আসিল বিচিত্ররূপ ধরিয়া। নিশীথ রাত্রির নিস্তরঙ্গ বাতাসে দূর হইতে ভাসিয়া আসিল অতি মধুর বাঁশির সুর। বীরশ্রী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় শিহরিয়া যৌবনশ্রীর হাত চাপিয়া ধরিলেন—'ঐ শোন যৌবনা ! শুনতে পাচ্ছিস ?'

যৌবনশ্রী উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন—'পাচ্ছি। বাঁশির শব্দ। কে—কে বাজাচ্ছে দিদি !'

বীরশ্রী ভগিনীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন—'আর কে বাজাবে ? ও বাঁশিতে ও সুর আর কে বাজাতে পারে ? আয়—দিশা পেয়েছি।'

দুই ভগিনী বাঁশির স্বর লক্ষ্য করিয়া হরিণীর মত ছুটিয়া চলিলেন। পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল কিন্তু কেহই তাহা অনুভব করিলেন না।—

শালবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জাতবর্মা বাঁশি বাজাইতেছিলেন, পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন বিগ্রহপাল।

'আমরা এসেছি'—নারীকণ্ঠের রুদ্ধশ্বাস স্বর।

'বীরা !' দুইজনে সম্মুখে ছুটিয়া গেলেন।

'যৌবনাকে এনেছি।'

নক্ষত্রসূচীবিদ্ধ অন্ধকারে চারিজন মুখোমুখি হইলেন।

'যৌবনশ্রী ! যৌবনা !'

যৌবনশ্রী মুখে একটি অব্যক্ত শব্দ করিলেন, তারপর সংজ্ঞা হারাইয়া ধীরে ধীরে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে শালবনের ভিতর হইতে রণডঙ্কার বিজয়োদ্ধত উল্লাস একবার দ্রুতছন্দে মন্দ্রিত হইয়াই নীরব হইল। মাঠের পরপারে জম্বুবনের একটি দীপহীন শিবিরে এক রোগপঙ্গু বৃদ্ধা সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন।

পাঁচ

রাত্রিশেষে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ স্বপ্ন দেখিলেন। মুক্ত কৃপাণ হস্তে তিনি রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে অগণিত শত্রুসৈন্য, রথ অশ্ব গজ পদাতিক ; রণবাদ্য বাজিতেছে। মহারাজ শত্রুকে আক্রমণ করিবার পূর্বে একবার পশ্চাতে ও পার্শ্বে দৃষ্টি ফিরাইলেন। দেখিলেন,

কেহ নাই, তিনি একাকী। তাঁহার সৈন্যদল সমস্ত শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছে।

মহারাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শিবিরের বাহিরে পূর্বাকাশে তখন ঊষার অলক্ত-রাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘুমন্ত বনভূমি জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে ; গাছের ডালে পাখি, গাছের তলে মানুষ হাতি ঘোড়া।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ শয্যায় উঠিয়া কিছুক্ষণ জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল। মিথ্যা স্বপ্ন, অর্থহীন স্বপ্ন। তিনি গদার ন্যায় বাহুদ্বয় আস্ফালনপূর্বক আলস্য ত্যাগ করিলেন, তারপর হুঙ্কার ছাড়িয়া শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন। আজ যুদ্ধ!

কয়েকজন পরিজন ছুটিয়া আসিল। মহারাজের আজ্ঞায় ঢক্কা তূরী ভেরী শৃঙ্গ পটহ বাজিয়া উঠিল। যে সকল সৈনিক বৃক্ষতলে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল তাহারা চক্ষু মর্দন করিয়া উঠিয়া বসিল। আজ যুদ্ধ!

যৌবনশ্রীর শিবিরে রঙ্গিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল যৌবনশ্রীর শয্যা শূন্য।...এরূপ ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই। কোথায় গেলেন রাজকুমারী? রঙ্গিণীর মনে পড়িল, কাল রাত্রে দুই ভগিনী শয্যায় শুইয়া জল্পনা করিতেছিলেন, রঙ্গিণী শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তারপর—তারপর—কোথায় গেলেন দুই রাজকুমারী? তবে কি—তবে কি—? রঙ্গিণীর হাত-পা হিম হইয়া গেল। যদি তাই হয়, মহারাজ জানিতে পারিলে কি করিবেন? রঙ্গিণী আবার চোখ বুজিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল।

রাজা যৌবনশ্রীর অন্তর্ধানের কথা জানিতে পারিলেন না। কন্যার কথা চিন্তা করিবার সময় তাঁহার ছিল না, তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যুদ্ধ! যুদ্ধ! সৈন্যগণ প্রস্তুত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।

সূর্যোদয় হইল।

দুই সৈন্যদল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রান্তরের দুই প্রান্তে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। নববল খেলায় যেরূপ বলবিন্যাস হয়, যুদ্ধক্ষেত্রের বলবিন্যাসও সেইরূপ। সম্মুখে পদাতিক সৈন্যের পঙ্‌ক্তি, তাহার পশ্চাতে রথ অশ্ব গজের শ্রেণী। শ্রেণীর মধ্যস্থলে রাজার রথ।

দুই পক্ষে বিপুল বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইয়াছে। আকাশবিদারী শব্দে চতুরঙ্গ সৈন্যের ধমনীতে রক্ত-স্রোত উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের রথ সৈন্যব্যূহের মাঝখান হইতে বাহির হইয়া ধীরগমনে সম্মুখ দিকে চলিল। ইহা যুদ্ধারম্ভের সঙ্কেত। সৈন্যদল জয়ধ্বনি করিয়া রাজরথের পশ্চাতে অগ্রসর হইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাঠের অপর প্রান্তে একটি রথ বাহির হইয়া আসিল। এতদূর হইতে রথের আরোহীকে দেখা যায় না। দুই সৈন্যদল পদভরে মেদিনী দলিত করিয়া পরস্পর নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সম্পৎ, কার রথ চিনতে পারছিস?'

সম্পৎ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না। দুইটি রথ সৈন্যদল পশ্চাতে লইয়া আরও নিকটবর্তী হইল। মহারাজ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

দুই রথ যখন তিন রজ্জু দূরে তখন সম্পৎ হঠাৎ বলিল—'আয়ুষ্মন্, ও রথ চালাচ্ছেন কুমারী যৌবনশ্রী!'

'কী! যৌবনশ্রী!' মহারাজ হতভম্ব হইয়া চাহিলেন। হাঁ, যৌবনশ্রীই বটে! রথ চালাইতেছে সারথি-বেশিনী যৌবনশ্রী, আর রথের রথী—বিগ্রহপাল।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ ক্ষণেকের জন্য দারুব্রহ্মের ন্যায় রথে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্ চিন্তার ক্রিয়া হইল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বীরশ্রী এইজন্য আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে

তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। স্বপ্নের কথাও মনে পড়িল। বীরশ্রী যৌবনশ্রী জাতবর্মা ছাড়িয়া গিয়াছে, যাহারা আছে তাহারাও ছাড়িয়া যাইবে ?

অতঃপর মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মনে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহা অদ্ভুত। কুটিল মন স্বভাবতই বক্র পথে চলে ; বিশেষত মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মন শুধু কুটিল নয়, অত্যন্ত জটিল। তিনি এক অভাবনীয় কার্য করিলেন।

'থামা থামা ! রথ থামা !'

সম্পৎ রথ থামাইল। পশ্চাতে সৈন্যদল গতি রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ এক লাফে রথ হইতে নামিলেন। হাতের তরবারি দূরে ফেলিয়া উন্মত্ত দৈত্যের মত বিগ্রহপালের রথের প্রতি ধাবিত হইলেন।

বিগ্রহপালের রথও থামিয়া গিয়াছিল, তাঁহার পিছনে সৈন্যদলও থামিয়াছিল। গগনভেদী বাদ্যোদ্যম স্তব্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভে এরূপ অচিন্তনীয় ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই। দুই পক্ষের সৈন্যদল মার্গাচলরুদ্ধ স্রোতস্বিনীর মত ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ যদি অসি ফেলিয়া না দিতেন তাহা হইলে তাঁহার কার্যের একটা অর্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু এ কি ! এরূপ আত্মঘাতী কার্য উন্মাদ ভিন্ন আর কে করিতে পারে ! তবে কি লক্ষ্মীকর্ণ সত্যই উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন ?

বিগ্রহপাল ব্যাপার দেখিয়া নিজ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। লক্ষ্মীকর্ণের অভিপ্রায় কি তাহা জানা নাই ; কিন্তু তিনি অস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং বিগ্রহপালও অস্ত্রত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া যৌবনশ্রী ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, যেন নিজ দেহ দিয়া স্বামীর দেহ রক্ষা করিবেন। বিগ্রহপাল তাঁহাকে সম্মুখ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যৌবনশ্রী অটল রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল অধরোষ্ঠে কঠিন দৃঢ়তা। যদি মরিতেই হয় দুইজনে একসঙ্গে মরিবেন।

উন্মত্ত দৈত্য আসিয়া পড়িল। তারপর মুহূর্তমধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা ও জামাতাকে দুইটি মার্জার শাবকের মত অবহেলে তুলিয়া নিজের দুই স্কন্ধে স্থাপন করিলেন এবং উদ্দাম তাণ্ডব নাচিতে শুরু করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল—'ধন্য ! ধন্য ! ধন্য ! আমার কন্যা ! আমার জামাতা ! ধন্য ! ধন্য ! ধন্য !'

যুদ্ধ হইল না ; রক্তপাত হইল না ; রণক্ষেত্র কোন্ মায়াবীর মন্ত্রবলে উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হইল। যে সৈন্যদল পরস্পর হানাহানি করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিল, হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। উগ্র রণবাদ্য পলকে পারুষ্য ত্যাগ করিয়া ডিমি ডিমি ডিমি আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রলয়ঙ্কর মহাকাল আর এক বুড়ার কাণ্ড দেখিয়া সহাস্য শিবসুন্দর মূর্তি ধারণ করিলেন।

জাতবর্মা বীরশ্রী অনঙ্গপাল বাঙ্কুলি সকলে ছুটিয়া আসিয়া নৃত্যপরায়ণ লক্ষ্মীকর্ণকে ঘিরিয়া ধরিলেন। ক্রমে মহারাজ নৃত্য সম্বরণ করিয়া যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দিলেন, তারপর বিপুল বাহু দিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। বলিলেন—'তোরা সবাই মিলে বুড়োকে ঠকিয়েছিস। কেউ মুক্তি পাবি না। চল ত্রিপুরীতে। সেখানে গিয়ে যৌবনার বিয়ে দেব। আমার বুড়ি মা কোথায় ? তাঁকেও কি তোরা চুরি করে এনেছিস নাকি ?'

সকলের চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিল।

আলিঙ্গন-চক্রের কিনারা হইতে জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেব বলিলেন—'মহারাজ, আমার গণনা ফলেছে কিনা !'

মহারাজ রন্তিদেবকে শিখা ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিলেন, বলিলেন—'পণ্ডিত, আজ থেকে তুমি আমার সভাজ্যোতিষী।'

ছয়

সেদিন ভারতের নাট্যমঞ্চে যে কৌতুকনাট্যের অভিনয় হইয়াছিল, যে নটনটীরা অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার রাঙা মেঘের মত শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কোথায় যৌবনশ্রী, কোথায় বিগ্রহপাল? সেদিন ধীরে ধীরে নাট্যমঞ্চের উপর মহাকালের কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিয়াছিল, প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছিল।

তারপর রঙ্গমঞ্চ যুগান্তকাল ধরিয়া তিমিরাবৃত ছিল। নৃত্য গীত হাস্য কৌতুক মূক হইয়া গিয়াছিল। মানুষ চামচিকার মত অন্ধকারে বাঁচিয়া ছিল।

নয়শত বর্ষ পরে আবার সেই রঙ্গমঞ্চে একটি একটি করিয়া দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে, কালের কৃষ্ণ যবনিকা সরিয়া যাইতেছে। এবার এই পুরাতন রঙ্গমঞ্চে জানি না কোন্ মহা নাটকের অভিনয় হইবে!